বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডিএসই/DSE : ৩০৩

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম — বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান–৫০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডিএসই/DSE : ৩০৩

বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ : ১ নাট্যশালার ইতিহাস (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১ : বাংলায় বিদেশি রঙ্গালয়

একক–২ : লেবেডেফ

একক–৩ : সখের নাট্যশালা

একক–৪ : যাত্রাভিনয়

পর্যায় গ্রন্থ : ২ নাট্যশালার ইতিহাস (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৫ : পেশাদারি নাট্যশালা

একক–৬ : গণনাট্য

একক–৭ : নবনাট্য

একক–৮ : গ্রুপ থিয়েটার

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ নাট্যতত্ত্ব (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৯ : নাটক ও নাটকীয়তা

একক–১০ : নাটকে ঘটনা, গতি, সংঘর্ষ, কৌতূহল

একক–১১ : ট্র্যাজেডি

একক–১২ : কমেডি, প্রহসন, অতিনাটক

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ নাট্যতত্ত্ব (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ : প্লট, চরিত্র, সংলাপ, সংগীত

একক–১৪ : নাটকের অঙ্কবিভাগ, পঞ্চসন্ধি, নাটকীয় ঐক্য

একক–১৫ : পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক, উদ্ভট নাটক

একক–১৬ : স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক

সূচিপত্র

তৃতীয় সেমেস্টার

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার
ডিএসই/DSE : ৩০৩
বিশেষ পত্র : নাটক ও নাট্যমঞ্চ

ডিএসই : ৩০৩	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	ড. প্রবীর প্রামাণিক	বাংলায় বিদেশি রঙ্গালয়	১
	২	ড. প্রবীর প্রামাণিক	লেবেডেফ	৮
	৩	ড. প্রবীর প্রামাণিক	সখের নাট্যশালা	১২
	৪	ড. রাজশেখর নন্দী	যাত্রাভিনয়	২৯
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	ড. প্রবীর প্রামাণিক	পেশাদারি নাট্যশালা	৩৭
	৬	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গণনাট্য	৬৪
	৭	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নবনাট্য	৬৭
	৮	ড. শ্রাবন্তী পান	গ্রুপ থিয়েটার	৭১
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক রেজাউল করিম	নাটক ও নাটকীয়তা	৮০
	১০	অধ্যাপক রেজাউল করিম	নাটকে ঘটনা, গতি, সংঘর্ষ, কৌতূহল	৮৩
	১১	অধ্যাপক রেজাউল করিম	ট্র্যাজেডি	৮৮
	১২	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কমেডি, প্রহসন, অতিনাটক	১০২
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	প্লট, চরিত্র, সংলাপ, সংগীত	১১৫
	১৪	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নাটকের অঙ্কবিভাগ, পঞ্চসন্ধি, নাটকীয় ঐক্য	১৩০
	১৫	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক, উদ্ভট নাটক	১৩৭
	১৬	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক	১৫০

পর্যায়গ্রন্থ - ১

নাট্যশালার ইতিহাস

একক - ১

বাংলায় বিদেশি রঙ্গালয়

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.১.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.১.২ : ওল্ড প্লে-হাউস

৩০৩.১.১.৩ : দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার

৩০৩.১.১.৪ : মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার

৩০৩.১.১.৫ : হোয়েলার প্লেস থিয়েটার

৩০৩.১.১.৬ : এথেনিয়াম থিয়েটার

৩০৩.১.১.৭ : চৌরঙ্গী থিয়েটার

৩০৩.১.১.৮ : দমদম থিয়েটার

৩০৩.১.১.৯ : বৈঠকখানা থিয়েটার

৩০৩.১.১.১০ : সাঁ সুসি থিয়েটার

৩০৩.১.১.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.১.১ : ভূমিকা

জোব চার্নক ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন সাধারণ কর্মচারী হয়ে এদেশে আসেন ১৬৮৫ সালের নভেম্বর মাসে। ইনিই কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট জোব চার্নকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই কলকাতা শহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বস্তুত সেদিন থেকেই বাংলার প্রাণকেন্দ্র রূপে কলকাতা শহরের গড়ে ওঠা শুরু। ফলে পাশ্চাত্য অভিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে সামাজিক, অর্থনৈতিক

এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমরা ক্রমশ পরনির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকি। রঙ্গালয় তথা নাট্যশালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রঙ্গালয় স্থাপনের মূল উদ্যোগও নিয়েছিলেন বৃটিশরা। প্রধানত ব্যবসা বাণিজ্য করতে এলেও, শুধুমাত্র ব্যবসাকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, কূটনৈতিক কলাকৌশল নিয়ে থাকলেও ইংরেজরা মূলত ছিল রস পিপাসু, থিয়েটারের ঐতিহ্যও তাদের অনেকদিনের। ফলে বিনোদনের অভাব তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল প্রতিনিয়ত। আর সেই অভাব থেকেই, এ দেশে জন্ম নেয় রঙ্গালয়। মনে রাখতে হয়, সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে মঞ্চ ব্যবহার করা হলেও আমাদের দেশীয় অভিনয়ের জন্য কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। তখন রাজা, মহারাজা, জমিদার তথা ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের ইচ্ছা মতো আসর বসাতেন। চারদিক খোলা মঞ্চে চন্ডীমন্ডপ বা ঐ জাতীয় কোনো স্থানে অভিনয় হত। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সমাজ কোনোদিনই এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়নি। সাধারণত অশিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা ছিল এর পক্ষে। ফলে কোনোভাবেই ইংরেজদের প্রচেষ্টার পূর্বে কোনো স্থায়ী মঞ্চের স্বপ্ন দেখিনি আমরা।

১. লেবেডেফের আগে পর্যন্ত আমাদের ইংরেজি নাট্যমঞ্চগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে বিদেশি রঙ্গমঞ্চের মডেলকেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

২. নাট্যমঞ্চগুলির অভিনয় পরিচালনা এবং সাজসজ্জার ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হত বিদেশি অভিনেতা এবং বিদেশের নাট্যমঞ্চে ব্যবহৃত ভাবনার উপর। আলোকসজ্জা, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আমাদের প্রাথমিক পর্বের নাট্যশালাগুলি ছিল পরনির্ভরশীল।

৩. প্রথম পর্বের ইংরেজি রঙ্গালয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছিল, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। ফলে দর্শকদের ভালো-মন্দের দিকটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখার চেষ্টা করা হত।

৪. বাংলা ভাষায় রচিত বা অনুদিত নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত মুক্তমঞ্চ, যা মূলত নাট্যমন্দির নামে পরিচিত ছিল।

৫. এককথায় ইংরেজ সংস্কৃতি ও বিদেশি রীতিনীতি দ্বারা প্রস্তুত হলেও ওল্ড প্লে-হাউস থেকে সাঁ-সুসি থিয়েটার পর্যন্ত, যে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সন্ধান মেলে, তা আমাদের পরবর্তী নাট্যমঞ্চের অন্যতম সূচনা হিসেবে স্মরণীয়।

৩০৩.১.১.২ : ওল্ড প্লে-হাউস (OLD PLAY-HOUSE)

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের প্রথম নাট্যশালা ওল্ড প্লে হাউস। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় কলকাতায় ইংরেজদের নির্মিত এই থিয়েটার এবং সংলগ্ন নাচঘর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। এ দেশে তখন কোনো খবরের কাগজ না থাকার জন্য রঙ্গালয়টির প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট তারিখ বা সাল জানা যায় না, জানা যায় না এই নাট্যশালায় অভিনয়ের তথ্যাদিও। তবে ১৭৫৩ সালে যে সেখানে অভিনয় হত তার প্রমাণ রয়েছে। ১৭৫৭ সালে উইলের আঁকা কলকাতার মানচিত্রে দেখা যায় ৮, নম্বর লালবাজার স্ট্রীটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ট এন্ড্রুজ গির্জার বিপরীত দিকে ওল্ড প্লে হাউস নামক রঙ্গালয়ের অবস্থান। প্রথম এই নাট্যশালার

অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাট্যব্যক্তিত্ব ডেভিড গ্যারিকের কাছ থেকে তাঁরা বহু পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছিলেন। খুব সঙ্গত কারণেই এই নাট্যশালার দর্শকরাও ছিলেন বিদেশি। ১৭৫৬ সালের ১৬ই জুন নবাব সিরাজদ্দৌলার আক্রমণে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কেল্লার পাশাপাশি ধ্বংস হয়ে যায় ওল্ড প্লে-হাউস।

৩০৩.১.১.৩ : দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার

প্রায় এক লক্ষ টাকা খরচ করে ভেণ্ডুমাস্টার নামে পরিচিত নিলামাধ্যক্ষ জর্জ উইলিয়ামসন বর্তমান চীনাবাজারের কাছে রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে দি নিউ প্লে-হাউস বা ক্যালকাটা থিয়েটার স্থাপন করেছিলেন ১৭৭৫ সালে। নাট্যশালাটি নির্মাণের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ওয়ারেন হেস্টিংস, এলিজা ইম্পে, হাইড, রিচার্ড বারওয়েল প্রমুখ ইংরেজ ব্যক্তিত্ব আর্থিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। নাট্যশালাটির ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মি. রেওয়ার্থ। ম্যাসিঞ্জার, শেরিডান, ওটওয়ে, শেক্সপীয়র প্রমুখ নাট্যকারের নাটক অভিনয় হয়েছিল এই রঙ্গমঞ্চে । হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, দি রিভেঞ্জ, রিচার্ড দি থার্ড, দি ক্রিটিক প্রভৃতি অভিনয়ে রাতের পর রাত মাতিয়ে রাখা এই রঙ্গমঞ্চে টিকিটের মূল্যও ছিল অত্যধিক বেশি, বক্সের জন্য একটি সোনার মোহর এবং পিটের জন্য আট সিক্কা টাকা। ইংল্যান্ডের প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের মতো দি নিউ প্লে-হাউসকে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল সংগঠকদের। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের সাহায্য ও উপদেশ, ম্যাসিংগারের আঁকা দৃশ্যপট এই মঞ্চের গর্বের বিষয় ছিল। সেই সময়ের বহু অভিজাত ইংরেজরা এই নাট্যমঞ্চের সদস্যদর্শকও হয়েছিলেন। এই রঙ্গালয়ের শিল্পীরাও ছিলেন অ্যামেচার। দি নিউ প্লে-হাউস - এ অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ব্যান্ডেল, রবিনসন, পোলার্ড, মিসেস হরিটো, মিসেস বেসেট প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। প্রথম দিকে নারীর ভূমিকায় পুরুষেরা অভিনয় করলেও পরে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদেরও আবির্ভাব ঘটে। মিসেস ব্রিস্টো এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। সাফল্যের সাথে এগিয়ে গেলেও ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছিল নাট্যশালার ঋণের মাত্রা। তাছাড়া হোয়েলার প্লেস থিয়েটার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার সূত্রে এবং প্রচন্ড অর্থাভাবে ১৮০৮ সালে এই দি নিউ প্লে-হাউস নাট্যালয়টি পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গোপীমোহন ঠাকুর এই রঙ্গমঞ্চটি কিনে বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

৩০৩.১.১.৪ : মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (MRS. BRISTO'S PRIVATE THEATRE)

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে প্রথম বিদেশি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটারটির নাম মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার। প্রতিষ্ঠাতা নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রী মিসেস এমা ব্রিস্টো-র চৌরঙ্গীর বাড়িতে ১৭৮৯ সালে ১লা মে 'পুওর সোলজার' নাটকের অভিনয়ের দ্বারা নাট্যশালাটির সূচনা। 'পুয়োর সোলজার' নাটকটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। স্মরণীয় যে এই নাট্যশালায় পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নারীরা। এরপর

এই নাট্যশালায় অভিনীত অন্যান্য নাটকগুলি যথাক্রমে 'জুলিয়াস সীজার', 'দি সুলতান', 'দি প্যাডলক'। মিসেস ব্রিস্টো ১৮৯০ সালে লন্ডন চলে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায় এই নাট্যশালাটি।

৩০৩.১.১.৫ : হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (WHELER PLACE THEATRE)

১৭৯৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হোয়েলার প্লেস রোডে মূলত: অভিজাতদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় হোয়েলার প্লেস থিয়েটার। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাউন্সিলের এক নামজাদা সদস্য এডওয়ার্ড হোয়েলারের নামে নামকরণ হয় নাট্যশালাটির। তখনকার সময়ে ক্যালকাটা থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তৈরি হয় এই নাট্যশালাটির। হোয়েলার প্লেস নাট্যশালায় প্রথম অভিনয় হয় 'দি ড্রামাটিস্ট'। প্রবেশপত্রের দাম ধার্য হয় এক সোনার মোহর। এরপর একে একে অভিনয় হয় 'দি মোগল টেল', 'দি মাইনর', 'থ্রি উইক্স আফটার ম্যারেজ', 'ক্যাথারিন অ্যান্ড পেট্রুসিও', 'দি লায়ার', 'দি ক্রিটিক' প্রভৃতি নাটক। দর্শকদের আকর্ষণের জন্য এই থিয়েটারের পক্ষ থেকে সিজন টিকিট, বেনিফিট নাটক, প্রবেশ মূল্যের দাম কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ব্যবস্থা নিলেও, মূলত: অর্থের অভাবে ১৭৯৮ সালে বন্ধ হয়ে যায় নাট্যশালাটি।

৩০৩.১.১.৬ : এথেনিয়াম থিয়েটার (ATHENEUM THEATRE)

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি স্মরণীয় প্রয়াস এথেনিয়াম থিয়েটার। ১৮০৮ সালে দি নিউ প্লে-হাউস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় কিছুদিনের জন্য নাট্যশালার অভাব দেখা দেয়। থিয়েটার অনুরাগী মি: মরিস ১৮১২ সালের ১৯ শে মার্চ 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে একটি নতুন নাট্যশালা স্থাপনের প্রচেষ্টা করেন। ১৮ নং, সার্কুলার রোডে দু'শ আসনবিশিষ্ট সেই নাট্যশালাটির এথেনিয়াম থিয়েটার নামে ৩০শে মার্চ উদ্বোধন হয়। টিকিটের দাম ঠিক করা হয় এক সোনার মোহর। প্রথম রাতে অভিনয় হয় বিয়োগান্তকনাটক 'আর্ল অফ এসেক্স' এবং একটি প্রহসন 'রেজিং দি উইণ্ড'। ৩০শে মার্চ দর্শক আসনের কোনোটিই শূন্য ছিল না। কিন্তু অভিনয় দর্শকদের হতাশ করে। এরপর নাট্যশালাটি সম্পর্কে এবং অভিনয় সম্পর্কে নানারকম বিদ্রূপ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। তবু মি: মরিস এই মঞ্চেই একেএকে মঞ্চস্থ করেন 'হ্যামলেট' (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪), 'লাইং ভালেট' (২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪), জন হোমস্-এর বিয়োগান্তক নাটক 'ডগলাস' (আগস্ট, ১৮১৪), 'আর্ল অফ ওয়ারউইক' (নভেম্বর, ১৮১৪), 'দি ম্যাজিক পাইপ' (নভেম্বর, ১৮১৪)। কিন্তু বারবারই দক্ষ অভিনয়ের অভাবে নাটকগুলি দর্শক মন জয় করে মঞ্চ সফল হতে পারেনি। এরই মাঝে ১৮১৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয় এথেনিয়াম থিয়েটারের মালিকানা বদলের কথা। মূলত: আর্থিক অভাব, সফল অভিনয়ের অভাবে এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বারবার চেষ্টা করেও মি: মরিস নাট্যশালাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি।

৩০৩.১.১.৭ : চৌরঙ্গী থিয়েটার (CHOWRINGHEE THEATRE)

চৌরঙ্গী আর থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে (শেক্সপীয়র সরণী) ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকের অন্যতম নাট্যশালা চৌরঙ্গী থিয়েটার। নাট্যরসিক এবং অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্য হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন, পণ্ডিতপ্রবর হোরেস হেম্যান উইলসন, 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্টোকলার, হেনরী মেরেডিথ পার্কর, চতুর্থ উইলিয়মের একমাত্র পুত্র জর্জ ফিজ ক্লেয়ারেন্স, চার্লস প্রিন্সেস, উইলিয়ম লিন্টন প্রমুখ বিদেশি ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা, প্রচেষ্টা তথা উদ্যোগ কাজ করেছিল, এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পিছনে। চৌরঙ্গী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশীয়দের মধ্যে একমাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। বড়লাট লর্ড ময়রা এবং লেডি ময়রার উপস্থিতিতে ১৮১৩ সালের ২৫শে নভেম্বর যথেষ্ট জাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন হয় নাট্যশালাটির। প্রথম রাতে মঞ্চস্থ হয় বিয়োগান্তক নাটক 'কাস্‌ল স্পেকটার' এবং গীতবহুল নাটিকা 'সিক্সটি থার্ড লেটার'। অভিনয় সফল হয়েছিল; দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এবং অর্কেস্ট্রাবাদনেরও বিশেষ প্রশংসা হয়েছিল। বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রী স্টোকলার, ডয়েলী, লিন্টন, মিসেস এসথার লীচ, মিসেস ফ্যান্সিস প্রমুখেরা অভিনয় করেছিলেন উদ্বোধনের রাত্রে। পরেও একটার পর একটা মঞ্চ সফল অভিনয়ের (ওথেলো, লেডি অব লায়ন্স, দি ওয়াইফ, দি মার্চেন্ট অব ভেনিস, ম্যাকবেথ, দি আয়রল চেস্টা, বিজি বডি প্রভৃতি) দ্বারা চৌরঙ্গী থিয়েটারের সাফল্যের পালা অব্যাহত থাকে। নাট্য কুশলিনী অনেক অভিনেত্রীরও সমাগম হয়েছিল এই মঞ্চে; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মিসেস ফ্রান্সিস, গট্‌লিয়েবও, মিসেস চেস্টার প্রমুখ। বিশেষকরে সেই শতকের গুরুত্বপূর্ণ অভিনেত্রী মিসেস এসথার লীচের জন্য চৌরঙ্গী থিয়েটারের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। তবে এই নাট্যশালার আর্থিক অবস্থা কোনোদিনই সুস্থ ছিল না। ক্রমশ ঋণের বোঝা বেড়ে গেলে নাট্যশালা চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং রঙ্গালয়টিকে নিলামে তোলা হয় বিক্রির জন্য। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ত্রিশ হাজার একশ টাকার বিনিময়ে কিনে নেন রঙ্গালয়টি। অভিনয়, দৃশ্যপট, সাজসজ্জার উন্নতি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ১৮৩৯ সালের ৩১শে মে রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে নাট্যশালাটি ধ্বংস হয়ে যায়। বিদেশিদের নির্মিত ও অভিনীত উনিশ শতকের অন্যতম নাট্যশালা চৌরঙ্গী থিয়েটারের এই ভাবেই অবসান ঘটে।

৩০৩.১.১.৮ : দমদম থিয়েটার (DUM DUM THEATRE)

কলকাতার উপকণ্ঠে দমদমে একটি সেনাবাহিনীর ছাউনিতে ১৮১৭ সালে গড়ে উঠেছিল একটি ছোট্ট নাট্যশালা দমদম থিয়েটার। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নাট্যশালা ড্রুরি লেন থিয়েটারের নাম অনুসারে কলকাতার সে সময়ের পত্রপত্রিকাগুলোতে নাট্যশালাটিকে লিটল ড্রুরি নামে সম্বোধন করা হত। চৌরঙ্গী থিয়েটারের যখন খুব সুনাম চারদিকে, তখন দমদম থিয়েটারও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। দমদম থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক ছিলেন সৈনিকেরা। সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী এবং তাঁদের স্ত্রীরা এই নাট্যশালায় অভিনয় করতেন। দমদমে অবস্থিত এই নাট্যালয়টি আকারে ছোট হলেও ছিল বেশ সুন্দর। গোলন্দাজ সৈনিক চার্লস ফ্রাঙ্কলিং এই নাট্যশালার একজন কুশলী অভিনেতা ছিলেন। মিসেস এসথার লীচ চৌরঙ্গী থিয়েটারে যাওয়ার অগে এই

নাট্যশালাতেই অভিনয় করতেন। দমদম থিয়েটারে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রীরা ছিলেন মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস গট্‌লিয়ের, মিসেস ব্ল্যাণ্ড। দমদম নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল রাইভ্যাসস, দি উইল, ব্রোকন সোর্ড, দি পেজেন্স বয় প্রভৃতি নাটক। ১৮২৪ সালে চালর্স ফ্রাঙ্কলিং- এর মৃত্যুর পরপরই এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

৩০৩.১.১.৯ : বৈঠকখানা থিয়েটার (BOITHAKKHANA THEATRE)

চৌরঙ্গী থিয়েটারের সুখ্যাতির কালেই ১৮২৪ সালের ২৪শে মে ১৭৭ নং বৈঠকখানা রোডে প্রতিষ্ঠিত হয় বৈঠকখানা থিয়েটার। বাইরে থেকে সুন্দর না হলেও এই নাট্যালয়ের ভিতরের সাজসজ্জা ছিল যথেষ্ট সুন্দর। মিসেস ফ্রান্সিস, মিসেস কোহেন প্রমুখ অভিনেত্রীরা দমদম থিয়েটার থেকে এসে বৈঠকখানা থিয়েটার যোগ দেন। 'থ্রি উইক্‌স আফটার ম্যারেজ', 'স্লিপিং ড্রাফ্‌ট', 'বোম্বাসীটস', 'ফিউরিওসো', 'রম্প, দি লাইং ভ্যালেট', 'রেজিং দি উইণ্ড' প্রভৃতি নাটকের সার্থক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নাট্যশালাটি বেশ' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রবল সাফল্যের পাশাপাশি, প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারার কারণে, কিছুদিনের মধ্যেই বৈঠকখানা থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে যায়।

৩০৩.১.১.১০ : সাঁ সুসি থিয়েটার (SANS SOUCI THEATRE)

চৌরঙ্গী থিয়েটার আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর নাট্যরসিক মানুষজন বেশ হতাশ হয়ে পড়েন। আর সেই হতাশা কাটিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মিসেস লীচ ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এলে ডালহৌসী অঞ্চলে ওয়াটারলু স্ট্রীট ও গভর্নমেন্ট হাউস ইস্টের কোণে থ্যাকার কোম্পানীর দোকানের নীচে গড়ে ওঠে সাঁ সুসি থিয়েটার। এই নাট্যশালা নির্মাণে প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেন মি. স্টোকলার। নাট্যালয়ে প্রবেশপত্রের মূল্য ছিল স্টলের জন্য ছ'টাকা বক্সের জন্য পাঁচ টাকা এবং আপার বক্সের জন্য চার টাকা। প্রথম দিন থেকেই প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ থাকত। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে (চৌরঙ্গী থিয়েটার) প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম রজনীতে (২১শে আগস্ট, ১৮৩৯) অভিনয় হয়েছিল 'ইউ কান্ট ম্যারি ইয়োর গ্রাণ্ড মাদার' নাটক এবং 'বাট হাইএভার' ও 'মাই লিটল অ্যাডাপটেড' নামে দুটি গ্রহসন। পরবর্তীতে অভিনীত হয় 'ক্যাথেরিন অ্যান্ড প্যাট্রিসিও', 'মিন্সট্রেল', 'দি আয়রিশ লায়ন', দি ওয়েদার কক' প্রভৃতি নাটক। নাট্যশালাটি আকারে খুব ছোট থাকার কারণে, বহু দর্শক রোজই নাট্যশালায় এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হত। এই কারণেই মিসেস লীচ বড় প্রেক্ষাগৃহ তৈরির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেন। পার্ক স্ট্রীটে নির্মাণ হয় নতুন নাট্যশালা। এই নবনির্মিত নাট্যশালা নির্মাণে সেদিন অর্থ সাহায্য করেন বড়লাট অকল্যাণ্ড, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, জে. পি. গ্রান্ট, রাধানাথ ঠাকুর, স্যার জ্যাসপার নিকল্‌স, হেন্ডারসন, অধ্যাপক গুডিড, রাধামাধব ব্যানার্জি, এইচ. এম. পার্কার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। ১৮৪১ সালের ৬ ই মার্চ ওল্ড বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোডে (পার্ক স্ট্রীটে, আজ যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ) সাঁ সুসি থিয়েটারের উদ্বোধন হয় 'দি ওয়াউফ' নাটকটি অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। অভিনয় করেছিলেন মিসেস লীচ, স্টোকলার প্রমুখ শিল্পীরা। নাট্যশালাটির বাইরের এবং ভিতরের সাজসজ্জা তথা সৌন্দর্য মুগ্ধ করত মানুষকে। পরবর্তীকালে জেমস ব্যারী, মিসেস ডীক্‌ল্‌, মিসেস

ডাইনিং, মিস কাউলি, জেমস ভাইনিং প্রমুখেরা এই নাট্যশালায় এসে যোগ দেন। অভিনয় হয় 'চার্লস দি সেকেন্ড', 'দি ওয়েলচ গার্ল, 'স্ট্রোঞ্জার', 'দি জেন্টলম্যান ইন ব্লাক' প্রভৃতি নাটক। ১৮৪১ সালের ২রা নভেম্বর অভিনয়ের সময় মিসেস লীচের পোশাক-পরিচ্ছদে আগুন লেগে যায় এবং ১৮৪৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে। মিসেস লীচের হঠাৎ মৃত্যুতে নাট্যমোদী দর্শক বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে নাটকের দর্শক সংখ্যা কমতে থাকে। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও একে একে এই নাট্যালয় ছেড়ে বিদেশে চলে যান। মিসেস লীচ থেকে নিনা ব্যাক্সটার এবং মি: ব্যারীর কাছে নাট্যশালাটি হাতবদল হয়ে ঘুরতে থাকলেও এক অজ্ঞাত কারণে সাঁ সুসি থিয়েটারে দর্শক সংখ্যা আর বাড়ল না। ১৮৪৯ সালে ২১ শে মে এই নাট্যশালায় শেষ অভিনয় হয়। অভিনীত হয় 'মিসেস চার্লস গোর দি মেড্ অভ ক্রয়সী' এবং 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসের' কয়েকটি নির্বাচিত অংশ।

সাঁ সুসি থিয়েটার উঠে যাবার পরেও উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় বেশ কয়েকটি বিদেশি নাট্যশালা গড়ে ওঠে। নাট্যশালাগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তারা উল্লেখযোগ্য নাম। নাট্যশালাগুলি যথাক্রমে সেন্ট থিয়েটার, রয়াল থিয়েটার, জুভেনাইল থিয়োর, অপেরা হাউস, ফোর্ট উইলিয়ামে থিয়েটার রয়াল, গ্যারিসন থিয়েটার ইত্যাদি। বস্তুত ইংরেজদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত এদেশের প্রথম পর্বের নাট্যশালাগুলির গুরুত্ব বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অনস্বীকার্য। বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ইতিহাস ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক রীতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইংরেজদের পরিচালিত রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

৩০৩.১.১.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা রঙ্গালয়ে বিদেশী রঙ্গালয়ের প্রভাব কীভাবে পড়েছে তা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

২। বাংলা রঙ্গালয়ে বিদেশী রঙ্গালয় কতদিন স্থায়ী হয়েছে, বিস্তৃত আলোচনা করো।

একক - ২

লেবেডেফ

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.২.১ : লেবেডেফ ও বেঙ্গলী থিয়েটার

৩০৩.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.২.১ : লেবেডেফ ও বেঙ্গলী থিয়েটার (LEBEDEFF AND THE BENGALEE THEATRE)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরে ১৭৯৫ সালে গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ নামে একজন রুশ দেশীয় একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতার ডোমটোলায় (এজরা স্ট্রীট) প্রতিষ্ঠা করেন 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার'। ২৫ নং, ডোমটোলার ভবনটি ছিল জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের। লেবেডেফ মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় গৃহটি অধিগ্রহণ করে, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাঙালীর থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগে ১৭৯৫ সালের ৫ই নভেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের অনুলিপি এই প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ:

''MR. LEBEDEFF'S
New Theatre in the Doomtullah.
DECORATED IN THE BENGALIE STYLE
Will be opened very shortly with a play called
THE DISGUISE
The characters to be supported performers of both sexes,
To commence with Vocal and Instrumental Music, called
THE INDIAN SERENADE''

গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়ার ইয়ার শ্লাভল শহরে। খুব ছোট বয়সে চলে আসেন লেলিনগ্রাদে। এখানে শুরু হয় সঙ্গীত শিক্ষা। এরপর ইতালি, ভিয়েনা, প্যারিস, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সময় থাকেন তিনি। ১৭৮৫ সালে তিনি আসেন মাদ্রাজে। সেখানে যোগ দেন বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে। ১৭৮৭ সালে তিনি আসেন কলকাতায়। ক্রমশ কলকাতাতে নানা সঙ্গীতানুষ্ঠানের

মধ্যমণি হয়ে ওঠেন তিনি। এই সময়ই লেবেডেফ থিয়েটার গড়ার সংকল্প করেন। অনুমান করা যায় বঙ্গসংস্কৃতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই থিয়েটারের নামও হয় 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার'।

লেবেডেফ যখন কলকাতায় আসেন তখন বাঙালী সংস্কৃতির উপাচারে থিয়েটার বলে কিছু ছিল না। আমাদের কোর্ট-কালচারের মধ্যে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবিগান এমনকি টপ্পাও ছিল — থিয়েটার ছিল না। এদেশে প্রথম থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিল বিদেশিরা। সেখানে সবকিছুই ছিল বিদেশি। নাটকের ছিল বিদেশি নাম, দর্শকরা ছিল বিদেশি, অভিনেতারা বিদেশি, রীতি বিদেশি; সেখানে আমাদের প্রবেশ অবাধ ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর, বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের মতো কেউ কেউ সেখানে প্রবেশাধিকার পেলেও আমাদের জন্য ঘোষিত- অঘোষিত প্রবেশ নিষেধ এই রকমই একটা বিজ্ঞাপন থাকত।

এই বস্তুগত পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে লেবেডেফ ১৭৯৫ সালের ১লা জানুয়ারি জগন্নাথ গাঙ্গুলির বাড়ি ভাড়া করেন এবং উত্তরকালে আত্মকথায় লেখেন "সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার মঞ্চই করতেই হবে; পিছোলে চলবে না। সুতরাং দিন ঠিক হল ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর।" লেবেডেফ 'The Disguise' ও 'Love is the Best Doctor' নামক দুখানি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। অনুবাদ কর্মে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মাস্টারমশায় গোলকনাথ দাস। 'The Disguise' একটি অকিঞ্চিতকর নাটক, রচনা এম. জড্রেলের। 'Love is the Best Doctor' নাটকটি রচনা করেন ম্যলিয়ের। জানা যায় নাটক দুটি অনুবাদ করার পর লেবেডেফ মঞ্চের নক্সা তৈরি করেছিলেন। গোলকনাথ দাসকে দিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের দিয়ে দৃশ্যপট আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। নাটকের আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর 'The Disguise' বা কাল্পনিক সংবদল-এর অভিনয় হয়। প্রথম রাতে অনুদিত নাটকটির 'হ্রস্বীকৃত একাঙ্করূপ' অভিনয় হয়। দ্বিতীয় রাতে তিন অঙ্কের পুরো নাটকটিই অভিনীত হয়। সেক্ষেত্রে ১ম অঙ্ক বাংলায়, ২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্য 'মুর' ভাষায়, ২য় দৃশ্য বাংলায় ও ৩য় দৃশ্য বাংলায় ও ৩য় দৃশ্য হয় ইংরাজি ভাষায়। ৩য় অঙ্কের পুরোটা অভিনয় হয় বাংলা ভাষায়। প্রথম অভিনয়ে প্রবেশমূল্য ছিল গ্যালারির জন্য চার সিক্কা টাকা ও বক্সের মূল্য ছিল আট সিক্কা টাকা। এর পরেও ১৭৯৬ সালের ২১শে মার্চ এই নাটকের অভিনয় হয়েছিল। টিকিটের হার ছিল পীট ও বক্স উভয় ক্ষেত্রেই একটি স্বর্ণমোহর। লেবেডেফের বক্তব্য অনুযায়ী দুটি অভিনয়েই মঞ্চে কাঙ্ক্ষতি দর্শকের দেখা মিলেছিল। একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, অভিনয়ের আগেই লেবেডেফ গভর্নরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গদের সুবিধার জন্যই একটি দৃশ্য ইংরাজিতে অভিনয় করিয়েছিলেন।

লেবেডেফের মধ্যে অনেক স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি অশেষ প্রকার যত্ন করেছিলেন। থিয়েটারে বেঙ্গলী স্টাইলকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আসলে লেবেডেফ বিদেশি রঙ্গালয়ের সমান্তরালে বাঙালির থিয়েটার স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লেবেডেফের এত আয়োজন, শ্রম, পরিকল্পনা সবকিছুই যেন মুহূর্তে পন্ড হয়ে গেল। এক গভীর চক্রান্তের শিকার হলেন লেবেডেফ। শুধু নাট্যশালা ভস্মীভূত হল না, নানা মামলা মকদ্দমাতে জড়িয়ে পড়েন তিনি। জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে লেবেডেফ ১৭৯৭ সালের ২৩শে নভেম্বর ভারত ত্যাগ করেন। লেবেডেফ যে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পেরেছিলেন, সেটি আদৌ নাটক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। প্রথমত নাটকটির বিষয়বস্তু খুব উচ্চাঙ্গের নয়। দ্বিতীয়ত লেবেডেফ

যে অনুবাদ করেছিলেন তা মূলানুগ নয়। দেশীয় লোকের মনোরঞ্জনের জন্য লেবেডেফ যোগ করেছিলেন নতুন চরিত্র, নতুন ভাবনা। চরিত্রগুলির নাম গাউয়্যা, বাজিয়্যা, খুনিয়্যা প্রভৃতি। যুক্তি হিসেবে লেবেডেফ। 'Indian prefered mimiery and drollery'। লেবেডেফ 'The Disguise'-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন 'কাল্পনিক সংবদল'। 'অ্যাক্ট'কে বলেছেন ক্রিয়া, 'সিনে'র বঙ্গানুবাদ হয়েছে ব্যক্ততা। লেবেডেফ ব্যবহার করেছিলেন 'Indian Style (?)' এবং সেই কারণেই ব্যবহার করেছিলেন'Indian Serenade'। লেবেডেফের একক প্রচেষ্টার কারণে নাট্যশালা নির্মাণে এবং তার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ইংরাজি নাট্যশালার কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি বিবাদে জড়িয়েছেন বারবার। লেবেডেফের নাট্যশালায় প্রবেশমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ছিল না। নাটকের ভাষা বাংলা হলেও সে বাংলার গঠন রীতি ছিল ইংরাজি। ফলে সে নাট্যভাষা খুব সহজ বা বোধগম্য ছিল না। তবু আমরা এই লেবেডেফের কাছে এবং তাঁর নাট্যশালার কাছে নানা ভাবে ঋণী—কারণ

- মুষ্টিমেয়ের কাছে তাঁর থিয়েটার পৌঁছালেও মনে রাখতে হয়, লেবেডেফই প্রথম বাঙালিকে থিয়েটারের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।
- তিনিই প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, বাংলা ভাষাতেও নাটক লেখা সম্ভব।
- 'বেঙ্গলী স্টাইল'কে অগ্রাধিকার দিয়ে লেবেডেফ আমাদের ঊণতাবোধ দূর করেছিলেন।
- নতুন নাট্য বিষয়ের সন্ধান করেছিলেন লেবেডেফ। বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতার স্বাদ তিনি বহন করে আনতে পেরেছিলেন।
- লেবেডেফের জন্যই বোঝা গেল বাংলার মাটিতেও বিলিত ধরণের মঞ্চ স্থাপন করা সম্ভব।
- লেবেডেফ ব্যবহার করেছিলেন বাঙালির গান — 'প্রাণ কেমন রে করে, না দেখে তাহারে' অথবা 'গুণ সাগরে নাগর রায় নগর দেখিয়া যায়'।
- লেবেডেফই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালিরা mimicry and drollery পছন্দ করে। লেবেডেফ অবাঙালি ছিলেন, তাঁর নাট্যশালায় মুষ্টিমেয় দর্শক সমবেত হয়েছিলেন, প্রবেশমূল্য ছিল সাধারণের নাগালের বাইরে। লেবেডেফের সময় থিয়েটার পাগল মধ্যবিত্ত নট ও নাট্যকার দর্শকের জন্মই হয়নি। কিন্তু এও সত্য লেবেডেফের প্রণোদনা ইতিহাসের ধারায় এক অনিবার্য কেতন। পরবর্তীকালে আমাদের নাট্য নিকেতনে ঐ কেতন শ্রদ্ধা সহকারে সংরক্ষিত হয়েছে। বাংলা থিয়েটারের দুশো বছরের ইতিহাসে পুরোধা পুরুষ হলেন লেবেডেফ ও তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটার। প্রকৃতপক্ষে 'The Disguise' নাটকের নাট্যরূপ নেওয়ার সময় নাটকটিকে নানা দিক থেকে বাঙালির নাটক করে, তোলার চেষ্টা করেছিলেন লেবেডেফ। 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকের কাহিনিরূপ নির্মাণে দেখানো হয়েছে - ভোলানাথবাবু একজন সৎ ব্যক্তি, তাঁর প্রেমিকার নাম সুখময়। তাঁর বাস লক্ষ্ণৌতে। ভোলানাথবাবুর ভৃত্য রামসন্তোষের পত্নী যথেষ্ট ভাগ্যবতী। বিশেষ কাজে ভোলানাথবাবু রামসন্তোষকে নিয়ে কলকাতায় এসে এক ভ্রষ্টা নারী শশীমুখীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে সুখময় তার

প্রেমিককে পরীক্ষা করার জন্য ভাগ্যবতী ও রতনমণি নামক দুই সহচারীকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে মোহনচাঁদের ছদ্মবেশে ভোলানাথবাবুর কাছে থেকে জানতে পারেন শশীমুখীর কথা ভৃত্য রামসন্তোষ এরই মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী ভাগ্যবতীকে অন্য নারী ভেবে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়। মোহনচাঁদের বিবাহের আয়োজনের মধ্যেই একদিন মোহনচাঁদ ভোলানাথবাবুর কাছে শশীমুখী সম্পর্কে কদর্য মন্তব্য করে বসে। রামসন্তোষ কর্তার পত্র বারাঙ্গনাকে দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং উকিলের সাহায্য নেয়। কর্তা মোহনচাঁদের কাছে সুখময়ের ফটো দেখে ভীষণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। পরে আরো নানা ঘটনামালার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় যে, হবু স্বামীর প্রণয় পরীক্ষার জন্যই সুখময় ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। খুব স্পষ্ট যে, লেবেডেফের নাটকে নাটকের স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধু চরিত্রনামের ক্ষেত্রে নয়, স্থান-নামও প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি নাটকের মধ্যে লঘু রঙ্গপ্রিয়তা, করুণ রসের প্রভাব, আদি-রসাত্মক মন্তব্য বিশেষ স্মরণযোগ্য।

৩০৩.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে লেবেডেফের নাট্যশালার গুরুত্ব কতখানি আলোচনা করো।

একক - ৩

সখের নাট্যশালা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.৩.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.৩.২ : প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

৩০৩.১.৩.৩ : নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটার

৩০৩.১.৩.৪ : ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও অন্যান্য

৩০৩.১.৩.৫ : প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার

৩০৩.১.৩.৬ : আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর থিয়েটার

৩০৩.১.৩.৭ : রামজয় বসাকের নাট্যশালা

৩০৩.১.৩.৮ : গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা

৩০৩.১.৩.৯ : চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা

৩০৩.১.৩.১০ : বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

৩০৩.১.৩.১১ : বেলগাছিয়া নাট্যশালা

৩০৩.১.৩.১২ : মেট্রোপলিটান থিয়েটার

৩০৩.১.৩.১৩ : পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

৩০৩.১.৩.১৪ : শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি

৩০৩.১.৩.১৫ : জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

৩০৩.১.৩.১৬ : বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

৩০৩.১.৩.১৭ : কলকাতায় ও মফস্বলে বিচ্ছিন্ন অভিনয়

৩০৩.১.৩.১৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.৩.১৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.১.৩.১ : ভূমিকা

বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্ম সংগ্রামের গর্ভে, তার পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সাংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। প্রতি পদক্ষেপে রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কখনও সংগ্রাম করতে হয়েছে, বিদেশি শাসকচক্রের নানা অপশাসনের বিরুদ্ধে, কখনও বা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে, আবার কখনও কখনও বাংলা রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরেই ঘটেছে তীব্র আদর্শের সংগ্রাম। বস্তুত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা নাট্যশালার এক একটি প্রয়াস। লেবেডেফ প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী থিয়েটার' থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার কালসীমাকে ধরে, অর্থাৎ ১৭৯৫ সাল থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যবর্তী সময় সখের থিয়েটারের বা শৌখিন রঙ্গালয়ের কাল সেইরকমই বাংলা নাট্যশালার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসকাল রূপে চিহ্নিত। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সখের থিয়েটারের গড়ে ওঠার পিছনে কাজ করেছে বিদেশিদের নাট্যচর্চার প্রণোদনা। পাশাপাশি দেশীয় ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের আনন্দের জন্য বা আমোদ উপভোগের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চ । কখনও কখনও ইংরেজের কাছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার উদ্দেশ্যেও দেশীয় বিত্তবানেরা নাট্যশালা স্থাপন করেছিলেন। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সখের নাট্যশালাগুলি প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা নাট্যচর্চা এবং বাংলা রঙ্গমঞ্চ এক ধারাবাহিক অগ্রসরতা লাভ করেছে।

১. সখের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পিছনে যেমন আয়োজকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি অভিনয় ও মঞ্চ -ভাবনার ক্ষেত্রেও দর্শক রুচির তুলনায় আয়োজকদের রুচি ও মতামত বেশি বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছিল।

২. নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হত না, বিলাসের খেয়ালী কল্পনার সাথে সে যুগের নাট্য বিষয়টাও সংযুক্ত ছিল।

৩. অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আয়োজকরা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করার জন্য, দর্শক মহলের মন সর্বদা রাখা যেত না।

৪. স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অভাব; বাড়ির উঠান, দালান, প্রশস্ত নাটমন্দিরের ব্যবড়ার শৌখিন থিয়েটারের অন্যতম অঙ্গ।

৫. দর্শক আসনও পূর্ণ হত আয়োজকদের ইচ্ছা এবং সম্পর্কের উপর।

সুতরাং, সেদিনের নাট্যশালায় নাটক পরিদর্শনের সুযোগ সকলের জন্য ছিল না, নাটকেরও উপায় ছিল না পরিবারিক আমোদ, উল্লাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার। তবু বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সেদিনের অভিনয়, নাট্য প্রচেষ্টা আজ অগ্রগতির লিপিমালায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

৩০৩.১.৩.২ : প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার

'গৌড়ীয় সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার আগে ১৮৩১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়—"ঐ নর্তনশালা ইঙ্গলন্ডীয় রীত্যানুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলন্ডীয় ভাষায়।" একদিকে চৌরঙ্গী থিয়েটারের জনপ্রিয়তা এবং প্রতিষ্ঠাতার ইংরেজ প্রীতির কারণে হিন্দু থিয়েটার বিদেশি রঙ্গালয়ের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাই হিন্দু থিয়েটারে অভিনীত নাটকের ভাষাও ছিল ইংরাজি। প্রসন্নকুমার ছাড়াও এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাচরণ সেন, রামচন্দ্র মিত্র, নাট্যকার হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, মাধব মল্লিক প্রমুখ ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গ। প্রথম রজনীতে (১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৩১) শেক্সপীয়রের 'জুলিয়ার সিজার' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং এইচ. উইলসন কর্তৃক অনূদিত 'উত্তররামচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক এই মঞ্চে অভিনীত হয়। ১৮৩২ সালের ২৯ শে মার্চ 'Nothing Superfluous' নামে একটি প্রহসনও এই মঞ্চে অভিনীত হয়। "কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়রদের মধ্যে এক নর্তনাগার গ্রন্থন নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারের এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম সকল নির্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুক্তবাবু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুক্তবাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্তবাবু হরচন্দ্রঘোষ।

৩০৩.১.৩.৩ : নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটার

বর্তমানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর কাছে ছিল, সেকালের অন্যতম ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নবীন বসুর অট্টালিকা, উদ্যান, পুকুর ইত্যাদি। এই নবীন বসুর বাড়িতেই দু লক্ষ টাকা খরচ করে, প্রতিষ্ঠিত হয় একটি নাট্যশালা। নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের প্রেরণা কাজ করেছিল। নাট্যশালাটির প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে পন্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে। কেউ মনে করেন প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩১ সাল (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি), কেউ মনে করেছেন ১৮৩৩ (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত), আবার কারও মতে ১৮৩৫ সাল (ড. দর্শন চৌধুরী)। স্মরণীয় এই নাট্যশালাতে অভিনীত হয়েছিল বাংলা নাটক। কিন্তু বাংলা নাটক তখন না থাকার জন্য নবীনচন্দ্র বেছে নেন, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি অবলম্বনে 'বিদ্যাসুন্দর' পালা। রামতনু মগ নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে নবীনচন্দ্র বসু 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রা দেখে সবিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর শ্যামবাজার থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। নবীন বসুর নাট্যশালায় প্রতি রাতে প্রায় এক হাজার দেশীবিদেশি দর্শকের সমাগত ঘটত। নাটকের দৃশ্যগুলি বাড়ির নানা জায়গায় সাজিয়ে রাখা হত। যেমন নবীন বসুর বৈঠকখানায় সজ্জিত হয়েছিল বীরসিংহের দরবার, উদ্যানের একপাশে সজ্জিত হয়েছিল, মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ । দর্শকদের অভিনয় দেখার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উঠে যেতে হত। রাত সাড়ে বারোটা থেকে অভিনয় চলত সকাল সাড়ে ছটা পর্যন্ত। নাটকে ব্যবহার হত ঐকতান বাদন (সেতার, সারেঙ, পাখোরাজ,

বেহালা প্রভৃতি)। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছিলেন সুন্দরের ভূমিকায়, ষোল বছরের কিশোরী রাধামণি অভিনয় করেছিলেন, বিদ্যার ভূমিকায়, মালিনীর ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন জয়দুর্গা এবং বিদ্যার দাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাজকুমারী। সমকালীন যাত্রার অনুসরণে নবীন বসু নিজে 'কালুয়া' এবং রাজা বৈদ্যনাথ রায় 'ভুলুয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আলোর ব্যবহার ঘটেছিল মঞ্চে । অভিনয় সম্পর্কে দেশি ও বিদেশি দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। তবে একথা সত্য যে নবীন বসুর শ্যামবাজার নাট্যশালা সমকালীন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত জনসমাজে বিশেষ উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ এই নাট্যশালাতে যাত্রা ও থিয়েটারের একটা সমন্বয় ঘটেছিল। তৈরি হয়েছিল 'বিলাতী যাত্রা' এবং 'স্বদেশী থিয়েটারের' একটা মিশ্র রূপ। নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারই বাঙালির তৈরি প্রথম নাট্যশালা যেখানে অভিনয় হয়েছে বাংলা নাটকের। অর্থাৎ নবীন বসু প্রমাণ করে দিয়েছিলেন বাংলা ভাষাতেও নাটক লেখা যায় এবং বাংলা ভাষাতেই তার অভিনয় সম্ভব। মূলত নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার থিয়েটার সমকালীন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। বাঙালি নির্মিত নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়, নারী চরিত্রে নারীর উপস্থিতি, আলোর ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে শ্যামবাজার থিয়েটার বাংলা রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর ঘটিয়েছিল। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য জনপ্রিয় নাটকের উপস্থাপনা, 'কালুয়া-ভুলুয়া' প্রসঙ্গ , প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অপূর্ব সমন্বয় ইত্যাদি কারণে, শৌখিন নাট্যশালার ইতিহাসে শ্যামবাজার থিয়েটার আজও স্মরণীয় নাম। তাই 'হিন্দু পাইওনিয়র' পত্রিকা এই নাট্যশালায় নারীদের অভিনয় নিয়ে শুধু প্রশংসা করেনি, সমাজ সংস্কার ও নারী প্রগতির বিষয়েও যে এই নাট্যশালার অবদান গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে লিখেছিল — "দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ অপ্রত্যাশিত একটি ব্যাপার ঘটিতে পারিয়াছে, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না ? ..... এই অভিনয়ের দ্বারাই কি হিন্দু দর্শকের নিকট প্রমাণিত হইবে না যে, যতদিন পর্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, ততদিন তাহারা সমাজে অবর্তমান বলিলেই চলে।"

৩০৩.১.৩.৪ : ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও অন্যান্য

প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র বসুর পর তৃতীয় বাঙালি হিসেবে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি নাট্যশালা 'দি ওরিয়েন্টাল'। ১৮৭২ সালের ১১ ডিসেম্বর 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রিকায় এই নাট্যশালাটির উল্লেখ পাওয়া যায় মাত্র। নাট্যশালাটির বিস্তৃত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

এই সময়ে বাংলাদেশে ডেভিড হেয়ার একাডেমির রঙ্গমঞ্চ ছাড়া আর কোনো নাট্যপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। ১৮৫৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ডেভিড হেয়ার একাডেমিতে একটি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় করা হয়। অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'। নাটকটি দু'বার মাত্র অভিনয় হয়েছিল। অভিনয়ের প্রশংসার বিবরণ পাওয়া যায় সংবাদ প্রভাকর এবং বেঙ্গল হরকরা পত্রিকায়।

১৮৫৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ২৬৮ নম্বর চিৎপুর রোডের ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে একটি নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালাটি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামে পরিচিত। গৌড়মোহন অঢ্যের বাঙালি

ছাত্রদের মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত প্রমুখেরা এই নাট্যশালাটিতে অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। সাঁ সুসি থিয়েটারের মি. ক্লিঙ্গার ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের ছাত্র-অভিনেতাদের শিক্ষা দিতেন। এখানে 'ওথেলা' নাটকটি ১৮৫৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খুব সার্থকভাবে অভিনীত হয়। পরে শ্রীমতি ইলিস-এর তত্ত্বাবধানে অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের আরও দুটি নাটক — 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' ও 'হেনরি দি ফোর্থ'। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপদেশে কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিরা বহুবার চেষ্টা করেন এই নাট্যশালাটিতে দেশীয় নাটক ও দেশীয় বাদনের প্রচলন করতে। বাংলা নাটকের অভিনয়ের জন্য সাময়িক পত্রেও দর্শকদের মধ্যে দাবি প্রবল হয়েছিল। কিন্তু তা তো হয়নি এবং দুবছরের মধ্যেই এই নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়।

৩০৩.১.৩.৫ : প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার

নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের ৩রা মে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার মতো এখানে বাংলা নাটক অভিনীত হল না। প্যারীমোহন নিজে ছিলেন, ইংরাজি ভাষার পৃষ্ঠপোষক, তাই জোড়সাঁকো থিয়েটারে অভিনীত হয় ইংরাজি নাটক 'জুলিয়াস-সিজার'। প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টিতে সে রাতে কলকাতা বিপন্ন হলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে অস্বীকার করে প্রায় চারশ দর্শক সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। মহেন্দ্রলাল বসুর পিতা বজ্রলাল বসু এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন, মহেন্দ্রনাথ বসু অভিনয় করেছিলেন জুলিয়াস সীজারের চরিত্রে, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ক্যাসিয়াসের চরিত্রে এবং কৃষ্ণধন দত্ত ব্রুটাসের চরিত্র অভিনয় করেছিলেন। নাটকের ট্র্যাজেডি সকলকে অভিভূত করেছিল। সংবাদ প্রভাকর এবং হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় নাটকের সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা এবং অভিনেতাদের সুখ্যাতি করা হলেও জোড়াসাঁকো কর্তৃপক্ষের ইংরাজি নাটক অভিনয়ের প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে পারেনি। অচিরে বন্ধ হয়ে যায় জোড়াসাঁকো থিয়েটারের দ্বার। এই পত্রিকা জোড়াসাঁকো কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য যে আবেদন পাঠায় তা আসলে যুগেরই আবেদন — "let the Jorasankowallahs take in hand a couple a good Bengali plays and we will promise them success." আবার জোড়াসাঁকো থিয়েটারে হিন্দু যুবকদের দ্বারা ইংরেজি নাটকের মূলভাব ধরে রাখার ক্ষেত্রে, যেমন সমস্যা তৈরি হয়, তেমনি নিজেদের মধ্যেও শুরু হয় এক গভীর অন্তর্কলহ। পাশাপাশি বাংলা নাটকের অভিনয় এবং বাংলা ভাষায় নাটক অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের বেশ কিছু প্রয়াস মানুষকে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের প্রতি বিমুখ করেছিল বলে জানা যায়।

৩০৩.১.৩.৬ : আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর থিয়েটার

সখের নাট্যশালা বা শৌখিন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আশুতোষ দেবের থিয়েটার একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বরং বলা আশুতোষ দেবের থিয়েটারের সময়কাল থেকেই সখের থিয়েটারের বিকাশ পর্ব লক্ষ করা যায়। বসু পরিবার, ঠাকুর পরিবার, সিংহ পরিবার ও ঘোষ পরিবারের উদ্যোগে এই সময়ের নাট্যশালাগুলিতে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে অনুবাদ করা নাটকের অভিনয় শুরু হয়। সমাজ সমস্যার

বিভিন্ন দিক নাটকের মধ্যে দিয়ে, প্রকাশ করার চেষ্টা করা করা হয়। মঞ্চের উন্নতির দিকেও বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়। সমকালীন পত্রপত্রিকাগুলিতেও উন্নত নাট্যশালা নির্মাণের জন্য উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে অনুরোধ জানানো হত। বলাবাহুল্য এই উৎসাহ থেকেই সাতুবাবুর বাড়িতে 'জ্ঞানদায়িণী সভা'র সভ্যেরা সাতুবাবুর মৃত্যুর পর একটি নাট্যশালা নির্মাণ করে, বাংলা নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে আশুতোষ দেবের দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং চারুচন্দ্র ঘোষের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন আশুতোষ দেবের রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয় মহাকবি কালিদাসের লেখা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র বাংলা অনুবাদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। নাটকটি অনুবাদ করেছিলেন নন্দকুমার রায়। অভিনয় করেছিলেন প্রিয়মাধব মল্লিক, অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি। মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। কবিচন্দ্রের লেখা একটি গান এই নাটকে গাওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। শকুন্তলা অভিনয়ের দিন প্রায় চারশ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। নাটকের এবং নাট্যশালার স্তুতি প্রকাশ হয়েছিল বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকাতে। আর পত্রপত্রিকাগুলির প্রশস্তিতে উৎসাহিত হয়ে আশুতোষ দেবের থিয়েটারের পরিচালকেরা ২২শে ফেব্রুয়ারি এবং ২৩শে জুলাই 'শকুন্তলা' নাটকটি পুনরায় অভিনয় করেন।

এই মঞ্চেই ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হয় 'মহাশ্বেতা'। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ করেন মণিমোহন সরকার। এই নাটকে শরৎচন্দ্র ঘোষ তরলিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাদম্বরী চরিত্রে নারী ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন একটি বালক চরিত্র। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভুবনমোহন ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে 'মহাশ্বেতা' নাটকটির অভিনয় সাফল্য শকুন্তলা নাটককে স্পর্শে করতে পারেনি। নাটকটির সংলাপ যেমন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি অভিনেতারাও অভিনয়ের বিষয়ে সুশিক্ষিত ছিলেন না। সবমিলিয়ে 'শকুন্তলা' এবং 'মহাশ্বেতা' এই দুটি নাটকেরই অভিনয় হয়েছিল আশুতোষ দেবের থিয়েটারে। ড. অজিত কুমার ঘোষ 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে অবশ্য জানিয়েছেন— "শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের একমাস পরেই (১৮৫৭, মার্চ) প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্বের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়"। দুটি নাটকই অনুবাদ করা। প্রযোজনা, সংগীত পরিচালনা, মঞ্চ উপস্থাপনা কোনোদিক থেকেই এই নাট্যশালা কৃতিত্বের দাবি করে না। তবু বাংলা রঙ্গমঞ্চের জাগরণে সাতুবাবুর থিয়েটার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাতুবাবুর থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির নাট্যশালাতে ইংরাজি নাটকের অভিনয় পুরোপুরি বন্ধ হল। সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ হল, মৌলিক বাংলা নাটকের অভাব দেখা দিল বাংলা নাট্যজগতে। এছাড়া পরবর্তীকালে সাতুবাবুর থিয়েটারের উদ্যোক্তারা শরৎচন্দ্র ঘোষ ও চারুচন্দ্র ঘোষ যে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠায় অবশ্য করে কাজ করেছে সাতুবাবুর থিয়েটারের অনুপ্রেরণা এবং অভিজ্ঞতা। জড়োয়ার গহনা পরে শরৎচন্দ্র যখন শকুন্তলার বেশে মঞ্চে প্রবেশ করেন, তা দেখে দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে যান। তাই শকুন্তলা সম্পর্কে Hindu Intelligence পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল - "To see simple Shakuntolah clothed in the splendid garments of the richest Hindu girls and decorated in the most precious jewels brings to our mind a painful sight of the murder of truth and nature."

৩০৩.১.৩.৭ : রামজয় বসাকের নাট্যশালা

সখের নাট্যশালার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে রামজয় বসাকের নাট্যশালা তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। কলকাতার বিখ্যাত ধনী রামজয় বসাক তাঁর চড়কডাঙার বাড়িতে (টেগোর ক্যাসল রোড) স্থাপন করেন, একটি নাট্যালয়। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নির্দেশ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা, যখন দেশীয় নাটক অভিনয় ও দেশীয় ঐকতান বাদনের দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হলেন, তখনই তাঁরা গড়ে তুললেন নতুন নাট্যশালা তথা নতুন নাট্যসম্প্রদায়। অবশ্যই এই নাট্যসম্প্রদায় বা নাট্যশালা গড়ে তোলার পিছনে রামজয় বাবুর অর্থানুকূল্য বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতার নতুন বাজারে চড়কডাঙায় রামজয় বসাকের বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয় সমকালীন সমস্যাভিত্তিক নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। নাটকটি এখানে মোট চার রাত্রি অভিনয় হয়। সমগ্র বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে যখন ইয়ংবেঙ্গল থেকে শুরু করে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা সামাজিক আন্দোলন গঠন করেছেন; তখন এই নাটক অবশ্যই বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল মানসিকতার স ঙ্গে জোয়ার এনেছিল। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে কুলীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও রাধাপ্রসাদ বসাক, রামজয় বসাক, নারায়ণচন্দ্র বসাক, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অভিনয়ও ছিল উল্লেখযোগ্য। আর সবকিছুর উদ্যোক্তা ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বস্তুত রামজয় বসাকের নাট্যশালা বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সেই নাট্যশালা যেখানে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকের অভিনয় হয়। পাশাপাশি সমকালীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে, রচিত নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এই নাট্যশালাই প্রথম প্রতিবাদের নাট্যভাষা গড়ে তোলে। সামাজিক নিপীড়ন থেকে অব্যাহতি পেতে জনসাধারণ এবং সমাজ সংস্কারকদের মনের কথার প্রথম রূপায়ণ ঘটেছিল 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র মধ্যে দিয়ে। তাই ১৮৫৭ সালের ১৯ মার্চ 'এডুকেশন গেজেটে' এই অভিনয় সম্পর্কে বিস্তৃত খবর প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় লেখা হয় — "The Educational gazette state that the well-known force of Koolin Kulo Sharabasyh was acted in the private rresidence of a Baboo in calcutta with great success."

৩০৩.১.৩.৮ : গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালা

বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাট্যসম্প্রদায় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় করেন ১৮৫৮ সালের ২২শে মার্চ। এ নাটকে উদরপরায়ণ ও ঘটকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, রাধাপ্রসাদ বসাক এবং ধর্মশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, শিক্ষক শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই নাট্যাভিনয় দেখতে এসেছিলেন। নাটকে দর্শক উপস্থিত ছিলেন প্রায় সাতশ'। কেউ কেউ মনে করেছেন রামজয় বসাকের নাট্যশালার থেকে গদাধর শেঠের বাড়ির নাট্যশালায় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের নাটকের অভিনয় অনেক উন্নত হয়েছিল।

৩০৩.১.৩.৯ : চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ির নাট্যশালা

কলকাতায় জনপ্রিয়তালাভের সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি কলকাতার বাইরেও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৮ সালের ৩রা জুলাই চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের পুত্র শ্রীনাথ পালের উদ্যোগে তাঁদের বাড়িতে অভিনীত হয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেন প্রবোধচন্দ্র মন্ডল। প্রথম রজনীর অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রায় নয়শ' দর্শক। গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ভাটপাড়া থেকে বহু কুলীন ব্রাহ্মণও এই নাটক দেখতে এসেছিলেন এবং বিরোধিতাও করেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ থেকে জানা যায় ৫ই জুলাই রবিবার এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। প্রসিদ্ধ গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী এই নাটকের অভিনয়ের জন্য গান রচনা করেছিলেন এবং অভিনেতাদের তালিমও দিয়েছিলেন। 'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে' — নটীর কণ্ঠে এই গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে এই নাট্যশালা তথা নাট্যাভিনয়ের বিবরণ মেলে।

৩০৩.১.৩.১০ : কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার থেকে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত, যে শৌখিন নাট্যশালাগুলির উদ্ভব হয়েছিল, সেগুলো পরিচালনা করত কলকাতার ধনশালী ব্যক্তিবর্গ। কলকাতা সমাজের ধনকুবের, বিলাসী এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বাড়িতে স্থাপন করেন, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ । বিদ্যোৎসাহি ও সাহিত্যরসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বাড়িতে একটি সাহিত্যসভার সূচনা করেছিলেন ১৮৫৩ সালে। এই সাহিত্যসভার নাম ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। স্মরণ করতে হয়, কবিশ্রী মধুসূদনকে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র জন্য প্রশংসাপত্র দিয়েছিল, এই সাহিত্যসভা। বস্তুত সাহিত্য জগতের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বাংলা রঙ্গমঞ্চের। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র সঙ্গে যুক্ত এই নাট্যালয়ই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ নামে খ্যাত হয়। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ একবছর পর ১৮৫৭ সালের ১১ই এপ্রিল শনিবারে অভিনীত হয়ে ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার'। নাটকটি অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'বেণীসংহার' নাটকে কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন ভানুমতী চরিত্রে। কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিময় সরকার অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। দুর্যোধনপত্নী ভানুমতীর ভূমিকায় অভিনয় কুশলতা দেখান মহেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেশি ও বিদেশি ব্যক্তিরা। অতিথিদের প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়েছিল। ভানুমতীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কালীপ্রসন্ন পরিধান করেছিলেন প্রায় এক লাখ টাকা মূল্যের জড়োয়া গয়না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 'বেণীসংস্থার' অভিনয়ের সুখ্যাতি প্রকাশ হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'স্মৃতিকথায়' বলেছেন —

> "দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stage - এর উপর ঝলমল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কিনা জানিনা।"

এরপর মহাকবি কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং। ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘বিক্রমোর্বশী’র অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ২৪শে নভেম্বর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় হয়। এ নাটকে কালীপ্রসন্ন অভিনয় করেন পুরুরবার ভূমিকায়। পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন যে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও অভিনয় করেছিলেন এই নাটকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনা ‘সাবিত্রী সত্যবান’ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। এই মৌলিক নাটকটি অভিনয়ের জন্য রচিত হলেও এটি ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়নি। তবে গীতবাদ্য সহযোগে এই নাটকটি পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে লেখক বলেছেন —

> “এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাটক যে রূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপ পঠিক হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবার তাহা যন্ত্রের সহিত মিলিইয়া গান করা যাইবেক।” [বঙ্গীয় নাট্যশালা — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

১৮৫৯ সালে ‘মালতী মাধব’ নাটকটিও এভাবেই পাঠ করা হয়েছিল। অবশ্য ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকের পর আর কোনো নাটক এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শুধু অভিনয়ের জন্য নয় নাটকের ‘আভিনয়িক পাঠের’র জন্যও বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্মরণীয়। মাত্র দুই বছর স্থায়ী হলেও এই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে পাইকপাড়ার রাজারা স্থাপন করেছিলেন, বেলগাছিয়া নাট্যশালা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অভিনীত হওয়ার জন্য। রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, মঞ্চের সার্বিক উপকরণ এবং আবহসঙ্গীতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই রঙ্গমঞ্চেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্যপ্রথায় মঞ্চ নির্মাণ, অভিনয়ের মধ্যে নতুনত্ব এবং মঞ্চে প্রাচীন নাট্যব্যক্তিত্বদের মূর্তি ও চিত্র স্থাপনার মধ্যে দিয়ে সে যুগের পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চকে স্মরণীয় করে রাখে।

৩০৩.১.৩.১১ : পাইকপাড়ার বেলগাছিয়া নাট্যশালা

‘শর্মিষ্ঠা’ (১৮৫৯) নাটকের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় কবি মধুসূদন দত্ত কৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছিলেন—

“যদি কোনোদিন আমাদের দেশে নাটক নামক শিল্পটির বিকাশ ঘটে, তাহলে উত্তরপুরুষেরা নিশ্চয় ভুলবেন না এই মহান ভদ্রমহোদয়গণকে, যারা জাতীয় নাট্যশালার একেবারে ঊষালগ্নের বন্ধু।” উক্তিটি বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রসঙ্গে মনে রাখবার মতো। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। সিংহ পরিবারের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে ‘Our Own Club’ নামক একটি সংস্থা গড়ে ওঠে, গৌরদাস বসাক ছিলেন এই সংস্থার সম্পাদক। পরবর্তীকালে এই সংস্থাটিই বেলগাছিয়া থিয়েটারে পরিণত হয়। তৎকালীন সমস্ত পত্রপত্রিকা এবং বিশিষ্ট অভিনেতা গৌরদাস বসাকের ‘স্মৃতিকথা’ থেকে জানা যায়, সে যুগের প্রায় সব নব্য শিক্ষিত বাঙালিই এ মঞ্চের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আশুতোষ দেবের বাড়িতে ‘শকুন্তলা’ অভিনয়ের সময় কলকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এবং বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। বেলগাছিয়ার

রাজারা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য নাটকের রসাস্বাদন করেছিলেন। মধুসূদনের জীবনীকার লিখেছেন, অভিনয় শেষ হলে; -

"যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেন - দেখুন দু' একদিনের জন্য আমোদে এত অর্থ ব্যয় না করে, একটি স্থায়ী মঞ্চ স্থাপন করলে বোধহয় অধিক উপকার হয়।" ঈশ্বরচন্দ্র আগে থেকেই উদ্যোগী ছিলেন, সেই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রতাপচন্দ্র। স্থির হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার সুন্দর উদ্যানবাটীটিতে নাট্যশালা স্থাপন হবে। এরপর মহাসমারোহে নাট্যশালা স্থাপিত হলে অভিনয়ের উদ্যোগ চলতে থাকে। ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ার নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয় 'রত্নাবলী' নাটক, শ্রীহর্ষের নাটক, অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখতে এসেছিলেন ছোটলাট হেলিডে সাহেব, মি: হিউম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। নাটকটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছ'সাতবার অভিনীত হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের ব্যাপারটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখেই মধুসূদন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। পাইকপাড়ার রাজাদের অনুরোধে তিনি 'রত্নাবলী' নাটকটির ইংরাজিতে অনুবাদও করেন। 'শর্মিষ্ঠা'তে 'রত্নাবলী'র প্রভাব আছে।

বেলগাছিয়ার রাজারা শুধু স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করেননি, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন একটা নতুন সংস্কৃতি, একটা নতুন ভাবাবেগ জাতির শিকড়ে প্রবেশ করছে। বলাবাহুল্য সেই প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল 'রত্নাবলী'র অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, বেলগাছিয়ার আয়োজনের মধ্যে একটা সম্পূর্ণতা ছিল। অভিনয়, সাজসজ্জা, গীতবাদ্য সবকিছুর মধ্যেই ছিল পরিচ্ছন্নতার ছাপ। ঐকতান বাদনের দায়িত্বে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ পাল। নাট্য পরিচালক ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, তিনি নিজে অভিনয়ও করতেন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। জানা যায় সিংহ পরিবার বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য ব্যয় করেছিলেন চল্লিশ হাজার টাকা। ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়। রাজা, যযাতি, মাধব্য, শুক্রাচার্য, শিষ্য কপিল ও সেনাপতি বকাসুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, যথাক্রমে প্রিয়নাথ দত্ত, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীননাথ ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই অভিনয়ের মূল্য অসীম। 'শর্মিষ্ঠা'র আখ্যাপত্রটি স্মরণ করলেই বোঝা যায় — 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা'র সাফল্যে আনন্দিত হন বেলগাছিয়ার রাজারাও। এরপর বেলগাছিয়ার রাজারা মহরায় নিয়ে এলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা', প্রতিবাদ করে ওঠেন ইয়ংবেঙ্গলের দল। রাজারা মহরায় বন্ধ করে দেন। আহত হন মধুসূদন। এবার লেখেন 'কৃষ্ণকুমারী'। কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হয় না, বিশেষ করে ১৮৬১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুতে নাট্যশালার দরজাও যায় বন্ধ হয়ে।

বস্তুত বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বেলগাছিয়া এক বন্দিত নাম। এই শৌখিন মঞ্চেই বাঙালির নাটক ও নাট্যমঞ্চের ভাগ্যলিপি রচিত হয়েছিল। বেলগাছিয়াতেই নাট্যকার মধুসূদন পাশ্চাত্য স্রোতকে বহন করে আনার চেষ্টা করেছিলেন। আর মূলত বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্যই মধুসূদন লিখেছিলেন 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা'। 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ' নাটক ও প্রহসন। রাজারাও সমীহ করেছিলেন মধুসূদনকে। স্বভাবে 'ফিউডাল লর্ড' হলেও ধনবাদী সভ্যতায় বিকর্ষণে রেনেশাঁসে সামিল

হয়েছিলেন বেলগাছিয়ার রাজারাও। তাই শুধু সখ নয়, বাংলা নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলার পিছনে বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোগ অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকে। রামনারায়ণ অনুবাদের কারণে পারিশ্রমিক পান দুশো টাকা। নাটকের নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন — রাজার ভূমিকায় প্রিয়নাথ দত্ত, সেনাপতির ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, বিদূষকের ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, মন্ত্রীর ভূমিকায় গৌরদাস বসাক, সূত্রধরের ভূমিকায় ক্ষেত্রনাথ গোস্বামী, বাহুভূতির ভূমিকায় গিরিশ চট্টোপাধ্যায়, বাসবদত্তার ভূমিকায় মহেন্দ্র গোস্বামী, বাজিকরের ভূমিকায় শ্রীনাথ সেন। এছাড়াও নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নবীন মুখোপাধ্যায়, অঘোরচন্দ্র, যদুনাথ ঘোষ, রমানাথ লাহা, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মল্লিক, হেমচন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব। সঙ্গীত রচনা করেছিলেন গুরুদয়াল পাল এবং নাট্যশিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ বেলগাছিয়া নাট্যশালার মধ্যে দিয়েই সেকালের শিক্ষিত বাঙালি ও নাট্যপ্রিয় মানুষেরা এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলেন। নাট্যপ্রিয় মানুষেরা বেলগাছিয়া নাট্যশালার মধ্যে দিয়েই দেখেছিলেন শৌখিন নাট্যশালার এক নবরূপকে । সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালা যে, দ্বদেশীয়ানাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তা এককথায় অভিনব। সর্বোপরি এইরঙ্গমঞ্চে বিদেশি নাটকের পরিবর্তে স্বদেশী নাটকের যে প্রবর্তনা ঘটে, তা যেন বাংলা নাটক রচনার আগামী সুরকে নির্দেশিত করে।

৩০৩.১.৩.১২ : রামগোপাল মল্লিকের মেট্রোপলিটান থিয়েটার

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের এক অংশে ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, মেট্রোপলিটান থিয়েটার। রামগোপাল মল্লিকের অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত এ মঞ্চে বিধবা বিষয়ক নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। ১৮৫৯ সালের ২৩শে এপ্রিল অভিনীত হয়, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই নাট্যশালাতে ব্যয় করা হয়েছিল প্রচুর অর্থ। প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুরলীধর সেন এই নাট্যশালার জন্য দিয়েছিলেন চার হাজার টাকা। 'বিধবা বিবাহ' নাটকের দৃশ্যপটগুলি এঁকেছিলেন মি: হলবাইন। অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং স্বত্বাধিকারী ছিলেন মুরলীধর সেন। বিখ্যাত অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একাধিকবার এই নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন এবং বিধবাদের জন্য কেঁদে উঠেছিল তাঁর মহৎ প্রাণ। 'বিধবা বিবাহ' নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৮৫৯ সালের ৭মে। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন চালু হওয়ার পর এদেশে সৃষ্টি হয় নানা রকম প্রতিক্রিয়া। মেট্রোপলিটান থিয়েটার কর্তৃপক্ষ যে বিধবাবিবাহের সপক্ষে ছিলেন না, তাঁদের নাট্যপ্রয়াস দেখেই অনুমান করা যায়। নাট্যকার উমেশচন্দ্রও তাঁর নাটকে তুলে ধরেছিলেন বিধবা নারীর যন্ত্রণা ও সমাজপতিদের নিষ্ঠুরতার ছবি। জনমানস বিবর্তনে ও জনচেতনার শুভবোধ জাগরণে নাটক, যে অন্যতম মাধ্যম তা আর একবার প্রমাণিত হয় এই নাট্যশালার মধ্যে দিয়ে। তাই শুধু শৌখিন নাট্যচর্চা নয়, মেট্রোপলিটান থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় সমাজ পরিবর্তনের পথ অনুসন্ধান।

৩০৩.১.৩.১৩ : যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের আদি বাড়িতে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। ১৮৫৯ সালে সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক। অভিনয়ের উদ্যোক্তা মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ভাই সৌরিন্দ্রমোহন। নাটকে সৌরিন্দ্রমোহন কঞ্চুকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সেজেছিলেন বিদূষক। সে সময়ই ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্য গঠিত হয়েছিল, একটি কার্যনির্বাহক সমিতি। সমিতির সভ্যরা ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশব গঙ্গোপাধ্যায় ও দীননাথ ঘোষ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, বেলগাছিয়া থিয়েটারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী, ধনী ও নাট্যবিষয়ে উৎসাহী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৫ সালে। দর্শকাসন ছিল দুশোরও বেশি। পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হয় 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। নাট্যরূপ দেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। অবশ্যই ভারতচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত বলে 'বিদ্যাসুন্দর'-এ মৌলিকতার অভাব ছিল। অভিনয় রাধাপ্রসাদ বসাক, মদনমোহন বর্মন, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা। নাট্যশিক্ষক ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং তাঁর ভাই সঙ্গীতজ্ঞ সৌরীন্দ্রমোহনের প্রচেষ্টায় এই অভিনয়ে ঐকতান বাদ্য বাজানো হয়েছিল। ঐকতান বাদ্যদলের নেতা ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। একই রাতে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঐ মঞ্চে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। দুটি নাটকই এই মঞ্চে আট-নয়বার অভিনীত হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন রেওয়ার মহারাজ। অভিনয়ে খুশি হয়ে তিনি প্রত্যেক অভিনেতাকে একটি করে শাল এবং সকলকে একসঙ্গে তিনহাজার টাকা উপহার দিয়েছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'যেমন কর্ম তেমন ফল' অভিনয়ের পর একে একে অভিনয় হয়েছিল —

- **'বুঝলে কিনা'** — একটি প্রহসন, নাট্যকার ভোলা মুখোপাধ্যায় (মতান্তরে প্রিয় মাধব বসু)। অভিনয় হয় ১৮৬৬ সালে। নাটকের বিষয় কলকাতার দলপতিদের চক্রান্ত ও দলাদলি।
- **'মালতিমাধব'** — অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্ন। দশ-এগারবার নাটকটির অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৯ সালে। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্র সেন ও হরি বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে মাধব, মালতী ও অঘোরঘন্টের ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন।
- **'মালোবিকাগ্নিমিত্রম্'** — কালিদাসের রচিত নাটক, অনুবাদক রামনারায়ণ তর্করত্ন।
- **'রুক্মিনীহরণ'** — একটি পৌরাণিক নাটক। রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। অভিনয় হয় ১৮৭২ সালে।
- **'উভয় সংকট এবং চক্ষুদান'** — প্রহসন দুটির রচয়িতা রামনারায়ণ তর্করত্ন। উভয় সংকট প্রহসনের মূল বিষয় সপত্নী সমস্যা। নাট্যকার দেখিয়েছেন দুই নারীকে নিয়ে এক পুরুষ সংকটে পড়েছেন।

● **'রসাবিষ্কারকবৃন্দ'** — ১৮৭১ সালে একবার এবং ১৮৭৩ সালে একবার নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেলেও পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চে ১৮৮১ সালে শেষ যে নাটকটির অভিনয় হয়, তার নাম 'রসাবিষ্কারকবৃন্দ'। রচনা করেছিলেন সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর।

দুশো বছরেরও বেশি সময়ের অতীত বাংলা থিয়েটারের দিকে পিছন ফিরে তাকালে বলতেই হয়, — পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে আমাদের থিয়েটার, আমাদের নাটক আন্তরিকভাবে লালিত হয়েছিল। দেশী-বিদেশি দর্শকরা লক্ষ করেছিলেন সুষ্ঠু মঞ্চব্যবস্থা, দৃশ্যপট, গীতবাদ্য এবং সার্থক অভিনয়। বিশেষ করে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যপ্রতিভা বিকাশের একটা ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল, পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার। এই নাট্যালয়ে অভিনীত হয়েছে, কালিদাসের নাটক, ভবভুতির নাটক, ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'। রামনায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এই নাট্যশালার জন্যই লেখেন তাঁর পৌরাণিক নাটক 'রক্মিনীহরণ' এবং প্রহসনগুলি। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ে খুব প্রগতিশীল নাটকের অভিনয় না হলেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগ সাধুবাদ লাভ করেছে বারবার। দীর্ঘস্থায়ী মঞ্চ স্থাপন, সৌরিন্দ্রমোহনের কনসার্টের জনপ্রিয়তা, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির অনুপ্রাণিত হওয়া এবং 'হিন্দুপেট্রিয়ট' এই নাট্যশালাকে 'জাতীয় নাট্যশালা' আখ্যা দেওয়া এই সবকিছু ছাড়িয়ে পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয় জনপ্রিয় হয়ে আছে, শুধু রঙ্গমঞ্চের জন্য নয়, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসেও। পাথুরিয়াঘাটায় এসে রামনারায়ণ তর্করত্নের উদ্ধুদ্ধ হয়ে ওঠাকে ইতিহাস কখনো ভুলবে না।

৩০৩.১.৩.১৪ : শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি

১৮৪৮ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাধাকান্ত দেবের উদ্যোগে একটি বড় হলঘরের মধ্যে ছোট একটি মঞ্চ তৈরি করে ১৮৪৪ সালের সালের ১৯শে অক্টোবর অভিনয় হয়েছিল দুটি ইংরাজি নাটকের — 'লাভার্স অফ সালামাঙ্কা' এবং 'দি ফক্স অ্যান্ড দি উলফ'। সাঁ সুসি থিয়েটারের স্টেজ ম্যানেজার মি: ব্যারী মঞ্চ নির্মাণ ও নাট্য নির্দেশনায় সাহায্য করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ১৮৬৫ সালে শোভাবাজার রাজভবনে রাজপরিবারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি। এই নাট্যশালায় ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই প্রথম অভিনীত হয় মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি। অভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কৌতুককর। শোভাবাজার নাট্যশালার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো এক কারণে এই নাট্যশালার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পরবর্তীকালে নাট্যশালার অন্য সদস্যদের প্রচেষ্টায় ১৮৬৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এই মঞ্চে অভিনীত হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের যে প্রহসনের অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মূলত ইয়ংবেঙ্গলদের চাপে, শোভাবাজার থিয়েটারে তারই সফল অভিনয় বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ২৯ জুলাই। কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন কালী - উপেন্দ্রকুমার দেব, প্রসন্নময়ী - অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, হরকামিনী - বজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং নব-র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মনি সরকার। নাটকের অভিনয়ের সার্থকতা বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রত্রিকায় বিশেষ সাধুবাদ করা হয়। বিশেষ করে নববাবু এবং দুজন নর্তকীর অভিনয়ের সুখ্যাতি করা হয়। যদিও ১৮৬৫ সালের ৩১ জুলাই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির অভিনয়ের সুনাম করেও বলা হয়, পরিবারিক

নাট্যশালায় এ জাতীয় নাট্যভিনয় উচিত নয়। কারণ এ নাটকে এমন অনেক চরিত্র আছে যাদের অভিনয় 'shocking to good taste and morals' এছাড়াও বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন — বলেন্দ্র সিংহ — প্রিয়মাধব বসুমল্লিক, কৃষ্ণকুমারী — ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অহল্যাবাঈ — অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জগৎ সিংহ — উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, তপস্বিনী — উদয়কৃষ্ণ দেব, সত্যদাস — আনন্দকৃষ্ণ দেব, ধনদাস — মণিমোহন সরকার, বিলাসবতী — হরলাল সেন, মদনিকা — রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

৩০৩.১.৩.১৫ : ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

জোড়সাঁকোয় ঠাকুর পরিবার রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুর বিদেশি রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ঠাকুরবাড়িতে যাত্রাভিনয় হত। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের একত্রিত প্রয়াসে গড়ে ওঠে 'কমিটি অফ ফাইভ'। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন গণেন্দ্রনাথ, শ্রীনাথ ঠাকুর, নীলকমল মুখোপাধ্যায় ও যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। আর এঁদের সকলের অন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৮৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকো থিয়েটার নতুন করে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৮৬৭ সালের ১৪ জুলাই গুণেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠি এবং গণেন্দ্রনাথকে লেখা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠিতে জোড়াসাঁকো থিয়েটারের অনুপ্রেরণার সূত্র মেলে। তবে পূর্বজনদের প্রেরণা, কর্মপ্রয়াস এবং সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপস্থিতি, বিশেষ করে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাধুবাদ 'কমিটি অফ ফাইভ'কে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। যে প্রেরণার ফল স্বরূপ কৃষ্ণবিহারী সেনের অভিনয় শিক্ষার দ্বারা ১৮৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকো থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'। অহল্যাবাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ের কিছুদিন পরেই মধুসূদন দত্তের একটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয় এই নাট্যশালায়। এই প্রহসনে সার্জেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই প্রহসন শেষ পর্যন্ত 'কমিটি অফ ফাইভ' - এর পছন্দ হয়নি। ফলে তাঁদের গৃহশিক্ষক এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রথম শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শে সমাজ সমস্যা বিষয়ক নতুন নাটকের জন্য 'Indian Daily News' পত্রিকার জুন সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপনে শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নাট্যকারদের নাটক বিচার করে শ্রেষ্ঠ নাটক অভিনয়ের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। কারণ হিন্দু মহিলার দুরাবস্থা বিষয়ে নাটক লিখে (হিন্দু মহিলা নাটক) সোমড়া নিবাসী শ্রী বিপিন বিহারী সেনগুপ্ত দুশো টাকা পুরস্কার জিতে নিলেও নাট্যমঞ্চটি উঠে যাবার কারণে তা আর অভিনীত হয়নি। বরং বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ বিষয়ক নাটক ('নব নাটক') রচনা করে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার গৌরব লাভ করেন। 'নব-নাটক' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারি। প্রস্তুতি চলে ছ-মাস আগে থেকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নব-নাটকের অভিনয়ে সাবিত্রীর ভূমিকায় ছিলেন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। নবনাটক অভিনয় হয়েছিল ঠাকুর বাড়ির দোতলার ঘরে। বনের

দৃশ্যের জন্য নানা তরুলতা ও তাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আটকে দেওয়া হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মুক্তোর মালা, হীরের গহনা পরে নটীর বেশে সংস্কৃতে বসন্ত বর্ণনায় গান গেয়েছিলেন। ‘The National Paper’ - এর মতে অভিনয় হয়েছিল ‘most superior order’ এবং ‘কনসার্টে’ বিদেশি ছোঁয়া ছিল। জোড়াসাঁকো নাট্যশালাতে ‘নবনাটক’ মোট নয়বার অভিনয় হয়েছিল। নবনাটকের অভিনয় এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি বলেছিলেন, এই অভিনয় দেখে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে যা কিছু দেখার, শোনার ও জানবার বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

বস্তুত জোড়াসাঁকো থিয়েটারের কর্মকর্তারা চেয়েছিলেন, গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করতে। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রেও বাস্তব রীতিকে অবলম্বনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছিল, দৃশ্য অঙ্কন ও দৃশ্যসজ্জায়। আলোকসজ্জার ক্ষেত্রেও এই নাট্যশালার নতুনত্ব মনে রাখার মতো। দৃশ্যাঙ্কন এবং সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশীয় ভাবনাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ধনী বাঙালিদের প্রাসাদমঞ্চের সঙ্গে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। এই নাট্যশালা নির্মাণ এবং অভিনয়ের পিছনে অর্থের জৌলুস এবং আমোদ-প্রমোদ মুখ্য ছিল না, পরিবারের তথা বাড়ির সকলে মিলে এখানে অভিনয় করতেন এবং এই নাট্যশালার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য নাট্যধারা, ভারতীয় নাট্যচর্চা এবং বাংলার দেশজ নাট্যরীতির একটা সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা চলেছিল। ১৮৬৭ সালের শেষদিকে জোড়াসাঁকোয় অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বহু পড়ে ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে জোড়াসাঁকোতে আবার নাটকের আসর বসেছিল। Indian Mirror পত্রিকাতেও ১৮৬৫ সালের ১৫ জুলাই প্রকাশিত হয় একই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ —

“Advertisements”

The following prizes are offered by the committee of the Jorasanko
Theatre for the best dramatic productions on the following subjects :

No. 1 — Rs. 200/-

The Hindoo Females, — Their condition and Helplessness. To be handed over to the committee before the 1st June 1866

Adjudicators — Babu Perya Chand Mitra
Prof. Krisna Comul Bhuttcharjee
Pundit Dwaraka Nath Bidyabhoosun

No. 2 — Rs. 100/-

The village Zaminders.

Period — Before the 1st February 1866.

Adjudicators — Pundit Eshwar Chandra Vidyasagar
Pundit Dwarka Nath Bidyabhoosun

Babu Raj Krishna Bannerjee

"The dramas are to be written in Bengali and must be dedicated to the Jorasanko Theatre."

৩০৩.১.৩.১৬ : বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়

বহুবাজারে বিশ্বনাথ- মতিলালের গলির গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হয় একটি নাট্য সমাজ। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু। সেখানেই ১৮৬৮ সালে প্রথমে একটি ছোট রঙ্গালয় নির্মাণ করে, অভিনীত হয় মনোমোহন বসু রচিত 'রামাভিষেক'। পাঁচ বছর পর উদ্যোক্তা ও স্থানীয় নাট্যরসিক মানুষের চেষ্টায় ও আর্থিক সাহায্যে ২৫ নং, বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে বহুবাজার নাট্যসমাজের নতুন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়। ১৮৭৪ সালে এই রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় মনোমোহন বসুর 'সতী' এবং ১৮৭৫ সালে অভিনীত হয় 'হরিশচন্দ্র' নাটকটি। পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ের বিখ্যাত অভিনেতা বলদেব ধর ও চুনিলাল বসুর উপস্থিতি অবশ্যই বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়কে অভিজ্ঞতার দিক থেকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল। এছাড়া অবৈতনিক অভিনেতার দ্বারা নাটকের নিয়মিত অভিনয়, সীট সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সর্বোপরি ঈশ্বর গুপ্তের অন্যতম শিষ্য, হিন্দুমেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর আবির্ভাব ও একাধিক নাট্যরচনা বহুবাজার বঙ্গনাট্যলয়কে রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

৩০৩.১.৩.১৭ : কলকাতায় ও মফ:স্বলে বিচ্ছিন্ন অভিনয়

সংবাদপত্রের তৈরি জনমতের বলে বা ধনী অভিজাতদের অনবরত নাট্যপ্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বা নিম্নবিত্তদের চাপে পড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শৌখিন থিয়েটারের আদল ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। যে নাটক এতদিন অভিজাতদের খাসমহলের সম্পত্তি ছিল, তা যেন ক্রমে ক্রমে 'পিপলস থিয়েটার' হয়ে উঠতে থাকল। তাই শৌখিন থিয়েটারের শেষ লগ্নে বিচ্ছিন্নভাবে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হতে লাগল নাটক। ১৮৬৫ সালের ১১ ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটার কোনো এক ধনীর গৃহে অভিনীত হয়, মধুসূদনের 'পদ্মাবতী'। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে নীলমণি মিত্রের বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'সীতার বনবাস' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই। ১৮৬৭ সালের মধ্যে একাধিকবার 'শকুন্তলা'র অভিনয় হয়। কাঁসারিপাড়ার কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের বাড়িতে ঐ বছরই অভিনীত হয় 'শকুন্তলা' এবং 'বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ'। ১৮৬৭ সালে হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো কয়লাহাটার বাড়িতে অভিনীত হয় 'কিছু কিছু বুঝি', নাট্যকার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৮ সালে বাগবাজার নাট্যসমাজের সভাপতি ক্ষেত্রমোহন বসুর সুরারোপিত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইন্দুপ্রভা' নাটকটি অভিনীত হয়।

সেকালের মফ:স্বলে কলকাতার প্রভাব ছিল খুব বেশি। কাজেই কলকাতার নাট্যচর্চার প্রভাব খুব সহজেই মফ:স্বলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন ১৮৫৮ সালের ১ জানুয়ারি যশোহরের অর্ন্তগত রাড়ুলিগ্রামে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় হয়। পৃষ্ঠপোষকতা করেন স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৫ সালের ২১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের সেরপুরে অভিনীত হয় মধুসূদনের ‘একেই কি বলে সভ্যতা’। ১৮৭০ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের ‘সাহিত্য সংসৎ’ সভার উদ্যোগে অভিনীত হয় এডিসনের ‘কেটো’ এবং শেক্সপীয়রের ‘মার্চেন্ট অফ ভেনিস’। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার সরকারের উদ্যোগে ‘লীলাবতী’ নাটকের অভিনয় হয় চুঁচুড়ায়। ১৮৭২ সালের ৩০ মার্চ ও ১৩ এপ্রিলে মনোমোহন বসুর ‘রামাভিষেক’ ঢাকায় ও তমলুকে অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়।

৩০৩.১.৩.১৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে সৌখিন রঙ্গালয়গুলির মধ্যে নবীনচন্দ্র বসুর শ্যামবাজার নাট্যশালা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। সখের নাট্যশালা হিসেবে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অবস্থান নির্ণয় করো।

৪। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে সৌখিন নাট্যশালার গুরুত্ব কতখানি আলোচনা করো।

৩০৩.১.৩.১৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান — শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক — পুলিন দাস।

৩। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

৫। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — দর্শন চৌধুরী, পরিবেশক—পুস্তক বিপণি।

৬। নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

৭। নাট্যতত্ত্ব বিচার — ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

একক - ৪

যাত্রাভিনয়

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.৪.১ : ভূমিকা

৩০৩.১.৪.২ : যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস

৩০৩.১.৪.৩ : যাত্রা ও অপেরা

৩০৩.১.৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.১.৪.১ : ভূমিকা

'যাত্রা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 'গমন'। এই 'গমন' বা 'প্রস্থান'কে আগেকার দিনে দেবতার উৎসব হিসেবে ব্যবহারের প্রচলন ছিল। দেবতার উৎসবে মিছিল বা শোভাযাত্রা করে, নৃত্যগীত সহযোগে পৌরাণিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হতো। সর্বোপরি দেবতার উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে থাকে। 'যাত্রা' ধর্ম উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে, তাতে পুরনো দিনের ইতিহাস বা লোকসাহিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়। তখনকার দিনের মানুষ ভক্তিতে, দেবদেবীর উপর নির্ভরশীল ছিল। সাংসারিক প্রতিটি কাজে দেব-দেবীকে স্মরণ করার রীতির প্রচলন ছিল। সেইজন্য মানুষ সকাল-সন্ধে দেব-দেবীর বন্দনা করতো। নির্দিষ্ট তিথিতে দেব-দেবীকে লোকজ রীতি মেনে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। এই 'গমন' উপলক্ষ্যেই নৃত্য, গীত সহযোগে উৎসব অনুষ্ঠিত হত বলে, উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে আমাদের দেশের রক্ষণশীলতার কারণে সমাজের উপর ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। তারফলে বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সমাজ যা বিধান দিতেন, সাধারণ মানুষ তাই মেনে নিতেন। প্রেম আর ভক্তির কারণে শক্তি বিষয়ক তত্ত্বের আরাধনা করতেন।

৩০৩.১.৪.২ : যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস

যে কোন দেশের সমাজ ব্যবস্থার প্রাধান্য ধনী সম্প্রদায়ের, কেননা তারাই তো সবকিছুর মাথার উপর। একদিকে

যেমন ছিল কৃষিকাজ, অপরদিকে তেমন ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কারণে লোকে সুখে বসবাস করতো। তারফলে সাধারণ মানুষকে বাড়ির বাইরে যেতে হতো। এই প্রসঙ্গে একটি লোকজ প্রবাদ খুবই জনপ্রিয় -

"মঙ্গলে উষা যাত্রা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

এই প্রবাদ থেকেও 'যাত্রা' কথাটির উৎপত্তি বলে অনেক সমালোচক মনে করেন । বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস গ্রন্থে, অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী বলেছেন - "সূর্যের গমনাগমনের উপর কৃষি জীবন যেমন নির্ভর করত, তেমনি তাকে কেন্দ্র করেই নানা উৎসব হত। সূর্যের প্রধান দুই গমন - উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ। দক্ষিনায়ণকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতে 'রথযাত্রা' উৎসব এবং সূর্যের বিষুবরেখার অবস্থানকে কেন্দ্র করে চড়ক উৎসব। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার এবং ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্য প্রভাবে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ফলে কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করে 'কৃষ্ণযাত্রা' গড়ে ওঠে।" (পৃ.৩২) কৃষ্ণ কথা নিয়ে রচিত যাত্রাকে বলা হতো কৃষ্ণযাত্রা। কৃষ্ণযাত্রার মূল আকর্ষণ ছিল ধর্মভাবের মাহাত্ম্য বর্ণাার মধ্য দিয়ে, ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দ্বে; ধর্মের জয় ঘোষণা করা। সাধারণ দর্শক কৃষ্ণযাত্রা শোনে সত্য ও ন্যায়ের পথকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। সাধারণ মানুষ সংসারের পুণ্যের কথা ভেবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ও রাসযাত্রা পালন করে এসেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেও ভারতবর্ষে গান ও কাহিনী কাব্যের অভিনয় প্রচলিত ছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বাদশ শতকে রচিত হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বিভিন্ন রাগ, বিভিন্ন তাললয়ের উল্লেখ রয়েছে। "গীতগোবিন্দ বিভিন্ন চরিত্রের (রাধা, কৃষ্ণ ও সখী) উক্তি- প্রত্যুক্তি- সমন্বিত নাট্যলক্ষণযুক্ত কাব্যগ্রন্থ।" 'গীতগোবিন্দ' মহাকাব্যরোচিত স্বভাব বর্ণনারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণর্কীতনে'ও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই চরিত্রের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি রয়েছে। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' নাটকীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। তা থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাটগীত বা যাত্রার প্রচলনটি আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা 'কালীয়দমন' লীলার পরিচয় পেয়েছি - "একটি বড়ো পুকুরকে কালিন্দীর হ্রদ হিসেবে সাজিয়ে এই অভিনয় হতো।"

পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩) বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক অভিনব যুগান্তকারী ঘটনা। কবি বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' (১৫৪২) গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুও নাটকে অংশগ্রহণ করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন। সুতরাং তৎকালীন সমাজে পুরাণ- নির্ভর বিভিন্ন কাহিনী চরিত্রানুযায়ী পোশাকে সজ্জিত হয়ে সংলাপ আকারে পরিবেশনের রীতি ছিল 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে তার স্পষ্ট পরিচয় রয়েছে।

কবি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতে' অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাট্যাভিনয়েরও পরিচয় পাওয়া যায়। কবি জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু একবার মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি বঁড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অংশ বিশেষের অভিনয় করেছিলেন। একদিন শ্রীচৈতন্য বললেন যে, তিনি 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য' করবেন। তখন তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে চরিত্র বন্টন করা হলো। রুক্মিনীর চরিত্রে গদাধর, সখির চরিত্রে ব্রহ্মানন্দ, বড়াই বুড়ির চরিত্রে নিত্যানন্দ এবং দেবী লক্ষীর চরিত্রে স্বয়ং মহাপ্রভু অভিনয় করবেন ঠিক হলো। নগরের কোতোয়াল আর নারদের ভূমিকায় নামলেন যথাক্রমে হরিদাস এবং শ্রীবাস। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তখনকার দিনে সামাজিক নাটক ছিল না, পৌরাণিক ঘটনা কেবল নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হতো। তখন স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতো পুরুষেরা। অবশ্য সাধারণ দর্শকদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সবাই থাকতো। তবে নাট্য সংলাপ তৈরী হতো মুখে-মুখেই। অভিনেতাদের তেমন জোরালো সংলাপ শুনে দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়তো, করুণ দৃশ্যে তারা কাঁদতো। আর তখন অভিনয় চলতো সারারাত ধরে। আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলেও খানিকটা এখনকার লোকনাট্যের ধরনে অভিনয় দলও থাকতো। "একথা ঠিক, প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রার মতো একটি লৌকিক নাটক (Folk Drama) প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে তাকেই নাটগীত বলা হত। দেবতার সন্তুষ্টির জন্য দেবতার সম্মুখে নাট মন্দিরে যে নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান হত, তাকে বলা হল নাটগীত।" আনুমানিক ১৫০৯ সালে চৈতন্যের সময়কালে যাত্রার সঙ্গে অভিনয় কলা যুক্ত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। আর প্রথম যাত্রাপালা হিসেবে 'রুক্মিনীহরণ' কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে অধিকারীকেন্দ্রিক যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রাওয়ালারা নিজেদের পারদর্শিতায় যাত্রা শিল্পকে খুব তাড়াতাড়ি সাধারণ মানুষের কাছে উপহার দিতো। সাধারণ মানুষ তখন সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতো, দৈনন্দিন জীবনে এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য মনোরঞ্জন হিসেবে যাত্রা দেখতে যেত। যদিও দর্শক হিসেবে সমাজের নারী - পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল অবাধ। সেই সময় কালীয়দমন যাত্রা পালাকার হিসেবে শ্রীদামদাস, সুবলদাস এই দুই ভাই বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী ছিলেন। দুই ভাই এর পর যাত্রাপালাকার হিসেবে নাম করেছিলেন পরমানন্দ অধিকারী। নিজের প্রচেষ্টায় তিনি যাত্রাদল তৈরি করেছিলেন। সেই সময় পরমানন্দ দাসের সমসাময়িক ছিলেন প্রেমচাঁদ। বাংলা যাত্রাভিনয়ের ইতিহাসে, যাত্রাশিল্পী হিসেবে বদন অধিকারীর নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রেমচাঁদের শিষ্য। অপর আর একজন যাত্রাওয়ালা ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী, তাকে পরমানন্দ দাসের 'ছোকরা' বলে অভিহিত করা হতো। কালীয়দমন যাত্রার অভিনয় সর্বজনবিদিত ছিল বলে, পরবর্তীকালে অভিনয় চর্চায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। গোবিন্দ অধিকারী কালীয় দমন যাত্রায় বৈষ্ণব গীতির পরিবর্তে নাট্যিক ক্রিয়া ও সংলাপের ব্যবহার যুক্ত করেছিলেন। তবে সাধারণ দর্শক সমাজ চাইতো যাত্রার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ভক্তিরস ও আদিরসের খোঁজ পেতে।

'যাত্রার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - ''যাত্রা পরিবেশনার পরিবেশ নিয়ে যে আগে বৃহৎ জনসমুদ্র যাত্রা গায়করা যে সুর ও স্বরক্ষেপন ব্যবহার করতেন তারফলে সবাই তা শুনতে পেতো। তাঁরা চিৎকার করতেন না কিন্তু এমন বিশেষ স্বরগ্রামে পৌছে দিতেন তাদের গান বা কথাকে যা সকলের শ্রুতি গ্রাহ্য হতো। এটা এক ধরনের দক্ষতা -অভ্যাস ও চর্চার ফল। বন্দুকের আওয়াজ যত দূর থেকে যেতে পারে তার চেয়ে অনেক দূরগামী চৌকিদারী হাঁক ও ডাকাতদের 'কুক'। যাত্রাপালা গায়কেরাও এক বিশেষ স্বরক্ষেপনের সুর আয়ত্ব করেছিলেন বলে তা সম্ভব হতো।''

মহাপ্রভুর আগমনের ফলে ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন পালাবদলের পালা ঘটেছিল ঠিক তেমনটাই ঘটল আঠের শতকে। নতুন এক জমিদার শ্রেণী তৈরি হল, ''মাটিতে যাদের পড়ে না চরণ''। স্থিতাবস্থার অভাব দেখা গেল দেশে, এমন একটা অদ্ভুত অবস্থায় সাহিত্য নতুন পথে এগোতে লাগল। এগোতে যে লাগল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠের শতকের ভারতচন্দ্রের রচনায়। 'বিদ্যাসুন্দরের' রসালো কাহিনী সেইসময় জনপ্রিয় ছিল। আঠের শতকে দেব-দেবীর কথা লেখা হলেও ভক্তি ততটা ছিলনা। ভারতচন্দ্র রায়কে আমরা দেখলাম দেবাদীদেব মহাদেবকে নিয়ে তিনি যেমন মজার গল্প লিখলেন। এই 'রায়গুণাকর' কবি রাজকণ্ঠের মণিমালা দিয়ে গোটা একটা যুগকে এমনভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে পরের যুগও তাতেই ঝলমল করেছে। আবার এই আঠের শতকেই সহজ সরল ভাষায় লেখা উমা ও শ্যামা সঙ্গীত গুলিতে গোটা বাঙালি জাতির মনোরঞ্জন করেছেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। সেইসব গান বাঙালির পারিবারিক জীবনে দুঃখের বারমাস্যা দিয়ে বাঁধানো। আসলে সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ধরা-বাঁধা নিয়ম থাকে না। তাই আগের যুগ, পরের যুগকে প্রভাবিত করে। আর এই সময় শিক্ষাদীক্ষাহীন সমাজে, আনন্দ উপভোগের জন্য কবিগান, খেউড়গান, হাফআখড়াই গানের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বাড়তে লাগল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একদিকে গদ্য সাহিত্যের প্রচলন, সাময়িক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা পালার অভিনয় চর্চা। সেইসময় লোচন অধিকারীর 'অক্রুর সংবাদ', 'নিমাই সন্ন্যাস', বদন অধিকারীর মান, দান, মাথুর পালার অভিনয় গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। যাত্রাপালাকার গোবিন্দ অধিকারী 'কৃষ্ণযাত্রা' 'কালীয়দমন যাত্রা'র অভিনয় করিয়েছেন। সাধারণ দর্শক সমাজ উপরোক্ত যাত্রা পালার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছে। এমনও শোনা যায় তখন নাকি খেমটা নাচের ব্যবহার শুরু হয়েছে। তারফলে যাত্রা কাহিনীর মধ্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে নৃত্য ও গীত প্রবেশ করেছে। 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনি বা নলদময়ন্তী কাহিনীর থেকে সাধারণ দর্শক অশ্লীল নৃত্য-গীত বেশি করে পছন্দ করতে শুরু করেছে। ''তখন কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর -মেথরানি, ঘেসড়ে-ঘেসেড়নি, নাপিত-নাপিতানি প্রভৃতি অশ্লীল নৃত্যগীত প্রবেশ করে আবার যাত্রাকে নিম্নরুচির বাহন করে তুলেছে।'' 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন - "এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ বর্গীরূপে আমাদের লুণ্ঠন করতে এসেছিল। তখন ধনী পুরুষেরা ধন রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এরপর যখন মহারাষ্ট্রীয় নারী বাঈজীরূপে আমাদের বাংলায় এল তখন ধনীরা সব ধন তাদের পায়ে ঢেলে দিলেন। শুধু তাই নয়, এই বাঈজীরা আরো এক সর্বনাশ করলো আমাদের, তা হলো আমাদের সাবেকী সুরের যে মহিমা ও আভিজাত্য ছিল এই বাঈজী সংস্কৃতি তা বিনষ্ট করলো।

এই সময় কলকাতায় ইংরেজেদের সাহচর্যে এক শ্রেণির মানুষ ধনী হয়ে উঠল। এদের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকলেও তারা ক্রমশ সৌখিন হতে লাগল। এইরূপ সংকটের সময় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশি রঙ্গ ালয়। ইংরেজ শাসক তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল থিয়েটার স্থাপন করে। সৌখিন নাট্যশালা বা বাবু থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে বাঙালিদের থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে শুরু করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক শ্রেণির যুবক সম্প্রদায়, যারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত ধনী বাঙালিগণ সেইসময় সৌখিন রঙ্গালয় গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। কলকাতার ধনী বাবু সম্প্রদায় তখন শ্রীখোল-খঞ্জনির মধুর মধুর বোল ছেড়ে তবলার মৃদু তালে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। ধনী ব্যক্তিরা বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শ ত্যাগ করে তবলা ও ঘুঙুরের বোলে সখের দলের সৃষ্টি করলেন।

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ যাত্রা ও যাত্রায় প্রদর্শিত মামুলি কালুয়া-ভুলুয়া, কৃষ্ণ-গোপিনী, বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতির প্রতি বীতরাগ হইয়া নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের পক্ষে পাইকপাড়ার রাজাদের মত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া নাট্যশালা স্থাপন সম্ভব নয়, সেজন্য অনেকে গীতাভিনয় করাইতেছেন।" (পৃ: ৮০)

তখন সাধারণ দর্শক সমাজ অনুভব করতে পেরেছে শ্রীখোল -খঞ্জনির সহযোগে কালীয়দমন পালার অভিনয় হয়েছে। আর তবলার ঘুঙুরের সহযোগে নতুন রীতির অভিনয় শুরু হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, কালীয়দমন পালায় বৈষ্ণব ভক্তি, আর সৌখিন রঙ্গালয়ে সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এমনকী লোক মনোরঞ্জনের জন্য তখন যাত্রা পালার মধ্যে অশ্লীল নাচ-গানের আয়োজন করা হতো। জমিদার শ্রেণির মানুষ সারারাত ধরে যাত্রার অভিনয় দেখতেন। সেইজন্য যাত্রাওয়ালারা বা নির্দেশকরা বা নিজেদের ইচ্ছেমতো যাত্রাকাহিনিকে টেনে নিয়ে যেতেন ভোর পর্যন্ত। এর নিদর্শন পাওয়া যায় কালী প্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সায় (১৮৬২)। " একবার শহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড় মানুষের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছে। .... বছর ষোল বয়সের ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেমটা নাচ্চে। মজলিশে রূপের গেলাসে ব্রান্ডি চলছে।"

৩০৩.১.৪.৩ : যাত্রা ও অপেরা

বাংলা যাত্রার সঙ্গে ইংরেজী অপেরার একটা সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেছে। “যে নাটকে সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের বক্তব্য এবং রস দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়, তাকে বলে অপেরা।” সখের নাট্যশালা তৈরি হওয়ার পর থেকে যাত্রার প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমতে থাকে। কলকাতা শহরের নাট্যশালাগুলিতে নাটকের অভিনয় দেখতে সাধারণ মানুষ বেশি পছন্দ করেছে তা জোর দিয়ে বলা যায়। তখন যাত্রাপালার নির্দেশকরা যাত্রা শিল্পের দিকে সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, যাত্রার প্রাথমিক রূপই ছিল কাহিনীসূত্রে গানের মালা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেছেন – “ রসের দিক দিয়া ইহাতে প্রাচীন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজি আদর্শে রচিত বাংলা নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।” আমরা জানি, গীত ও নৃত্য সহযোগে যে নৃত্যনাট্যের আবির্ভাব, তারসঙ্গে গীতিনাট্য বা অপেরার পার্থক্য আছে। ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে’ , ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন – “রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পরে পার্থিব ঘাত-প্রতিঘাতমূলক নাটক দেখিবার সুযোগ পাইলেও দর্শক সাধারণ ধর্মমূলক, ভাবতরল যাত্রা দেখিতে অভিলাষী ছিল। নাটকের প্রচলন হইলেও সর্বত্র রঙ্গালয় স্থাপন করা সম্ভব এবং সাধ্য ছিল না। এই দুই কারণেই নাটকের মত লিখিত অথচ যাত্রার ন্যায় অভিনেতব্য এইরূপ এক প্রকার দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব হইল। ইহাকে অপেরা বা গীতাভিনয় বলা হইত।” (পৃ১১২) গীতিনাট্যে প্রাধান্য পায় গীতিময়তা তথা লিরিক মূর্ছনা, নৃত্যনাট্যে শরীরের অঙ্গভঙ্গি সমান্তরাল সংলাপ রচনা করেছে। সেইজন্য নৃত্যনাট্য আরও বেশি মানবিক হয়ে দেখা দিয়েছে। যাত্রা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকজনের পাশাপাশি অপেরা মালিকদের বর্তমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। কলকাতা শহরের অপেরা গুলির সঙ্গে সঙ্গে জেলা শহরেও ছোট ছোট যাত্রাদলগুলি সবদিক থেকে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া মানুষের হাতে এমনিতেই সময় খুব কম, তার উপর যদি যাত্রা দেখে যদি ভালো না লাগে তাহলে তো খুবই মুশকিল। অপেরা লিখে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন বসু শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল – ‘রামাভিষেক’ (১৮৬৭), ‘সতী’ (১৮৭৩), ‘হরিশচন্দ্র’ (১৮৭৫), ‘প্রণয়-পরীক্ষা’ (১৮৬৯) প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন – “ পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে।” কেননা বিভিন্ন অপেরার মধ্যে আর যাত্রার সুর নির্ভরতা নেই, সেই জায়গা দখল করল ‘Action’ । মানুষের চাহিদা অনুযায়ী আর পৌরাণিক পালা যেমন চলবে না, তেমনি যাত্রায় সংগীত কমে অভিনয়ের কারুকার্য বেশি করে তুলে ধরা হতে লাগলো। বর্তমানে অপেরা বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে যাত্রাদলকে। যেমন – সত্যম্বর অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, ভৈরব অপেরা, দিগ্বিজয়ী অপেরা ইত্যাদি।

বিশ শতকের শুরুতে যাত্রাপালার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমমূলক কাহিনির অভিনয় শুরু হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার জন্য অপেরা মালিকরা বা নির্দেশকরা যাত্রাকাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেম নিয়ে

এলেন। স্বদেশী যুগে শ্রেষ্ঠ পালাকার ছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮-১৯৩৪), ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯১৭-১৯৭৬)। মুকুন্দ দাস স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেক গান ও নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পালাগুলির মধ্যে 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী', 'সমাজ', 'পল্লীসেবা', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্মক্ষেত্র', 'দাদা', 'জয়পরাজয়' প্রভৃতি। আর যাত্রার পালাবদলের ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নাম স্মরণীয়। "তিনি কেবলমাত্র পালাসম্রাট বা লোকনাট্যগুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলার যাত্রাপালা ও লোকাভিনয়ের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তক।" যাত্রাপালা নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছেন। আগেরকার দিনে যাত্রাপালার মঞ্চায়নে সংলাপ থাকত দীর্ঘ, বক্তব্যে থাকতো রঙ্গ রস। তিনি এসব বিষয়গুলিকে বর্জন করে যাত্রাপালার বিষয়ে নিয়ে আসেন বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান করেছেন। পৌরাণিক পালা ও ঐতিহাসিক পালার পরিবর্তে সামাজিক পালা, বিপ্লবীপালা তাঁর হাতে রচিত হতে থাকে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হল - 'ব্রজনাভ', 'লীলাবাসনা', 'চাঁদের মেয়ে', 'মায়ের ডাক', 'লোহার জাল', 'বালির বাঁধ', 'বিদ্রোহী নজরুল', 'ভারত পথিক রামমোহন', 'নন্দকুমারের ফাঁসি', 'অনাথ জননী' প্রভৃতি। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস গ্রন্থে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী বলেছেন - "প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যাত্রাপালা লিখতে শুরু করে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, স্বাধীনতা উত্তর বাংলায় নিরন্তর যাত্রাপালা লিখে গেছেন। বহু ঘটনার উত্থান পতনের সাক্ষী ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর যাত্রাতেও বিষয়ের নানা বিস্তার ঘটিয়ে তাঁর পালাকে বহুমুখী করে তুলেছিলেন অবক্ষয়ী যাত্রাপালকে নানাভাবে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন।" (পৃ. ৪৩)

বিশ শতকের পাঁচের দশক ও ছয়ের দশকে প্রচলিত ও গতানুগতিক ধারার সংস্কার লক্ষ্য করা গেছে। যাত্রাপালার বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি যাত্রাপালায় কোনো কোনো বিখ্যাত চরিত্রের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও লক্ষণীয়। এই সময় আবার নাটকের জনপ্রিয়তার সঙ্গে যাত্রাপালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন অপেরা তাদের সাধ্যমতো প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে, তারফলে মানুষের মনোরঞ্জন বেড়েছে। এমনকী চলচ্চিত্র ও নাটকের বিখ্যাত কলা কুশীলব বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যাত্রাপালায় অভিনয় করতে দেখা গেছে, এতে কিন্তু সাধারণ দর্শক আনন্দ পেয়েছে বেশি করে। সর্বোপরি যাত্রাপালার অভিনয় দেখার মজাই আলাদা। একদিকে গান, অপরদিকে প্রমোটারের নির্দেশনা কিছু সময়ের জন্য হলেও মুগ্ধ করে রেখেছে দর্শকদের।

সবশেষে একথা বলা যায় যাত্রা শিল্পটি লোকনাট্য ধারায় একটি মাধ্যম, এতে ৪ ঘন্টা ব্যাপী পরিবেশনায় উচ্চ শব্দে ও চড়া আলোর ব্যবহারে, চারিদিকে খোলা মঞ্চে সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন করে থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে ইন্টারনেট, মোবাইলের যুগে মানুষের হাতে এখন বিনোদনের নানা সম্ভার। তাছাড়াও টেলিভিশনের প্রভাবে গ্রাম-শহর সর্বত্রই সারাদিন মেগা সিরিয়াল চলতে থাকে। আগেরকার দিনে বাড়ির বয়স্ক মহিলা-পুরুষ

যাত্রাপালার অভিনয় দেখতে যেতেন, এখন খুব কম সংখ্যক মানুষ বাড়ির বাইরে পা রাখেন। সেই সময় তারা মেগা সিরিয়াল দেখতে থাকেন। আর বর্তমান প্রজন্ম দ্রুতগতির জীবনে যাত্রার অভিনয় দেখা নিয়ে খুব একটা উৎসাহী নয়, বরঞ্চ তারা মোবাইলে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম করতেই পছন্দ করেন। আবার বিভিন্ন মেলাতে যাত্রার অভিনয় প্রদর্শিত হলেও দর্শক সাধারণ বিভিন্ন কেনাকাটি ও খাওয়া দাওয়াতে সময় ব্যয় করেন। এমনকী সেইসব দর্শক অর্কেস্ট্রা, ডি.জে, দেখতে-শোনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতার বাগবাজারে স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি।

৩০৩.১.৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। যাত্রাভিনয়ের ইতিহাস তোমার নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২। যাত্রার সঙ্গে অপেরার সম্পর্ক কোথায়?

৩। বর্তমান শতাব্দীতে যাত্রা শিল্পের সংকটের কারণ নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

৪। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার যাত্রাভিনয়ের চালচিত্র সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৩০৩.১.৪.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

২। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — দর্শন চৌধুরী।

৩। বাংলা নাটকের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৪। নাটকের রূপনীতি ও প্রয়োগ — সাধনকুমার ভট্টাচার্য।

৫। সাহিত্যের রূপ রীতি কোষ — ড. অশোক কুমার মিশ্র।

৬। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। নাট্যতত্ত্ব বিচার — ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়।

পর্যায়গ্রন্থ - ২

নাট্যশালার ইতিহাস

একক - ৫

পেশাদারি নাট্যশালা

ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, মিনার্ভা, বেঙ্গল, স্টার, এমারেল্ড, বীণা, কোহিনূর, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, ক্লাসিক, মনমোহন, শ্রীরঙ্গম, বিশ্বরূপা, রঙমহল

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৫.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৫.২ : ন্যাশনাল থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৩ : গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৪ : মিনার্ভা থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৫ : বেঙ্গল থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৬ : স্টার থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৭ : এমারেল্ড থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৮ : বীণা থিয়েটার

৩০৩.২.৫.৯ : কোহিনূর থিয়েটার

৩০৩.২.৫.১০ : জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

৩০৩.২.৫.১১ : ক্লাসিক থিয়েটার

৩০৩.২.৫.১২ : মনমোহন থিয়েটার

৩০৩.২.৫.১৩ : শ্রীরঙ্গম থিয়েটার

৩০৩.২.৫.১৪ : বিশ্বরূপা থিয়েটার

৩০৩.২.৫.১৫ : রঙমহল থিয়েটার

৩০৩.২.৫.১৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.২.৫.১৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৫.১ : ভূমিকা

মৌলিক বাংলা নাটক উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি দেশীয় লোকজ উপাদান অথবা প্রাচীনঐতিহ্য অনুযায়ী মৌলিক বাংলা নাটক উদ্ভব হয়নি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পড়লে জানতে পারি তাদের লোকজ উপাদান অথবা প্রাচীন ঐতিহ্যের যে কোনো একটির হাত ধরেই মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে। একমাত্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই এই দুই উপাদানের বাইরে গিয়ে বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটেছে। ইতিপূর্বেই সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের পথচলা শুরু হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মৌলিক বাংলা নাটক আমাদের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য প্রায় সকলেই অনুভব করেন। পার্থক্য হল এই নাটক মঞ্চস্থ হলে অক্ষরজ্ঞানবিহীন মানুষও নাটক বোঝেন। কাজেই নাটকের এই মঞ্চায়নের জন্য প্রয়োজন হয় নাট্যমঞ্চ বা নাট্যশালা।

ইতিপূর্বে নাটকের ইতিহাস আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব নাট্যশালার ইতিহাস। নাট্যযাত্রার ইতিহাস অনুযায়ী এক রুশদেশীয় ভদ্রলোক লেবেডেফের হাত ধরে বাংলাদেশে প্রথম (১৭৯৫ সালে) 'দি বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বাংলা নাট্যশালার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার লেবেডেফের থিয়েটারের পূর্বে বাংলায় শুধুমাত্র কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কিছু পালা, কিছু গ্রাম্য স্থূল আমোদ-প্রমোদের জন্য কথকতা ইত্যাদির প্রচলন ছিল। লেবেডেফের থিয়েটারের প্রায় ৩৫ বছর পর বাঙালীর দ্বারা প্রথম নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটি হল প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটার যার সময়টা ছিল ১৮৩১সাল। এরপর একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামবাজারের নবীন বসুর নাট্যশালা, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার, আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর) বাড়ির নাট্যশালা ইত্যাদি। তবে এগুলি ছিল সখের নাট্যশালা। সামগ্রিক ভাবে সাধারণের কাছে এগুলি তখনো পৌঁছোতে পারেনি। এর অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭২), যা প্রথম বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ । এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, লেবেডেফ থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারের আগে পর্যন্ত প্রায় ৭৭ বছর বাঙালী থিয়েটারকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনি। সেই সময় আমাদের দেশ পরাধীন, জনমত গঠনে থিয়েটার বিরাট একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু উদ্যমহীন বাঙালী নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য নিজেদের মধ্যেই থিয়েটার কালচারকে আবদ্ধ রেখে দেশের প্রতি দায় দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল, এটা বাঙালী জাতির এক চরম লজ্জার অধ্যায় বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। যাইহোক ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যে দিয়েই প্রথম পেশাদারিত্বের সূচনা হয় বাংলা থিয়েটারের। আপামর সাধারণ মানুষের কাছে

থিয়েটারকে পৌঁছে দেবার এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ন্যাশনাল থিয়েটার। সখের নাট্যশালা থেকে নাট্যশালা সাধারণের হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে সাধারণ রঙ্গালয়, এখন আমরা সাধারণ রঙ্গালয়ের আলোচনায় প্রবেশ করব।

৩০৩.২.৫.২ : ন্যাশনাল থিয়েটার

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত একদল যুবকের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুবকদের বেশিরভাগই বাগবাজার এমেচার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত ন্যাশনাল থিয়েটার নির্মাণে এগিয়ে আসা যুবকেরা হলেন মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। নাট্যশালার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন মনমোহন বসু, শিশির কুমার ঘোষ, নবগোপাল মিত্র।

এই নাট্যশালার মঞ্চ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন ধর্মদাস সুর, সহপ্রধান ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ছিলেন জেনারেল মাস্টার, ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় শুরু হয় ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে। 'নীলদর্পণে'র অভিনয়টি হয়েছিল খুবই উচ্চাঙ্গের। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, মতিলাল সুরেদের অভিনয়ও খুব প্রশংসা পেয়েছিল। তবে কলকাতার দর্শকদের কাছে গ্রামবাংলার মানুষদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী অজ্ঞাত থাকায়, অনেকে প্রস্তাব করেন নাটকটি গ্রামবাংলায় অভিনয় করবার জন্য।

তবে ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্মকর্তারা আর্থিক কারণেও ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য টিকিট প্রথা চালু করলেন, টিকিটের মূল্য করলেন — প্রথম শ্রেণী ১টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী — আট আনা, রিজার্ভ সিট — ২টাকা, দালানের সিঁড়িতে বসলে — ৪ আনা। যাইহোক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পর ১৪ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'জামাই বারিক'। এরপর আবার 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয় ২১ ডিসেম্বর, ২৮ ডিসেম্বর অভিনীত হয় 'সধবার একাদশী'। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৭৩ এ অভিনীত হয় 'নবীন তপস্বিনী', ৪ জানুয়ারি, 'লীলাবতী', ১১ জানুয়ারি, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', ১৫ জানুয়ারি, 'নবীন তপস্বিনী' ১৮ জানুয়ারি, 'নবনাটক' ২৫ জানুয়ারি, 'নীলদর্পণ' ১ ফেব্রুয়ারি 'নয়শো রুপেয়া' (শিশির ঘোষ), ৮ ফেব্রুয়ারি, 'জামাই বারিক' ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রভৃতি। এখানে প্রায় সব নাকটই দীনবন্ধুর। এর আগে কোনো সখের নাট্যশালায় 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়নি, নাট্যপাগল যুবকেরা এই নাটক দিয়েই তাদের থিয়েটারের উদ্বোধন করলেন। এতে করে সাহেবরা মনোক্ষুণ্ণ হলে তাঁরা কোনোক্রমে তা সামাল দেন। তবে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় কিন্তু তারা চালিয়ে যায়।

প্রথম পর্বের ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের শেষ অভিনয় ১৮৭৩ সালের ৮ মার্চ', শেষ রজনীতে অভিনীত হয় 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। অভিনয় শেষে অর্ধেন্দুশেখর বিদায় ভাষণ দেন এবং বিহারীলাল বসুর গান দিয়ে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়। এরপরই দল ভেঙে যায় এবং দুটি দলে পরিণত হয় -- একটি রইল ন্যাশনাল থিয়েটার নামে, অন্যটি হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নামে। প্রথম দলে রইলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ, দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। দল ভেঙ্গে

যাওয়ার কয়েকটি প্রধান কারণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে —

১. টিকিট বিক্রির ফলে ন্যাশনালের উপার্জ্জন বেশ ভালোই হচ্ছিল। সেই আয়ের হিসেব রাখা, কারা কত টাকা পাবে, কারা পাবে না, এই নিয়ে প্রথম মতান্তর দেখা যায়।

২. গিরিশ ঘোষ ন্যাশনালে যোগ দেওয়ার পর ন্যাশনালের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নিয়ে স্পষ্ট মতভেদ দেখা দিল, কারণ গিরিশ সবদিকেই নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়ে পরিস্থিতির জটিলতা বাড়িয়ে তুললেন।

৩. খ্যাতির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শুরু হল মনোমালিন্য। পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিত্বের সংঘাত।

যাইহোক দুটো দলই কিছুকাল নিজেদের মতো করে অভিনয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এদিকে শেষপর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে উঠল, কিনে নিলেন ব্যবসায়ি প্রতাপচাঁদ জুহুরী। পাকাপাকি ভাবে বাংলা থিয়েটার বাণিজ্যিক থিয়েটারে পরিণত হল।

এবারে প্রশ্ন হল, ন্যাশনাল থিয়েটার কতটা জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা পেতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখতে হবে পরাধীন দেশের নাগরিকদের জাতীয় নাট্যশালা হতে পারে না, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একমাত্র জাতীয় নাট্যশালা সম্ভব। সেই হিসেবে ব্রিটিশ-পরাধীন বাংলায় জাতীয় নাট্যশালা গড়ে উঠতে পারে না। তবু, এই নাট্যশালার নামের সঙ্গে 'ন্যাশনাল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার ফলে এর মর্যাদা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। ন্যাশনাল থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব :

১. এর আগে সখের নাট্যশালায় সাধারণের প্রবেশ অবাধ ছিল না। ন্যাশনাল থিয়েটারে যে কোনো ব্যক্তি টিকিট কিনে নাটক দেখার সুযোগ পেলেন এবং টিকিটের মূল্যও ইংরেজদের থিয়েটারের থেকে অনেক কম ছিল। তাই সাধারণ মানুষ সহজেই টিকিট কিনতে পারত।

২. সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই যোগ ও প্রবেশাধিকার স্বীকৃত ছিল বলে একে সাধারণ রঙ্গালয় বলা হয়ে থাকে।

৩. এখানকার অভিনেতারা প্রয়োজনে কিছু কিছু অর্থ পেতেন, অভিনেতাদের অর্থগ্রহণের মধ্যে পেশাদারি থিয়েটারের বীজ তৈরী হয়েছিল।

৩০৩.২.৫.৩ : গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ও স্বত্বাধিকারিত্বে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় আরেকটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটে (এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার) মহেন্দ্রনাথ দাসের খালি জমি মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের জন্য ভুবনমোহন ইজারা নেয়। ধর্মদাস সুর সেখানে গড়ের মাঠের লিউইস্ থিয়েটারের ছাঁচে কাঠের তৈরী এক সুদৃশ্য রঙ্গালয় নির্মাণ করলেন। এই নতুন রঙ্গালয়ের নাম হল — গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

১৮৭৩ এর ৩১ ডিসেম্বর থিয়েটারের উদ্বোধন হল অমৃতলাল বসুর 'কাম্যকানন' নাটক দিয়ে। কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথমরাত্রেই কিছুক্ষণ অভিনয় চলার পর সামনের ‘star light’ থেকে আগুন লেগে থিয়েটার বাড়ির ক্ষতি হয়। এরপরের দিনই গ্রেট ন্যাশনাল বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে, ‘নীলদর্পণ’ নাটকের অভিনয় করে। প্রথম অভিনয়ে এই ভাবে বাধা পেয়েও এঁরা পিছু পা হননি। নতুন উৎসাহে থিয়েটার বাড়ি পুনর্নির্মাণ করে, ১৮৭০-এর ১০ জানুয়ারি আবার অভিনয় শুরু হল উমেশচন্দ্র মিত্রের ‘বিধবা বিবাহ’ নাটক দিয়ে। এই সময় গ্রেট ন্যাশনালে কোনো খ্যাতিমান নাট্যকার না থাকায় কর্তৃপক্ষ কিছুদিন গিরিশচন্দ্রকে তাদের দলে আনলেন। বঙ্কিমের ‘মৃণালিনী’ ও ‘বিষবৃক্ষ’-এর গিরিশ কর্তৃক নাট্যরূপের অভিনয় হল। ‘মৃণালিনী’ খুবই সাফল্য লাভ করল। এরপর ন্যাশনালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ৭ মার্চ অভিনীত হল ‘নবাবের নবরত্না সভা’, ১৮ মার্চ দীনবন্ধু মিত্রের ‘নবীন তপস্বিনী’। ১৮ এপ্রিল ‘হেমলতা’। ৩০ মে ‘কুলীনকন্যা’ বা ‘কমলিনী’। এইভাবে পুরনো ও নতুন নাটকের অভিনয় চালাতে চালাতে ৩০ মে, ১৮৭৪ এর পর চার মাসের জন্য ‘গ্রেট ন্যাশনাল ৫জন অভিনেত্রী গ্রহণ করল — কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী। অভিনেত্রী নিয়ে প্রথম অভিনয় ‘সতী কি কলঙ্কিনী’ (১৮৭৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বর)। গ্রেট ন্যাশনালের খ্যাতি তখন গগনচুম্বী, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাদের প্রশংসা বেরোল।

ইতিমধ্যেই, গ্রেট ন্যাশনালে ম্যানেজার বদল হল। আগের ম্যানেজার ধর্মদাস সুরের সঙ্গে ভুবনমোহনের ‘আয় ও অর্থ’ নিয়ে অনর্থ বাধে, ফলে তাঁকে সরিয়ে ম্যানেজার করা হয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই সময় অভিনীত হয় — জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘পুরুবিক্রম’ (৩ অক্টোবর ১৮৭৪), ‘সতী কি কলঙ্কিনী’ ও ‘ভারতে যবন’ (১০ অক্টোবর), শেক্সপীয়রের ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের বাংলা রূপান্তর ‘রুদ্রপাল’ (হরলাল রায়), ‘আনন্দকানন’ (লক্ষ্মীজনার্দন চক্রবর্তী), ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। এই সময়ে অর্ধেন্দুশেখর আবার গ্রেট ন্যাশনালে যোগ দিয়ে ‘আনন্দকাননে’ একটি ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন। এরই মধ্যে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে ঝামেলা হলে তিনি গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে দেন। এরপর আবার ধর্মদাস সুরকে ম্যানেজার করা হয়, ১৮৭৫-এর জানুয়ারি। ১৬ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল সাময়িক আঘাত কাটিয়ে ‘শত্রুসংহার’ নাটক দিকে আবার অভিনয় শুরু করে। খ্যাতনামা অভিনেত্রী বিনোদিনী এই নাটকে দ্রৌপদীর সখীর এক ছোট্টভূমিকায় প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন, ১৮৭৪-এর ১২ ডিসেম্বর।

এরপর উপেন্দ্রনাথ দাসের ‘শরৎ সরোজিনী’ নাটকের প্রথম অভিনয় (১৮৭৫ এর ২ জানুয়ারি) হয় এখানে। এই নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হল। এই নাটকে গোলাপসুন্দরী সুকুমারীর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সুকুমারী নামে পরিচিত হন। এরপর ‘রাসলীলা, প্রমথনাথ মিত্রের ‘নগনলিনী’, ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’ অভিনীত হয়। ১৮৭৫-এর মার্চে গ্রেট ন্যাশনাল টাকা উপার্জনের জন্য দিল্লী, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করে। এখানে নৃত্যগীতের অভিনয় চলত ভালো, এরপর প্রচুর অর্থোপার্জন করে ১৮৭৫-এর মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মূল দলে যোগ দিল। জুলাই মাসে মহেন্দ্রলাল বসুর ‘পদ্মিনী’ নাটকের অভিনয় দিয়ে আবার পূর্ণোদ্যমে গ্রেট ন্যাশনালে অভিনয় শুরু হয়।

পরবর্তীতে আবার ধর্মদাসের সঙ্গে ভুবনমোহনের গোলমাল বাঁধে। তখন ভুবনমোহন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রঙ্গমঞ্চটি ইজারা দেন, ম্যানেজার হন মহেন্দ্রলাল বসু। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইজারা নিয়ে

পুরনো থিয়েটারের নাম পাল্টে করেন — 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার'। এখানে 'পদ্মিনী' নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। ১৪ আগস্ট হয় 'শরৎ-সরোজিনী', ২১ আগস্ট 'নীলদর্পণ'। এই সময়ে অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থেকে এসে এখানে যোগ দেন।

তারপর অভিনীত হয় সুকুমারী দত্তের লেখা 'অপূর্বসতী'। এরপর 'ডাক্তারবাবু', 'কনকপদ্ম', 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি। এইভাবে টানা চার মাস কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন থিয়েটার চালাতে গিয়ে লাভের পরিবর্তে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তখন ভুবনমোহন বাধ্য হয়ে আবার থিয়েটার নিজের হাতে নিয়ে নেন। আবার পুরনো নামে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার' তার অভিনয় চালু করল। এবারে নতুন ম্যানেজার উপেন্দ্রনাথ দাস। ১৮৭৫-এর ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলালের লেখা 'হীরকচূর্ণ' নাটক দিয়ে এদের অভিনয় শুরু হয়। ৩১ ডিসেম্বর এখানে হয় উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের প্রথম অভিনয়।

এরপরের বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে ঘটে যায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (Dramatic Performances Act. 1876) । পরাধীন জাতির নাট্য-সংস্কৃতির ওপর ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি আইনের রূপে দেখা দিল। এই সময় ইংরেজদের ব্যঙ্গ করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে উপেন্দ্রনাথ দাসের লেখা প্রহসনটি ১৮৭৬-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। একই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকটিও অভিনীত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'সতী কি কলঙ্কিনী'র সঙ্গে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' দ্বিতীয়বার এখানে অভিনীত হয়। এরপরই পুলিশ এই নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন এর নাম পাল্টে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়ে অভিনয় করানো হয়। এটিও পুলিশ বন্ধ করে দেয়।

এদিকে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের চাপে পড়ে গ্রেট ন্যাশনাল 'সতী কি কলঙ্গিনী', 'উভয় সংকট' জাতীয় নাটক অভিনয় করতে থাকে। কিন্তু এই সময় থেকেই গ্রেট ন্যাশনাল খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। পুরনো নাটকগুলিই চালাতে থাকে। ১৮৭৬-এর ৮ এপ্রিল থেকে এখানে অভিনয় বন্ধ থাকে। এরপর ১৮৭৭ এ দু' একটি অভিনয় হয়। এই বছরের ৬ অক্টোবর গ্রেট ন্যাশনালের শেষ অভিনয়। এদিকে ভুবনমোহন গিরিশচন্দ্রকে গ্রেট ন্যাশনালের ইজারা দেন। গিরিশের স্বত্বাধিকারী গ্রেট ন্যাশনাল আবার ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে অভিনয় শুরু করল। কিন্তু পারিবারিক কারণে গিরিশ ১৮৭৭-এর ৩০ নভেম্বর এর মালিকানা হস্তান্তরিত করেন। শেষপর্যন্ত ভুবনমোহন থিয়েটারটিকে নিলামে তোলেন। প্রতাপচাঁদ জুহুরি তা কিনে নিয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে অভিনয় চালান, গ্রেট ন্যাশনালের অস্তিত্ব শেষ হয়।

৩০৩.২.৫.৪ : মিনার্ভা থিয়েটার

গিরিশচন্দ্রের উদ্যোগে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৩ সালের ২৮ জানুয়ারি এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিডন স্ট্রিটের যে জমিতে আগে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল সেখানে নির্মিত হল এই থিয়েটারের নতুন বাড়ি। অভিনেতা অভিনেত্রী হিসেবে ছিলেন গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, তিনকড়ি, প্রমদাসুন্দরী প্রমুখ। গিরিশ ঘোষ অনূদিত 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে মিনার্ভার যাত্রা শুরু হয় (১৮৯৩, ২৮ জানুয়ারি)। শিক্ষিত রুচিশীল দর্শকের কাছে 'ম্যাকবেথ' এর

অভিনয় খুবই প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু সাধারণ দর্শক এই নাটককে গ্রহণ করতে পারল না। ক্ষুব্ধ গিরিশ এবার নামালেন হাল্কা নাচগানের নাটক 'মুকুলমুঞ্জরা' এবং 'আবুহোসেন'। আগের নাটকের অর্থক্ষতি সুদে আসলে পুষিয়ে দিল এই দুটি নাটক।

সাফল্যের চূড়ায় উঠে মিনার্ভা পর পর নামাল 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'নল-দময়ন্তী', 'জনা', 'বড়দিনের বখশিস', 'কমলেকামিনী', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি। এর মাঝে কয়েকটি পুরনো নাটক 'সধবার একাদশী', 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', প্রভৃতির অভিনয় হয়। এরই ফাঁকে হাল্কা নৃত্যগীতের নাটক 'স্বপ্নের ফুল', 'ফণির মণি', এবং হাল্কা ব্যঙ্গ প্রহসন 'সভ্যতার পান্ডা', 'পাঁচকনে' প্রভৃতি লিখে গিরিশ এখানে অভিনয় করান। তবে এই সবগুলির মধ্যে 'জনা' ও 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস' খুবই মঞ্চসফল হয়েছিল।

১৮৯৬-তে গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে দেন। গিরিশশূন্য মিনার্ভার দুর্দশা শুরু হল। এবার মিনার্ভার দায়িত্ব নেন চুনীলাল দেব। ইনি এখানে 'জুবিলি যজ্ঞ', 'আকবর', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'ফটিকচাঁদ', 'আলিবাবা', 'ল-বাবু' প্রভৃতি নাটক প্রহসনের অভিনয় করান। কিন্তু মিনার্ভার দুর্দশা না ক্রমে ক্রমেই বাড়তে থাকে । শেষ পর্যন্ত মালিক নগেন্দ্রভূষণ বাধ্য হয়ে ১৮৯৮-এর ৩১ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারকে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রি করে দেন। যারা কেনে তাদের কাছ থেকে ১৮৯৯ তে শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা কিনে নেন এবং মালিক ও পরিচালক হয়ে নবউদ্যোমে থিয়েটার চালাতে থাকেন। অর্ধেন্দুশেখর এখানেই থেকে যান। নতুনভাবে মিনার্ভায় দুর্গাদাস দে'র লেখা 'শ্রী' নাটক দিয়ে আবার অভিনয় শুরু হয়। এরপর 'মদালসা' (মালিক নরেন্দ্রনাথের লেখা), 'কিশোরসাধন', 'জুলিয়া', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বসন্তরায়' প্রভৃতির অভিনয় হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত। কিন্তু কোনো নাটকই ভালো চলেনি।

এরপর বৈদ্যুতিক আলোকমালায় মিনার্ভা সাজিয়ে অভিনয় হয় 'রঘুবীর'। এ সময় এখানে ম্যানেজার হন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। মালিক নরেন্দ্রনাথ আবার গিরিশচন্দ্রকেও এখানে নিয়ে আসেন। গিরিশ বঙ্কিমের 'সীতারাম' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করলেন ও জনপ্রিয়তা পেল নাটকটি। এরপর 'মণিহরণ' অভিনীত হল। গিরিশের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশ আবার মিনার্ভা ছাড়লেন, গিরিশহীন মিনার্ভা না চলায় নরেন্দ্রনাথও থিয়েটার ছাড়লেন। মালিক হলেন জমিদার প্রিয়নাথ দাস। সহযোগী বেণীভূষণ রায়। এদিকে অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে মিনার্ভা লীজ নিয়ে একসঙ্গে মিনার্ভা ও ক্লাসিক চালাতে লাগলেন। কিন্তু সফল হলেন না। কাজেই তিনি মিনার্ভার লীজ দিলেন মনোমোহন পাঁড়েকে। তিনি আবার সাবলীজ দিলেন চুনীলাল দেবকে। চুনীলাল কিছু হাল্কাচালের নাটকের অভিনয় ও উপহার প্রথা চালু করে সফল হলেন।

গিরিশ আবার এখানে যোগ দেন, সঙ্গে অপরেশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর। মিনার্ভা আবার নতুন করে জেগে উঠল। অভিনীত হল 'হরগৌরী', 'বলিদান', 'রাণাপ্রতাপ', 'রঘুবীর', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি। ইতিমধ্যেই ১৯০৫-এর ৬ সেপ্টেম্বর লর্ড কার্জন 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষণা করেন। তখন গিরিশ রচনা করেন 'সিরাজদৌল্লা, মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হল ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫। নাকটটি প্রচন্ড জনপ্রিয় হল। জাতীয় আন্দোলনের দিনে বাংলা মঞ্চ সেদিন তার দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছিল। এই সময়ের আর উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'মীরকাশেম', 'দুর্গাদাস', 'আলিবাবা', 'সংসার' প্রভৃতি।

১৯০৭-এ এখানে অভিনীত হয় 'য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি। কিন্তু জুলাই মাসে গিরিশ কোহিনূরে চলে গেলে মিনার্ভা বিপদে পড়ে। অমর দত্তকে তখন আনা হয় এখানে। অভিনীত হয় 'প্রফুল্ল', 'দুর্গাদাস', 'সিরাজদৌল্লা' প্রভৃতি। ১৯০৮-এ 'বলিদান', 'নূরজাহান', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মেবার পতন', 'শাস্তি কি শান্তি', আর সব পুরনো নাটক। ১৯০৯-এর উল্লেখযোগ্য অভিনয় 'সাজাহান', 'দুর্গাদাস', 'ভগীরথ' প্রভৃতি। ১৯১০-এ 'চন্দ্রশেখর' এর নাট্যরূপ 'অশোক', 'শঙ্করাচার্য, 'হিরন্ময়ী', 'বাঙ্গলার মসনদ' প্রভৃতি। ১৯১১-তে মনোমোহন তাঁর মিনার্ভার এক-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দেন মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে। ১৯১২-তে মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলে মনোমোহন নিজেকে সম্পূর্ণ মিনার্ভার মালিক বলে ঘোষণা করেন। এই সময় অমৃতলাল বসু স্টার ছেড়ে এখানে আসেন। অভিনীত হয় 'খাসদখল', 'রঙ্গিলা', 'রূপের ডালি' প্রভৃতি।

এদিকে মৃত মহেন্দ্রনাথের ভাই উপেন্দ্রনাথ মিনার্ভার মালিকানা ফিরে পাবার জন্য মামলা করেন। মনোমোহন সেই মামলায় হেরে যাবেন বুঝতে পেরে মিনার্ভা অন্যত্র সরিয়ে নেন (৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে)। সেখানে গিরিশের 'কালাপাহাড়' নাটক দিয়ে অভিনয় শুরু হয়। এদিকে উপেন্দ্রনাথ মামলা জিতে মিনার্ভাকে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে আনেন। ম্যানেজার হন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিনার্ভায় মনোমোহনের যুগ শেষ হল বলা যায়। উপেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্তৃত্বে এখানে অভিনীত হয় — 'সিংহল বিজয়', 'বঙ্গনারী', 'মিশরকুমারী', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'প্যালারামের স্বাদেশিকতা'। এই সময়ই (১৯২২) মিনার্ভা আগুনে পুড়ে যায়। তবে তা আবার সারিয়ে নিয়ে অভিনয় শুরু হয় — 'আত্মদর্শন', 'দেবযানী', 'বেহুলা', 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি। কিছু নতুন ও কিছু পুরনো নাটক অভিনয় করে মিনার্ভা কাটিয়ে দিল বেশ কয়েক বছর। মাঝখানে স্বাধীনতার পরে কয়েক বছর নানা কারণে মিনার্ভায় অভিনয় বন্ধ থাকে সাময়িকভাবে।

এরপর ১৯৪৯ থেকে নিয়মিত এখানে অভিনয় হতে থাকে। এই সময়ের সবচেয়ে সফল নাটক ১৯৫৫-তে সন্তোষ সেনগুপ্তের 'এরাও মানুষ'। এরপর 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী এখানে আসে অভিনয় করতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তারপর উৎপল দত্তের 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা লীজ নিয়ে ১৯৫৯-১৯৬৯ পর্যন্ত বহু নাটকের সাফল্যজনক অভিনয় করে। এখানে অভিনয় করতে এসেই উৎপল দত্ত নাট্যকার হয়ে পড়লেন। উৎপল দত্তের দল ১৯৭১-এ মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলে, এখানে অভিনয় প্রায় বন্ধ হতে বসে। এরপর বেশকিছু পেশাদার থিয়েটার ব্যবসায়িক স্বার্থে এই থিয়েটারে কিছু কুরুচিপূর্ণ অভিনয় চালিয়ে যায়। মিনার্ভার কৌলিন্য নষ্ট হতে বসে। এই সময় অভিনীত হয় 'প্রজাপতি', 'ব্যভিচার', 'এক্সজোন', 'শুধু তোমাকে চাই' নামীয় রুচিহীন বিকৃত সব নাটক। ১৯৭০-এর পর এক প্রকার মিনার্ভা থিয়েটার জীর্ণ ও ব্যবহারহীন হয়ে পড়ে। এখনও সেভাবেই আছে।

যাইহোক, সবমিলিয়ে বলা যায় মিনার্ভা থিয়েটারকে গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, ছবি বিশ্বাস, উৎপল দত্ত এই সমস্ত নাট্য ব্যক্তিত্ব একটি জায়গায় তুলে দিয়েছিলেন। বিচিত্রমুখী অভিনয়ের ইতিহাস বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করেছিল এই মিনার্ভা থিয়েটার। এই দিক দিয়ে এই থিয়েটারের একটি চিরস্থায়ী আসন অবশ্যই থাকবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে।

৩০৩.২.৫.৫ : বেঙ্গল থিয়েটার

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ধনকুবের সতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ৯ নং বিডন স্ট্রিটে বাংলা দেশের তৃতীয় সাধারণ রঙ্গালয়, 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা হয়। এর ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন শরৎচন্দ্র ঘোষ। তারই সহযোগিতায় একটি কমিটি নির্ধারিত হয়, যে কমিটির সভ্যরা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরি বৈষ্ণব, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (খ্যাতিমান গিরিশচন্দ্র নন), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা। থিয়েটার হলটি তখন কলকাতায় প্রচলিত লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের অনুকরণে তৈরী করা হয়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য কলকাতায় বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম রঙ্গালয় যার নিজস্ব মঞ্চগৃহ ছিল।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের যাত্রা শুরু হয় এবং এই প্রথম বাংলা থিয়েটারে নারী চরিত্রে মেয়েরাই অভিনয় করে। একসঙ্গে শ্যামা, জগত্তারিনী, এলোকেশী এবং গোলাপ এই চারজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি এই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই রঙ্গালয়ে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয়ের পর অক্টোবরে রামনারায়ণের 'স্বপ্নধন', এছাড়া বিদ্যাসুন্দর এবং 'যেমন কর্ম তেমন ফল' অভিনীত হয়। কিন্তু কোনো নাটকই সেভাবে দর্শকমনে ছাপ ফেলতে পারেনি। বলাবাহুল্য অভিনেত্রী গ্রহণের বিষয়টি আলোড়ন তুললেও দর্শকানুকুল্য লাভ করতে পারেনি।

১৮৭৩-এর ৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের 'মোহান্তের এই কি কাজ' নাটকটি অভিনীত হয় এবং এই নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের কপাল খুলে গেল। পরপর 'চক্ষুদান', 'রত্নাবলী', বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৮৭৪ সালে বেঙ্গল থিয়েটার সাফল্যের চরম শিখরে পৌঁছায়। 'পদ্মাবতী' 'পুরুবিক্রম', 'বঙ্গের সুখাবসান' 'মণিমালিনী', 'একেই কি বলে বাঙালী সাহেব', 'প্রভাবতী', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', প্রভৃতি নাটকগুলি জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়।

১৮৭৫-এ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মন, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেরিয়ে এসে বেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং 'সতী কি কলঙ্কিনী' এই গীতিনাট্যটি অভিনয় করে। এছাড়া এই সম্মিলিত দলটি 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের নাট্যরূপ, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ', 'ভীমসিংহ', 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ, 'বঙ্গবিজেতা', 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি নাটকগুলির অভিনয় করে।

১৮৭৬-এর গোড়ার দিকে বেঙ্গল থিয়েটারের নতুন বাড়ি নির্মিত হয়। ফলে কিছুদিন অভিনয় বন্ধ ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে আবার ব্রিটিশ সরকার দ্বারা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হওয়ায়, বেঙ্গল থিয়েটারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ হয় এবং শুরু হয় পৌরাণিক, গীতিনাট্য, অপেরা প্রভৃতির অভিনয়, ১৮৭৭-এ অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি 'আলিবাবা', 'অপূর্বসতী', 'রত্নাবলী'। বঙ্কিমচন্দ্রের অসংখ্য উপন্যাসের নাট্যরূপ সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হতে থাকে।

১৮৭৮-এ এসে বেঙ্গল থিয়েটারের হাতে কোনো নতুন নাটক না থাকায় পুরোনো নাটকগুলিই অভিনীত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৮০-তে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রাণপুরুষ শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হয়। এই রকম বিধ্বস্ত

অবস্থা সামাল দিতে দায়িত্ব নেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সময়ে অভিনীত হয় তাঁরই লেখা নাটক - 'সুভদ্রা হরণ', 'রাবণ বধ', 'প্রভাস মিলন', 'পাণ্ডব নির্বাসন', 'নন্দবিদায়', প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক। সেক্ষেত্রে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথমভাগ অর্থাৎ ১৮৭৩-১৮৮০ যদি শরৎচন্দ্র ঘোষের হয় তবে এরপর থেকে ১৯০১ পর্যন্ত বিহারীলালের।

১৮৮২-তে বেঙ্গল থিয়েটারে অমৃতলাল বসু যোগ দেন। এই সময় তাঁর কিছু প্রহসনও এখানে অভিনীত হয়েছিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সময় থেকে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটক অভিনয়ের জোয়ার এসেছিল এবং সেই জোয়ারে বেঙ্গল থিয়েটারও অসংখ্য পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ করেছিল। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে 'শকুন্তলা' নাটকটি বৃটিশ যুবরাজের কলকাতায় আগমন ও তাঁর সম্বর্ধনার জন্য অভিনীত হয়। সে কারণে লর্ড লিটনের অনুরোধে বেঙ্গল থিয়েটার ব্রিটিশ রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ 'Royal' উপাধি লাভ করে এবং এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে মহেন্দ্রলাল বসু, কুসুমকুমারী, প্রমদাসুন্দরী প্রভৃতি কয়েকজন নট-নটী বেঙ্গলে যোগ দেন। তবে বেঙ্গল থিয়েটার সেই অর্থে কখনোই নতুন নাটক উপস্থাপন করতে পারেনি।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত শেষ পর্যায়ের নাটকগুলি 'বভ্রুবাহন', 'প্রমদরঞ্জন', 'সুকন্যা', 'যমুনা', 'দাওয়াই' প্রভৃতি। এর কোনোটাই দর্শকমনে সাড়া ফেলতে পারে নি। এর মধ্যে ১৯০১ সালে ২০ এপ্রিল বিহারীলালের মৃত্যু হয়। এরপর বেঙ্গল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারের সাফল্য ও ব্যর্থতা ঃ

সাফল্য ঃ

১। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম বাংলা থিয়েটার যাদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল।

২। ন্যাশনালের পর যথার্থ সাধারণ রঙ্গালয় হল বেঙ্গল থিয়েটার। এরাই প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ করে।

৩। এই থিয়েটারই বিলিতি রঙ্গমঞ্চের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করে।

ব্যর্থতা :

১। এই থিয়েটার প্রথমদিকে অনেকটা ধনী বাঙালীর প্রাসাদ মঞ্চের নতুন সংস্করণ ছিল। ফলে তা অনেকের কাছে জাঁকজমকপূর্ণ সৌখিন থিয়েটার ছিল আর এই কারণেই এই থিয়েটারের প্রতি সাধারণ দর্শকদের আগ্রহ হারিয়েছিল।

২। বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সময় দেশপ্রেমমূলক কোনো নাটক অভিনয় করিয়ে জনমত গঠনের কোনো দায়িত্ব পালন করেনি বরং পৌরাণিক-সামাজিক, গীতিনাট্য প্রভৃতির অভিনয় করিয়ে নিরাপদে জনপ্রিয়তা লাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। বৃটিশ সরকারের এই কালো আইনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত থিয়েটার সাফল্যের কথা না ভেবে প্রতিরোধ গড়েছিল তারাই বেশি দর্শক আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

৩। এরা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল 'Royal' উপাধি, আর এটাই অন্যের কাছে ব্যঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সবশেষে তাই বলা যায়, সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও বেঙ্গল থিয়েটার বাংলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে নতুন কয়েকটি বিষয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তা পরবর্তী রঙ্গ মঞ্চগুলি গ্রহণ করেছিল এবং সমৃদ্ধ হয়েছিল।

৩০৩.২.৫.৬ : স্টার থিয়েটার

কলকাতার ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র গুর্মুখ রায় থিয়েটার প্রমোদের মোহে এবং বিশেষ করে বিনোদিনীর আকর্ষণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। গিরিশ তখন প্রতাপচাঁদ জহুরির ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে নতুন থিয়েটারের আশায় ঘুরছিলেন। এমন সময় গুর্মুখ রায় গিরিশের কাছে প্রস্তাব দেয়, নতুন থিয়েটার খোলার। শর্ত একটাই অভিনেত্রী বিনোদিনীকে তার রক্ষিতা হতে হবে। গিরিশ ও প্রমুখের অনুরোধে বিনোদিনী এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। ফলে বাগবাজারের কীর্তিচন্দ্র মিত্রের ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে গুর্মুখ রায়ের অর্থে এবং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র প্রমুখের তত্ত্বাবধানে নতুন 'ইষ্টক নির্মিত' পাকা রঙ্গালয় তৈরী হল এবং 'স্টার থিয়েটার' নামে তা রেজিস্ট্রি করা হল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শনিবার গিরিশের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক নিয়ে মহাসমারোহে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হল। এখানে অভিনয় করেন দক্ষ—গিরিশ, মহাদেব—অমৃতলাল মিত্র, সতী—বিনোদিনী প্রমুখেরা। এই নাটক দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টারের গৌরবময় যাত্রা শুরু হল।

গুর্মুখ রায় স্টারে মোট ছয় মাস মালিক থাকাকালীন অভিনীত হয় — ১৮৮৩ : 'দক্ষযজ্ঞ' (২১-জুলাই), 'ধ্রুবচরিত' (১১ আগস্ট), 'সীতার বনবাস' (২৬ সেপ্টেম্বর) 'চক্ষুদান' (২৭ অক্টোবর), 'মেঘনাদ বধ' (২১ নভেম্বর), 'সধবার একাদশী' (৫ ডিসেম্বর) প্রভৃতি নাটক। এই ছয় মাসে দীনবন্ধু, রামনারায়ণ, অমৃতলালের একটি নাটক, 'মেঘনাদ বধ'-এর নাট্যরূপ ছাড়া আর সবই গিরিশের লেখা নাটক এবং গিরিশের সব নাটকই পৌরাণিক নাটক। 'দক্ষযজ্ঞের' পর 'ধ্রুবচরিত' ও 'নলদময়ন্তী' নাটক দুটি খুবই সাফল্যলাভ করেছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের লোকজনের চাপে এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে স্টারের স্বত্ব ছেড়ে দিতে চান এবং ১৮৮৪-র জানুয়ারি মাসে গুর্মুখ রায় মাত্র এগোরো হাজার টাকায় অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বাবু ও অমৃত লাল বসু — এই চারজনকে স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দিলেন। পারিবারিক শর্তের কারণে গিরিশ মালিকানায় অংশ নেননি। তবে গুর্মুখ চলে গেলেও বিনোদিনী স্টারে রয়ে গেলেন।

এই চারজন নতুন মালিকের তত্ত্বাবধানে স্টার আরো চার বছর চলেছিল। ম্যানেজার, অভিনয় শিক্ষক, নাট্যকার হিসেবে গিরিশ রইলেন সর্বেসর্বা হয়ে। এই চার বছরের অভিনয়ের উল্লেখযোগ্য তালিকা এবার দেওয়া যেতে পারে।

১৮৮৪ ঃ পূর্বের নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। তাছাড়া 'অভিমন্যুবধ', 'কমলেকামিনী', 'চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে', 'আদর্শসতী' প্রভৃতি নাটকগুলিও অভিনীত হয় এখানে। এই বছরের বেশির ভাগ নাটকই গিরিশের। তবে এই বছরে নতুন নাটকের মধ্যে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় নানা দিক দিয়ে

উল্লেখযোগ্য। নিমাই-বিনোদিনী এবং নিতাই-বনবিহারিনী নৃত্যে, গীতে ও অভিনয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন। এই নাটকটি পরমহংস রামকৃষ্ণদেব দেখতে আসেন। এরপর এখানে অভিনীত হয় গিরিশের প্রহ্লাদ চরিত্র। তবে তা তেমন জমেনি। বরং অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

১৮৮৫ ঃ এই বছরেও প্রায় গিরিশের লেখা বেশিরভাগ নাটক এখানে অভিনীত হয়। যেমন - 'চৈতন্যলীলা' (২য় ভাগ), 'দোললীলা', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বুদ্ধদেব চরিত' প্রভৃতি। এই বছরের সবচেয়ে সফল নাটক হল — 'বুদ্ধদেব চরিত'।

১৮৮৬ ঃ আগের নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয় এবং 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'বেল্লিক বাজার', 'কমলেকামিনী' প্রভৃতি নতুন নাটকও অভিনয় করা হয়। এ বছরের সবচেয়ে সফল প্রযোজনা 'বিল্বমঙ্গ ল ঠাকুর'। এছাড়া 'বেল্লিকবাজার'-এর রঙ্গরস ও ব্যঙ্গ এবং অমৃতলাল বসুর রঙ্গ ও শ্লেষাত্মক অভিনয় নতুন মাত্রা দেয়। তবে 'বেল্লিকবাজার' - নাটকেই বিনোদিনীর মঞ্চে শেষ অভিনয়।

১৮৮৭ ঃ 'রূপসনাতন', 'বুদ্ধদেব চরিত', 'বেল্লিকবাজার' অভিনীত হয়। নতুন নাটকের মধ্যে রূপ সনাতন খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। এই বছরেরই ৩১ জুলাই স্টারে শেষ অভিনয় হয়। নাটক 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার', অমৃতলাল বসু অভিনয় শেষে মর্মস্পর্শী ভাষায় দর্শকদের বিদায় সম্ভাষণ জানান। এই সালটা স্টারের পক্ষে এমনটিতেই ভালো যাচ্ছিল না, অন্যদিকে ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাল লাল শীল থিয়েটার করার সখে মত্ত হয়ে কৌশলে স্টারের জমি কিনে নিয়ে, সেখানে এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের প্রায় পাঁচ বছরের ইতিহাস শেষ হল।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে স্টার থিয়েটারের কার্যাবলীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক —

১. ন্যাশনাল থিয়েটারের ইতিহাসে বেশ কিছু ছেলে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই বলা যায় স্টার আদি ন্যাশনাল (১৮৭২) থিয়েটারেরই ধারাবাহিক উত্তরসুরী। প্রধান শিল্পী ও কর্মীরা একই। পার্থক্য মালিকানায়। ন্যাশনাল ছিল শিল্পী ও কর্মীদের, স্টার হল একজন মালিকের। থিয়েটারে অনাগ্রহী একজন নটীলোলুপ মালিকের। স্টারের মধ্যে পূর্বতন ন্যাশনালের উত্তরাধিকার ছিল বলেই বাঙালীর অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

২. ১৮৭৬-এর অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে থিয়েটারে নাট্যাভিনয় ও নাটক থেকে জাতীয়তার আবেগ দূরে সরে গেল। সঙ্গে থিয়েটারের নামকরণ থেকেও পূর্বের সেই অনুরাগ ফিকে হয়ে গেল। স্টার থেকেই নামকরণ হতে থাকল অন্যরকম — স্টার, এমারেল্ড, বীণা, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর।

৩. স্টারেই গিরিশ তাঁর নাট্যকার জীবনের সেরা নাটকগুলি রচনা করেন। বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের সেরা সময়ও এই স্টারেই। আবার এখানেই তাঁর অভিনেত্রী জীবনের শেষ অধ্যায় রচিত হয়ে যায়।

৪. এখানেই 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দেখতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন, তিনি আসেন মূলত ধর্মভাবের আকর্ষণে। তাতে বাংলা থিয়েটারের লাভ ও ক্ষতি দুটোই হল। লাভ বলতে, তাঁর আগমনে এতোদিন যে থিয়েটার ভদ্র ও ধর্মীয় মানুষের কাছে অপাঙক্তেয় ছিল, রামকৃষ্ণদেবের পদার্পণে তা ধন্য ও পবিত্র হল। অন্যদিকে তাঁর সংস্পর্শে বিনোদিনী, গিরিশের জীবনে পরিবর্তন আসে, তাতে তাঁদের ব্যক্তি জীবনে শান্তি এলেও বাংলা থিয়েটারের অপূরণীয় ক্ষতি হল, বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দিলেন, শৈব গিরিশ 'ভক্ত ভৈরবে' রূপান্তরিত হল।

৩০৩.২.৫.৭ : এমারেল্ড থিয়েটার

৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে স্টার থিয়েটারের যে বাড়িটি গুর্মুখ রায়ের স্বত্বধিকারে ছিল তা শেষপর্যন্ত নিলামে ওঠে। এই নিলামে ওঠা বাড়ি থিয়েটারের সখ মেটানোর জন্য ধনকুবের মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল কিনে নেন এবং স্টার থিয়েটার নাম পরিবর্তন করে 'এমারেল্ড থিয়েটার' নাম রাখেন। তবে কেবলমাত্র থিয়েটার হলটির নাম পরিবর্তন নয়, গোপাল শীল পুরোনো এই বাড়িটিতে প্রচুর খরচ করে ডায়নামা বসিয়ে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা করেন। বাংলা রঙ্গালয়ে এই প্রথম বিজলী আলোর প্রবর্তন করা হল। সেই আলো ঝলমলে সাজানো গোছানো পরিবেশে যাত্রা শুরু হল হাতিবাগানে নতুন আরেক থিয়েটার — যার নাম এমারেল্ড থিয়েটার।

নতুন এই হলটির ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত হন কেদার চৌধুরী। তবে তিনি শুধু ম্যানেজার নন, নাট্যকার, পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিনী, কিরণশশী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁদের নিয়ে ১৮৮৭ সালের ৮ অক্টোবর কেদার চৌধুরীর লেখা 'পাণ্ডব নির্বাসন' নাটক দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের উদ্বোধন করা হয়। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার দায়িত্বে রইলেন জহরলাল ধর এবং সুকুমারী, শশিভূষণ দেব। এরপর এখানে অভিনীত হল রবীন্দ্রনাথের নাটক, ১৮৮৭-র ২৬ অক্টোবর 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজাবসন্তরায়'।

গোপাল শীল তখন কেদার চৌধুরীর পরিবর্তে গিরিশচন্দ্রকে ম্যানেজার নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গিরিশ তখন নাট্য পরিচালক ও ম্যানেজার হিসেবে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাটকগুলিও সমাদর পাচ্ছিল। গিরিশকে এনে এমারেল্ডকে নতুন করে চালাবার চেষ্টা করলেন গোপাললাল। গিরিশ এমারেল্ডে যোগ দেন ৫ বছরের চুক্তিতে। ২০ হাজার টাকার বোনাস এবং মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে।

'নীলদর্পণ' নাটক দিয়ে গিরিশ এখানে কাজ শুরু করলেন। তারপর 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'নবীন তপস্বিনী', 'মায়াতরু' প্রভৃতি। গিরিশ ঘোষ এমারেল্ড থিয়েটারে যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে কেদার চৌধুরীর পূর্ব অভিনীত নাটকগুলির অভিনয় বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি একমাত্র তার দায়িত্ব নেওয়ার দিনটিতে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকটি ছাড়া আর কোনো নাটক অভিনয় করাননি। মূলত তাঁর সময়ে বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ, মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নাট্যরূপ ও নীলদর্পণ, 'জামাই বারিক',

'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শলিখের ঘাড়ে রোঁ, প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে গিরিশ ঘোষের চতুর্বিধ (নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, ম্যানেজার) গুণে এমারেল্ডের ভাগ্যাকাশে নতুন আলোর দেখা মেলে। পাশাপাশি এই সময়ে এখানে অর্ধেন্দুশেখরের উপস্থিতি দর্শক মনে এমারেল্ডের গ্রহণযোগ্যতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু দু:খের বিষয় এমারেল্ড থিয়েটারের এরূপ অবস্থার মধ্যে মালিক গোপাললালের সখ মিটে যায়। অন্যদিকে অর্ধেন্দুশেখরও এমারেল্ড ছেড়ে চলে যান। গোপাললাল তখন মতিলাল সুর, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ব্রজনাথ মিত্র এদের হাতে থিয়েটার বাড়িটি লিজ দেয়। ঘটনাটি ১৮৮৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারির। এদিকে গিরিশ ঘোষও এই সময় যেহেতু গোপাললালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন সেহেতু তার অবর্তমানে এমারেল্ড ছেড়ে স্টার থিয়েটারে যোগ দেন।

নতুন মালিকদের হাতে এমারেল্ডের অবস্থা আবার খারাপ হতে শুরু করে। গোপাললাল এই দুরবস্থা সহ্য করতে না পেরে ১৮৮৯ এর ৮ এপ্রিল পুনরায় এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত এখানে অভিনয় বন্ধ রেখে রঙ্গমঞ্চের ভেতরকার এবং থিয়েটারের অন্য সমস্ত অবস্থার পুনর্মুদ্রণ করেন। এবার সেখানে নাট্যকার হিসেবে যুক্ত হন অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং ম্যানেজার কেদার চৌধুরী। অর্থাৎ গিরিশের অবর্তমানে ছন্নছাড়া এমারেল্ড থিয়েটারের কিছুদিন অভিনয় বন্ধ রেখে, তার সমস্ত দিকের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে পুনরায় অভিনয় চালু করা হয়। এই সময়ে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল - 'নন্দবিদায়', 'বক্কেশ্বর', 'গাধা ও তুমি', 'গোপী গোষ্ঠ' এবং 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। শেষমেশ এখানে মনমোহন বসুর 'রাসলীলা' নাটকটি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে ছিল এবং এভাবেই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের ১৮৮৯ সালটি কেটে যায়।

১৮৯০ এর পর থেকে এমারেল্ডের অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পুরনো নাটকগুলির অভিনয়ের মাধ্যমে থিয়েটার তার অভিনয়ের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ১৮৯৩-এর ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে অতুল মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল বাবু 'লেসি' হন। তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে শেষে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিকে 'লেসি' করা হয়। অর্ধেন্দু শেখর এবার নিজের মালিকানায় এমারেল্ড চালাতে থাকেন। তাঁর সময়ের প্রথম অভিনয় অতুল মিত্রের 'মা'। এই নাটকে আবার এমারেল্ড জেগে ওঠে। এরপর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর 'মান' (১৮৯৪, ৪ ডিসেম্বর), 'রাজা বসন্ত রায়' (জানুয়ারি, ১৮৯৫), আবুহোসেন (গিরিশ, জানুয়ারি, ১৮৯৫) এমারেল্ডে রমরম করে চলতে থাকে।

অর্ধেন্দুশেখর নাটক বুঝলেও থিয়েটার ব্যবসা বুঝতেন না। তাই কিছু কালের মধ্যেই এমারেল্ডে আর্থিক সংকট দেখা দিল। এরপর এমারেল্ডের মালিকানা হস্তান্তর করা হল — বি. ডি. কোম্পানীর মালিক বেনারসী দাসকে। ১৮৯৫ সালের, ১০ নভেম্বর তিনি দায়িত্ব নিলেন। সেদিন থেকে 'কপালকুন্ডলা' অভিনয় শুরু হল। বেশ ভালো চলল। এই বছরের উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'-র নাট্যরূপ, রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'-র পরিবর্তিত নাম দুকড়ি দত্ত, ক্ষীরোদ প্রসাদের 'ফুলশয্যা' প্রভৃতি।

এমারেল্ডের শেষ অভিনয় ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৬, ‘কপালকুন্ডলা’ ও ‘ভাগের মা গঙ্গা পায় না’ - এ দুটি নাটক। এরপর এমারেল্ডে আর কোনো অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়নি।

৩০৩.২.৫.৮ : বীণা থিয়েটার

কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) কলকাতার ৩৮ নম্বর মেছুয়াবাজার রোডে তাঁর বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। আর্থিক সচ্ছলতা তেমন না থাকার কারণে রঙ্গমঞ্চটি খুব সুদৃশ্যভাবে গড়ে তুলতে পারেননি। দৃশ্যপট থেকে শুরু করে বাইরের চাকচিক্য কিছুই খুব ভালো ছিল না। খ্যাতিমান নট-নটীদেরও তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি। কলকাতার সমস্ত রঙ্গালয়গুলিতে তখন নারীর ভূমিকায় অভিনেত্রীরাই অবতীর্ণ হচ্ছিল, কিন্তু সেই যুগে অভিনেত্রীদের বাদ দিয়েই রাজকৃষ্ণরায় অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। এটাও ঠিক যে, নাট্যাভিনয়ের পক্ষে তখন অভিনেত্রীদের বাদ দিয়ে থিয়েটার চালানো অসম্ভব ছিল।

‘বীণা’-র মালিক, নাট্য পরিচালক, নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা ‘চন্দ্রহাস’ (বা দ্বিতীয় প্রহ্লাদ) নাটক দিয়ে ‘বীণা’র উদ্বোধন হল ১৮৮৭-এর ১০ ডিসেম্বর। এরপর ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘ভন্ড দলপতি দন্ড’ অভিনীত হয়। ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ খুব প্রশংসিত হয়। কিন্তু এরপর থেকে ক্রমেই দর্শক সমাগম হ্রাস পেতে থাকে। ফলে রামকৃষ্ণ রায়ের আর্থিক সংকট প্রবলতর আকার ধারণ করে। ঋণগ্রস্ত রাজকৃষ্ণ দেনা শোধের জন্য বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন ‘আর্য নাট্যসমাজ’কে। এরা বীণা থিয়েটার অভিনয় শুরু করে ১৮৮৮-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এরাও ব্যর্থ হল। এই বছরেরই নভেম্বর মাসে তারা অভিনয় বন্ধ করে দিল।

এবারে ঋণগ্রস্থ রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন উপেন্দ্রনাথ দাসকে। উপেন্দ্রনাথ তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরে এসে এর দায়িত্ব নিলেন — নাম দিলেন ‘নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার’। শত চেষ্টাতেও তিনিও সাফল্যের মুখ দেখলেন না। ১৮৮৮-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৮৯-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি থিয়েটার চালাতে সক্ষম হলেন। এরপর রাজকৃষ্ণ রায় নিজেই দায়িত্ব নিলেন বীণা থিয়েটারের। শুরু হল বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্ব। এবার কিন্তু তিনি তাঁর থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করলেন। তখনকার খ্যাতিময়ী অভিনেত্রীও নেওয়া হল। আর্য নাট্যসমাজের অভিনেতারাও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় বীণা থিয়েটারের উদ্বোধন হল ১৮৮৯ সালের ২০ জুলাই, শনিবার। তাঁরই লেখা নাটক ‘মীরাবাঈ’ দিয়ে উদ্বোধন হল। এই নাটকের গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এখানে সম্ভবত তিনি মাইক্রোফোনে নেপথ্য সঙ্গীতগুলি পরিবেশন করেছিলেন। স্টেটস্ম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনে (২০-৭-১৮৮৯) রাজকৃষ্ণ রায় জানিয়েছিলেন: ‘Special attraction songs by scientific process.’ ‘মীরাবাঈ’ নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়ে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল। এরপর ১৮৮৯তে ‘লীলাবতী’, ‘শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা’, ‘সধবার একাদশী’, ‘চমৎকার’, ‘ঘোষের পো’ ১৮৯০ তে ‘ডাক্তারবাবু’, ‘উভয় সঙ্কট’, ‘চন্দ্রহাস’, ‘হরধনুভঙ্গ’, ‘লোভেন্দ্র গবেন্দ্র’ প্রভৃতি নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হল। এই নাটকগুলির মধ্যে সিংহভাগ নাটকই রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা।

আসলে ‘বীণা’র দ্বিতীয় পর্বে ‘বীণা’কে সাফল্যের শিখরে তোলার জন্য রামকৃষ্ণ রায়ের চেষ্টাতে কোনো খামতি ছিল না। অভিনেত্রী গ্রহণ, প্রবেশমূল্য কমানো, খ্যাতি পাওয়া নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয়, মঞ্চসজ্জার সৌন্দর্যবৃদ্ধি, একই রাতে একাধিক নাটক দেখাবার ব্যবস্থা সবই তিনি করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর ঋণমুক্তি ঘটল না। তার কারণ হল রাজকৃষ্ণের ব্যবসায়িক বুদ্ধি পাকাপোক্ত না হওয়াতে তিনি দর্শনী মূল্য এত কমিয়ে দিলেন, যে লাভের পরিবর্তে তিনি আরো ঋণী হয়ে পড়লেন। শেষমেশ তাঁর এত আর্থিক সংকট দেখা দিল যে, বাধ্য হয়ে অনুসন্ধান পত্রিকাতে জনসাধারণের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। তাতে কোনো সুরাহা হল না। এরপর তিনি স্টার থিয়েটারে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে নাট্যকার হিসেবে যোগ দেন। মাস মাইনে একশো টাকা।

এই সময় বীণা থিয়েটার ছোট ছোট কিছু নাট্যদল ভাড়া নিয়ে অল্প দিন অভিনয় করে। তারপর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটার বিক্রি করে দেন। ১৮৯২-এর নভেম্বর মাসে তা কিনে নেন প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। তার নাম দেওয়া হল ‘ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস’। প্রিয়নাথও এখানে এসে সর্বসান্ত হন। যাইহোক, রামকৃষ্ণ চালিত বীণা থিয়েটারের শেষ অভিনয় ১৮৯০ এর ১৬ নভেম্বর। বীণা থিয়েটারের কারণে আর্থিক অনটনে পড়ে রামকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু তরান্বিত হয়। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৮৯৪ এর ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে ই বীণা থিয়েটারের যবনিকা পাত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘বীণা থিয়েটার’ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। নাট্যকার হিসেবেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হননি। কারণ একদিকে যাত্রাধর্মী মনোমোহন বসু এবং অন্যদিকে নাট্যধর্মী গিরিশ এই দুজনের মাঝখানে পড়ে তিনি তাঁর নাটকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করতে পারেননি। তাঁর নাট্যশালার মতো তাঁর নাটক প্রহসন অপেরাগুলিও সে যুগের মঞ্চের তাৎক্ষণিক চাহিদা মিটিয়েই শেষ হয়ে গেছে। তবে নাট্যমঞ্চ চালনায় অপরিণামদর্শিতা মালিক ও পরিচালককে কিভাবে সর্বস্বান্ত করে দেয়, তার ঋণাত্মক (Negative) উদাহরণ হিসেবে রাজকৃষ্ণ ও তাঁর বীণা থিয়েটার পরবর্তী বাংলা থিয়েটার পরিচালনায় শিক্ষার উদাহরণ হিসেবে সাহায্য করেছে।

৩০৩.২.৫.৯ : কোহিনূর থিয়েটার

১৯০৭-এর এপ্রিলে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার শরৎকুমার রায় নীলামে কিনে, সেখানে কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখানে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। তারপরে দুজনে মিলে নতুন দল গঠনে নেমে পড়েন। স্টার থেকে ভাঙিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে নাট্যকার হিসেবে আনা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন থিয়েটার থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও আনা হয়। সর্বোপরি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে এখানে আনা হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘চাঁদবিবি’ নাটক দিয়ে ১৯০৭ সালের ১১ আগস্ট এখানে উদ্বোধন হল। আহমদনগরের বীরনারী চাঁদবিবি মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য আমৃত্যু লড়েছিলেন। এই গৌরবময়

লড়াইয়ের কাহিনী বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে বাংলার দর্শকের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। এই নাটকের সমস্ত কিছুর পাশাপাশি অভিনয়ও দুর্দান্ত হয়েছিল। সবমিলিয়ে 'চাঁদবিবি' অসম্ভব সাফল্য পেল। 'চাঁদবিবি' সফল হওয়াতে কোহিনূর বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপের অভিনয়ের পরেই আরো দুটি ঐতিহাসিক নাটক 'ছত্রপতি শিবাজী' এবং 'মীরকাশিম' - এর অভিনয় করল। এই একই সময় মিনার্ভাতে চলছিল 'ছত্রপতি শিবাজী'। তবে কোহিনূরের 'ছত্রপতি শিবাজী'র অভিনয় অনেক বেশী ভালো হল। 'মীরকাশিম' ততটা উচ্চাঙ্গের না হলেও দানীবাবুর অভিনয় দেখার মতো হল।

এরপর ২৫ ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'দাদা ও দিদি' মঞ্চস্থ হল। নাটকটি মোটামুটি সাফল্য পেল। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯০৭-এর ৩১ ডিসেম্বর কোহিনূরের স্বত্বাধিকারী শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু হল। তখন তাঁর ভাই শিশির কুমার রায় রিসিভার হিসেবে থিয়েটারের দায়িত্ব নিল। ১৯০৮-এর প্রথম ছয় মাসে এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'অশোক', 'বরুণা', 'ভূতের বেগার', গিরিশের 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হল।

এই বছরেরই মাঝামাঝি গিরিশের সঙ্গে শিশিরকুমার রায়ের মনোমালিন্য হলে গিরিশ তাঁর পুত্র দানীবাবুকে নিয়ে চলে যান মিনার্ভায়। এরপর এখানে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৯০৮-এর জুলাই মাস)। তিনি একমাস মতো এখানে কাজ করেন। এই সময়ে এখানে অভিনীত হয় 'সংসার', 'জেনানাযুদ্ধ', 'আবুহোসেন', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'নীলদর্পণ', 'প্রফুল্ল', 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি। এখানে অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় উচ্চ প্রশংসতি হল। তারই বদান্যতায় কোহিনূরে আবার স্থিতাবস্থা ফিরে এল। ১৯০৮-এর ৯ আগস্ট, 'নবীন তপস্বিনী' ও 'প্রফুল্ল' নাটকে অর্ধেন্দু শেখরের শেষ অভিনয়। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৮-এর ডিসেম্বর মাসে 'পাঞ্জাব গৌরব' নাটক অভিনীত হয়। কিন্তু সেখানে পাঞ্জাবী দর্শকরা নাটকটি বন্ধ করে দেয়, কারণ তাদের আবেগে আঘাত করে নাটকটি, যাইহোক, উপায়ান্তর না দেখে কোহিনূর কর্তৃপক্ষ নাটকটির নাম পাল্টে 'বীরপূজা' নামে অভিনয় করে। কোহিনূরের একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় হিসেবে 'বীরপূজা'র উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে অভিনয়ে মন্মথ পাল হাস্যরসের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। রঙ্গনাথের অভিনয়ও ভালো হয়েছিল। এই বছরে হরনাথ বসুর 'ময়ূর সিংহাসন' নাটকটিও অভিনীত হয়।

১৯০৯-এর ৭ জুলাই পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার ছিলেন। তারপর তিনিও তারাসুন্দরী কোহিনূর ত্যাগ করেন। ১৯১০-এর জানুয়ারিতে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ', ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূতের বিয়ে' গিরিশের 'চন্ড', 'রাজা অশোক' প্রভৃতি অভিনীত হয়। ১৯১১-তে অভিনীত হয় 'শখের জলপান', 'মধুর মিলন', 'গ্রহের ফের', 'জেনোরিয়া', 'প্রাণের টান' প্রভৃতি। তবে সেরকম সাফল্য আসেনি।

১৯২২-তে কোহিনূরের অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছিল না। তবুও তারা চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল 'বলিদান', 'পান্ডব গৌরব', 'শঙ্করাচার্য', 'খাঁজাহান', 'মোহিনীমায়া' প্রভৃতি। এই নাটকগুলির অভিনয়েও কোহিনূরের অবস্থা ভালো হল না। বরং দেনার দায়ে খারাপ হতে থাকল। কোহিনূরের শেষ অভিনয় হল ১৯১২-এর ২১ জুলাই 'বিশ্বামিত্র' ও 'পলিন'। এরপর ২৭ জুলাই কোহিনূর দেনার দায়ে নীলামে উঠলে মনোমোহন পাঁড়ে তা কিনে নেন। মনোমোহন তখন মিনার্ভা থিয়েটারেরও

মালিক। তিনি তখন মিনার্ভার দলবল নিয়ে এখানে 'মিনার্ভা' নাম দিয়ে অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর ১৯১৫-এর ১ সেপ্টেম্বর কোহিনূর নাম পাল্টে রাখেন মনোমোহন থিয়েটার।

কোহিনূর থিয়েটার সর্বমোট পাঁচ বৎসর চলেছিল। সে যুগের সমস্ত খ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখানে অভিনয় করেছেন। এখানকার বেশ কিছু নাটক সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু থিয়েটার পরিচালনার ত্রুটি মালিকের পারিবারিক কলহ প্রভৃতির কারণে কোহিনূর বন্ধ হয়ে যায়। প্রধান উদ্যোগী ও মালিক শরৎকুমার রায় থিয়েটার প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যান। ফলে তাঁর পরিকল্পিত থিয়েটারের যাত্রা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। জাঁকজমক ও প্রচুর অর্থব্যয়ে গড়ে তোলা কোহিনূর থিয়েটার পাঁচ বছরেই বন্ধ হয়ে যায়। প্রভূত সম্ভাবানার এই ক্ষণস্থায়িত্ব, থিয়েটার অনুরাগীদের বিষাদাচ্ছন্ন করে তোলে।

৩০৩.২.৫.১০ : জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথের অংশে (৫নম্বর বাড়ি) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ঠাকুর বাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালাটি তৈরী হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যপ্রযোজনা, নাট্যনির্বাচন ইত্যাদির জন্যে 'কমিটি অফ ফাইভ' নামে পাঁচ জনের কমিটি তৈরী হয়। তাতে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন নাট্যশিক্ষক।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় ইংরেজি থিয়েটারের আদলের সঙ্গে দেশীয় রীতির মিশ্রণে নাট্যোপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়। পাঁচ নম্বর ঠাকুরবাড়ির দোতলার হল ঘরে মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে অভিনয় করা হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এর কিছুদিন পরেই অভিনীত হয় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন। দুটির অভিনয়ই খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। বাড়ির অনেকেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর অভিনয়ের জন্য মনোমত নাটক না পেয়ে উদ্যোক্তারা অভিনয় উপযোগী এবং লোকশিক্ষার উপযুক্ত নাটক অনুসন্ধান করতে থাকেন। অবশেষে, বহুবিবাহ, হিন্দুমহিলার দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামস্থ জমিদারের অত্যাচার বিষয়ে নাটকের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। রামনারায়ণ তখন বহুবিবাহ বিষয়ে 'নবনাটক' রচনা করে দেন। 'নবনাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি। নাটকটি এখানে নয় বার অভিনীত হয়। প্রথম বারের অভিনয়ে নাট্যকার রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই নাটকটির অভিনয় সম্পর্কে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এরপরই এখানে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশের সখের থিয়েটারের জোয়ারের সময়। ধনী বাঙালির প্রসাদ মঞ্চের সঙ্গে এই নাট্যশালার পার্থক্য হল এখানে বাড়ির সবাই যুক্ত হয়ে অভিনয় করত এবং শুধুমাত্র

আমোদ প্রমোদ বা রাজবাড়ির জৌলুষ দেখানোই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় নাট্যরীতি এবং বাংলার নিজস্ব দেশজ নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা নতুন নাট্যধারা সৃষ্টির প্রয়াস এখানে লক্ষ করা যায়।

৩০৩.২.৫.১১ : ক্লাসিক থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (১৮৭২) পরে পঁচিশ বছর কেটে গেছে। এরই মধ্যে বাংলা থিয়েটারের অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। এই সময়কার থিয়েটারগুলির খুবই দুরবস্থা চলছিল। কিছু থিয়েটার জীর্ণ হয়ে পড়েছে। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের বয়স হয়ে গেছে। ঠিক এই সময়ে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের হাতে ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল গুডফ্রাইডের দিন ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। গিরিশচন্দ্রের 'নলদময়ন্তী' নাটক দিয়ে এখানে অভিনয় শুরু হয়। আগে যেটা এমারেল্ড থিয়েটার ছিল সেই থিয়েটার বাড়ি ভাড়া নিয়ে ক্লাসিক প্রতিষ্ঠিত হল। তরুণ, দীপ্ত, বনেদীঘরের ছেলে অমরেন্দ্রনাথ বাংলা থিয়েটারে আসায় দর্শকের রুচি পাল্টাল। দর্শকরা তাকে সাদরে গ্রহণ করল। এইভাবে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের আবির্ভাব ঘটে।

১৮৯৭-তে 'নলদময়ন্তী', 'পলাশীর যুদ্ধ' (নবীন সেনের কাব্যের নাট্যরূপ), 'দক্ষযজ্ঞ', 'বিল্বমঙ্গল', 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনীত হল। এগুলি সবই ছিল গিরিশচন্দ্রের। এছাড়া 'দেবী চৌধুরানী'র নাট্যরূপ (অমর দত্ত), হরিরাজ (হ্যামলেট অবলম্বনে) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা', রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' প্রভৃতির অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর এ নাটকটি দেখতে আসেন। প্রথম বছরের সবচেয়ে সফল প্রযোজনা 'আলিবাবা'। নাচে গানে অভিনয়ে নাটকটি রেকর্ড সৃষ্টি করল।

১৮৯৮ সালে অভিনীত হয় 'পান্ডবের অজ্ঞাত বাস', 'মেঘনাদ বধ' (গিরিশের নাট্যরূপ), দক্ষযজ্ঞ, 'প্রফুল্ল'। এছাড়া অমরেন্দ্রনাথের 'দোললীলা', 'ইন্দিরা'র নাট্যরূপ (অমর দত্ত) প্রভৃতি। এই বছরের ১৯ মার্চ থেকে ক্লাসিকে প্রথম 'Cinematography' র প্রদর্শন হয়। যদিও এর আগে অন্যান্য থিয়েটারে এই 'Cinematography' চালু হয়েছিল। এই মার্চ মাসেই কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে। সেই ভয়ে সব লোক কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে বেশিরভাগ থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অমর দত্ত ক্লাসিক বন্ধ করেন নি।

১৮৯৯-এ গিরিশের পুরনো নাটকগুলি 'প্রফুল্ল', 'সীতার বনবাস', 'আবুহোসেন', 'বুদ্ধদেব চরিত', অমর দত্তের 'নির্মলা', 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদির অভিনয় হয়। এই সময় গিরিশ ক্লাসিকে নাট্যকরা হিসেবে যোগ দেন।

১৯০০-তে 'দেবী চৌধুরানী' 'আলিবাবা' ভ্রমর, 'পান্ডব গৌরব', 'দুটিপ্রাণ' প্রভৃতির অভিনয় হয়। ১৯০১-এ 'চাবুক', 'অশ্রুধারা', 'কপালকুন্ডলা', 'মৃনালিনী' চৈতন্যলীলা অভিনীত হয়। বাদবাকী সবই পুরনো নাটক। এই সময় অমর দত্তের নাটকগুলির বেশ কিছু অংশ সিনেমায় তুলে রাখলেন হীরালাল সেন।

১৯০২ সালেও সব পুরনো নাটক অভিনীত হয়। আর নতুন নাটকগুলির মধ্যে ছিল গিরিশের 'শান্তি', অমর দত্তের 'শিবাজী' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বহুৎ আচ্ছা' প্রভৃতি।

১৯০৩ এই বছরের প্রথম আটমাস সবই পুরনো নাটক অভিনীত হয়। আর শেষের দিকে ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' হারানচন্দ্রের 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসের নাট্যরূপ, গীতিনাট্য 'হিরন্ময়ী' অভিনীত হয়। এই সালে ব্রিটিশ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং তা জানাজানির ফলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তখন বাংলা থিয়েটার দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয় করে। অমর দত্তও দেশপ্রেমমূলক নাটক করলেন।

১৯০৪-এ 'বউ ঠাকুরানীর হাট' এর নাট্যরূপ, 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হয়। এই সময় (১৯০৩-০৪) অমর দত্ত ক্লাসিকের সঙ্গে সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারের দায়িত্ব (লিজ) নেন এবং গিরিশের নতুন নাটক 'সৎনাম' অভিনীত হলে মুসলমান দর্শকদের আপত্তিতে তা বন্ধ করে দিতে হয়। এরপর অমর দত্ত মিনার্ভার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এরপর নভেম্বর মাসে ক্লাসিকে 'চোখের বালি'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়। নাটকটি জমে নি।

১৯০৫-এ শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে 'কোনোটা কে' এই নাম দিয়ে নাটক অভিনয় করলেন। ক্লাসিকে মালিক হিসেবে অমর দত্তের শেষ অভিনয় 'হরিরাজ', 'সোনার স্বপন', 'শ্রীকৃষ্ণ' ১৯৯০৫-এর ২ এপ্রিল। এরপর অমর দত্ত 'গ্র্যান্ড থিয়েটার' খুললেন। তবে সেখানে তিনি মালিক না হয়ে পরিচালক হলেন। সেটাও ভালো চলল না। এই সময় ক্লাসিকের মালিক অতুল রায় অমরেন্দ্রনাথকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে ম্যানেজার করে নিয়ে এলেন। সেখানে মনমোহনের 'পৃথ্বিরাজ', অমর দত্তের 'প্রণয় বা বিষ', 'এস যুবরাজ' অভিনীত হল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রচন্ড উন্মাদনা দেখা যায়। ফলে বেশির ভাগ থিয়েটার দেশপ্রেমমূলক নাটকের অভিনয় করল। অমর দত্ত সেই সময় দুই রকম নাটক লিখলেন — দেশাত্মবোধক নাটক (যেমন—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, হল কি ইত্যাদি) এবং ব্রিটিশ তোষণের নাটক (যেমন— এস যুবরাজ)।

১৯০৬ এ গিরিশের 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনীত হয়। এটিও সফল হয়নি। অমর দত্ত এবার অসুস্থ হয়ে ক্লাসিকের চাকরীও ছেড়ে দেন। এর কিছুদিনের মধ্যে ক্লাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই থিয়েটার বাড়িতে অন্যলোকেরা এসে খুললেন 'কোহিনূর থিয়েটার।'

ক্লাসিক থিয়েটারে অমর দত্তের কর্ম-কুশলতা :

১. ক্লাসিকে অমর দত্ত পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, প্রহসন, নক্সা, পঞ্চরং, গীতিনাট্য, অপেরা — সব ধরনের নাটকের অভিনয় করেছেন।

২. এই সময় তিনি থিয়েটারের প্রয়োজনে নাট্যকার হয়ে যান। আবার অমর দত্তই সে যুগে রবীন্দ্রনাটক করার সাহস দেখান।

৩. অমর দত্তই প্রথম সচেতন ভাবে দৃশ্যপটের ব্যবহার তুলে দেন এবং প্রপ্‌স ও সেটের ব্যবহার করেন। অর্থাৎ বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জার দিকে তিনি নজর দেন।

৪. ১৮৯৯ সালে প্রথম কলকাতার বৈদ্যুতিক আলো আসে। অমর দত্ত থিয়েটারে বিদ্যুৎ আলোর সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেন।

৫. আধুনিক ব্যবসার বড় একটি দিক হল বিজ্ঞাপন। ব্যবসায়িক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের ধারাটিকেই আমূল পাল্টে দেন অমর দত্ত। হাতপাখার পেছনে, মুদিখানার ঠোঙার ওপরে তাঁর থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দিলেন।

৬. তিনিই প্রথম নাট্যপত্রিকা বের করলেন এবং একটি নয় তিনটি। এই তিনটি পত্রিকাতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের লেখা, দেশ-বিদেশের থিয়েটারের ও নট-নটীদের খবর বের হত ছবি সহ। পত্রিকাগুলি ছিল — 'সৌরভ', 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির'।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ভালো অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, নাট্যপরিচালক এবং শেষে নাট্যকারও হন। তিনি সাধারণ মানের নাটক লিখলেও তা জনপ্রিয় হয়েছে। তিনি জানতেন জনগণকে থিয়েটারমুখী করতে। তাই শুধু নাটক নয়, নাটকের বাইরেও তিনি নানা কাজ করতেন, যা কিনা থিয়েটারের প্রয়োজনে তিনি করতেন। এতবড় প্রতিভা শেষ পর্যন্ত অমিতব্যয়ী হওয়ার ফলে নষ্ট হয়ে যায়। অমরেন্দ্র দত্ত শেষ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যায়।

৩০৩.২.৫.১২ : মনোমোহন থিয়েটার

আমরা আগেই দেখেছি, যে এমারেল্ড থিয়েটার বাড়িতে কোহিনূর থিয়েটার চলছিল। মনমোহন এই থিয়েটারটি কিনে নেয়। সেখানে তিনি মনোমোহন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কোহিনূর নামেই চালু করেন। পরে সেখানে মিনার্ভা মঞ্চের লোকজন নিয়ে গিয়ে মিনার্ভার নামে অভিনয় শুরু করেন। মনোমোহনের উদ্বোধন হল ১৯১৫ এর ১০ সেপ্টেম্বর, গিরিশের 'কালাপাহাড়' এবং সুরেশচন্দ্র রায়ের 'রূপোর ফাঁদ' নাটক দিয়ে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তারাসুন্দরী, দানীবাবু, প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', 'পলিন' ও অতুল মিত্রের 'শির-ফরহাদ' নাটক দিয়ে এর যাত্রা শুরু হল। ১ সেপ্টেম্বর থেকে নাম রাখা হল মনোমোহন থিয়েটার। সেদিন 'ভীষ্ম', 'ধ্রুবচরিত', 'জন্মাষ্টমী', 'নন্দবিদায়', চতুরালী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। এরপর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাদশাজাদী', নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বাপ্পারাও', দাশরথি মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠহার', হরিনাথ বাবুর 'কবীর', সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল পাঠান', গিরিশের 'চন্ড', বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' এর নাট্যরূপ, ১৯১৭ পর্যন্ত খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

১৯১৮-তে এসে 'দেবলা দেবী' খুবই সাফল্য পেল। ১৯১৯-এ 'পারদর্শী', ১৯২০-তে 'হিন্দুবীর' উল্লেখযোগ্য অভিনয়। ১৯২৪ পর্যন্ত এইভাবে মনোমোহন থিয়েটার তার অভিনয় চালিয়ে যায়। এরপর মনোমোহন অসুস্থ হয়ে পড়লে শেষের দিকে এই থিয়েটারের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। শেষের দিকে শিশির ভাদুড়ী এই থিয়েটার লীজ নিয়ে সেখানে খোলেন 'নাট্যমন্দির', ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে। মনোমোহন থিয়েটারের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব প্রবোধচন্দ্র গুহের আমল। ১৯২৮-এর আগস্ট মাস থেকে প্রবোধচন্দ্র গুহ এককভাবে মনোমোহনের পরিচালনার দায়িত্ব নেন। তাঁর নেতৃত্বে 'পথের শেষে', 'গৈরিক পতাকা', 'কারাগার' প্রভৃতি

নাটকগুলির অভিনয় হয়। মন্মথ রায়ের ‘মহুয়া’ এখানে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জাহাঙ্গীর’ এখানে প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তির উপায়’ এখানে অভিনীত হয়।

৩০৩.২.৫.১৩ : শ্রীরঙ্গম থিয়েটার

প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যনিকেতন (১৬ মার্চ, ১৯৩১)। এটি চলে ১৯৪১-এর অক্টোবর পর্যন্ত। এবার দায়িত্ব নেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। তিনি নাট্যনিকেতনের নাম পাল্টে রাখেন শ্রীরঙ্গম। শিশির কুমারের পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম খ্যাতির তুঙ্গে ওঠে। শ্রীরঙ্গম মঞ্চের উদ্বোধন হল ১৯৪১-এর ২৮ নভেম্বর তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘জীবনরঙ্গ’ নাটক দিয়ে। শিশির কুমার অভিনয় করলেন নাট্যাচার্য অমরেশের ভূমিকায়। শ্রীরঙ্গ ম মঞ্চে অভিনয় তালিকা এই রকম ‘জীবনরঙ্গ’, ‘উড়োচিঠি’, ‘দেশবন্ধু’, ‘মাইকেল’, ‘বিপ্রদাস’, ‘তাইতো’, ‘বন্দনার বিয়ে’, ‘দু:খীর ইমান’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘সিরাজদৌল্লা’ (গিরিশ ঘোষের) ‘পরিচয়’, ‘ষোড়শী’, ‘তখত-এ-তাউস, ‘আলমগীর’ ‘প্রশ্ন’ (১৯৫৩)।

এরপরে প্রায় তিন বছর শ্রীরঙ্গমে নতুন কোনো নাটকের অভিনয় করেনি। পুরনো নাটকগুলিই এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করা হয়। শেষের দিকে শিশির কুমার এখানে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন না, পরিচালনা করতেন। তবে আলমগীরে আলমগীর এবং রাজসিংহ ও সাজাহান নাটকে সাজাহান ও ঔরঙ্গজেব এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৫৬ এর গোড়াতে নতুন নাটক ধরলেন — ‘মিশরকুমারী’। তারপর আবার পুরনো নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘প্রফুল্ল’।

শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ চরিত্রে, ১৯৫৬-এর ২৪ জানুয়ারি। বাড়িভাড়ার দায়ে মঞ্চ ছেড়ে দিতে হল। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৫৬ ঐ বাড়িতে তৈরী হল বিশ্বরূপা। শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমার ছিলেন একটানা চৌদ্দ বৎসর। এই সময়ে তিনি চৌদ্দটি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এখানে।

৩০৩.২.৫.১৪ : বিশ্বরূপা থিয়েটার

প্রবোধচন্দ্র গুহ প্রতিষ্ঠিত নাট্য নিকেতনের দায়িত্ব নিয়ে শিশির কুমার ভাদুড়ি এর নাম দেন শ্রীরঙ্গম। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালিয়ে আদালতের নির্দেশে এর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তখন এর দায়িত্ব পায় মেসার্স সরকার ব্রাদার্স অ্যান্ড প্রপার্টিস (প্রাইভেট) লিমিটেড (২৮-১-৫৬)। নাট্য আগ্রহী নটবর সরকারের কনিষ্ঠপুত্র রাসবিহারী সরকার কোম্পানীর তরফে উদ্যোগী হয়ে নাট্যমঞ্চ চালাবার দায়িত্ব নিলেন। নানাভাবে সংস্কার করে শ্রীরঙ্গমের ভোল পালটে দেন। নতুন নামকরণ করা হল বিশ্বরূপা। প্রথম নাটক অভিনীত হল তারাশঙ্করের সদ্য প্রকাশিত জনপ্রিয় উপন্যাস ‘আরোগ্য নিকেতন’ এর নাট্যরূপের একই নামে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন। তবে এই থিয়েটারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২২ জুলাই।

এখানে অভিনীত দ্বিতীয় নাটক ‘ক্ষুধা’ নাটকটি অসামান্য জনপ্রিয়তা পায়। একটানা ৫৭৩ রাত্রি চলে ‘ক্ষুধা’ বাংলা মঞ্চাভিনয়ের এতোদিনের সব রেকর্ড ভেঙে দিল। নাট্যাভিনয়ের পাশাপাশি এই থিয়েটার বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়ে থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এছাড়া গিরিশ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘে ‘গিরিশ থিয়েটার’

নামে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমেই সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, ১৯৬০ এর ৩১ জুলাই।

এরপর পুরনো নাটকের আধুনিক মঞ্চায়নের চেষ্টা করা হয় বিশ্বরূপায়। এই প্রকল্পের প্রথম নাটক অপরেশ চন্দ্রের 'কর্ণার্জুন'। এরপর 'সেতু'। 'সেতু'ও অসামান্য সাফল্য পায়। ১০৮২ রাত্রি একটানা অভিনয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করে নাটকটির অভিনয় বন্ধ করা হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। 'সেতু' নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নায়িকা অসীমার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয়। এরপর 'লগ্ন' নাটক। তারপর 'রাধা', 'হাসি' প্রভৃতি। পরবর্তীতে হল 'জাগো'। নাটকটি ব্যর্থ হল। এই ব্যর্থতার কারণ হল তখন বিধায়ক ভট্টাচার্য নেই, নেই তাপস সেন। সব একা রাসবিহারী। ফলেই সার্বিক ব্যর্থতা। এবারে বিশ্বরূপায় নিয়ে আসা হল তরুণ রায়কে। প্রতাপ চন্দ্রের উপন্যাস 'জব চার্ণকের বিবি' অবলম্বনে নাট্যরূপ দিলেন তরুন রায়। নাম 'রঙ্গিনী'। প্রথম অভিনয় হলে ১৯৬৭-এর ২০ মে এই নাটকটিও ব্যর্থ হল। এরপর 'এক পেয়ালা কফি'। অল্প কিছুদিন চলার পর নাকটটি বন্ধ হয়ে গেল। এবার নামানো হল আগন্তুক। এই নাটকটি খুব সাফল্য লাভ করে।

'আগন্তুক' নাটক চলাকালীন থিয়েটারের সত্ত্বাধিকরণ সরকার পরিবারে মৃত্যুভাঙ্গ পৃথকগন্ন ইত্যাদি কারণে বিশ্বরূপাতেও তার প্রভাব পড়ল। ফলে ১৯৬৮-তে রাসবিহারী সরকার এককসত্ত্ব গ্রহণ করেন। এর আগে, যেমন সরকার পরিবারের তরফে দক্ষিণেশ্বর সরকার কিছুদিন বিশ্বরূপা থিয়েটার চালিয়েছিলেন। তাঁরই কর্তৃত্বে ১৯৬৫-র ১৪ এপ্রিল হয়েছিল 'হাসি' নাটক। আর রাসবিহারী সরকারের একক দায়িত্বে প্রযোজিত হল 'ঘর' নাটক। অভিনয় করলেন কালী ব্যানার্জী, অনুপ কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখেরা। নাটকটি তেমন খ্যাতিলাভ করেনি। এরপর 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'কোথায় পাবো তারে' প্রভৃতি।

'চৌরঙ্গী' নাটক অভিনয়ে আবার বিশ্বরূপায় সাফল্য দেখা গেল। ১৯৭১-এর ২৫ সেপ্টেম্বর শঙ্করের লেখা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ের মাধ্যমে এবারে রাসবিহারীর প্রচেষ্টা সার্থক হল। এই নাটকে ক্যাবাকারে নৃত্যের প্রয়োগ দেখা গেল। এরপর 'আসামী হাজির' নাটক। এই নাটকে ক্যাবাকারে নাচের সার্থক প্রয়োগ দেখা গেল। এটিও প্রচন্ড সফল হল। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রাসবিহারী করলেন 'পরস্ত্রী', তারপর 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'জনগণমন', 'সাহেব বিবি গেলাম', 'সব ঠিক হ্যায়' এগুলি সবই বিমল মিত্রের লেখা। তবে এগুলি জনসমর্থন পায়নি। এই সময় বিমল মিত্র থেকে সরে এসে রাসবিহারী করলেন শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ। এটিও ব্যর্থ হল। এবার দ্বারস্থ হলেন আশাপূর্ণা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'সুবর্ণলতা' কাছে। এটিও অসফল হল।

এরপর রাসবিহারী থিয়েটার থেকে সরে এসে তাদের পারিবারিক প্রোমোটারি ব্যবসা শুরু করেন। বিশ্বরূপার লাগোয়া ফাঁকা জমিতে তিনি ফ্ল্যাটবাড়ি করে বিক্রির বন্দোবস্ত করে অগ্রিম টাকাও নেন। কিন্তু থিয়েটারের সত্ত্ব তার হলেও জমির মালিক তিনি নন। এরপর বিভিন্ন মামলায় জেরবার রাসবিহারী থিয়েটার করা ছেড়ে দিলেন। ১৯৮০-র মাঝামাঝি শুক্লা সেনগুপ্ত নামে একজন বিশ্বরূপার লীজ নেন রাসবিহারীর কাছ থেকে। শুক্লা সেনগুপ্ত বিশ্বরূপায় সুস্থ রুচির নাটক প্রযোজনা শুরু করলেন। অভিনীত হল স্বরলিপি, ফেরা, স্বীকারোক্তি, নীলকন্ঠ। এগুলি লোকসমাদর পেয়েছিল। পরের প্রযোজনা ঘন্টাফটক, ভালো খারাপ মেয়ে, রমাপ্রসাদ বণিককে এনে তিনি নাটক দুটির প্রযোজনা করান।

কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এইভাবে পেশাদার থিয়েটার চালাতে গিয়ে শুক্লা ক্রমে ঋণভারে জড়িয়ে পড়লেন। শেষপর্যন্ত তিনি আত্মহত্যা করলেন। বিশ্বরূপাও রক্ষা পেল না। এরপর থেকে বিশ্বরূপা বন্ধই হয়ে পড়েছিল। ২০০১-এর ১৪ নভেম্বর, কালীপূজোর দিনে রাত দুটোর সময় বিশ্বরূপার মঞ্চে আগুন লাগে।

এবার আমরা দেখব দোষে গুণে মিশ্রিত বিশ্বরূপা বাংলা পেশাদার থিয়েটারের ইতিহাস কেন স্মরণীয় —

১. অনেক খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিকদের নাট্যরূপ এখানে রীতিমতো অভিনীত হয়েছে।

২. প্রযোজনার আঙ্গিকগত দিক দিয়ে নানা অভিনব প্রয়াস এখানে করা হয়েছিল। যেমন থিয়েটার স্কোপ, স্পিডোস্কোপ প্রভৃতি অভিনব নাট্যোপস্থাপনার প্রয়োগকৌশল এখানে ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩. চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের পাশাপাশি গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরাও এখানে অভিনয় করেছে।

৪. নাট্য উন্নয়নের প্রকল্পে বিশ্বরূপা একটি লাইব্রেরী চালু করেছিল। সেখানে নাট্যবিষয়ক এদেশ বিদেশের গ্রন্থাদি রাখা হয়েছিল এবং উৎসাহী পাঠক-গবেষকদের সেখানে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্বরূপার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

৩০৩.২.৫.১৫ : রঙমহল থিয়েটার

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রমোহন রায় (রবি রায়) ও সতু সেনের উদ্যোগে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে 'রঙমহল' থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত অন্ধগায়ক ও অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে (কানাকেষ্ট) ও রবি রায় এর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। অন্যান্য প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে এই থিয়েটারে শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নিয়ে আসা হয় প্রচুর টাকা দিয়ে। থিয়েটারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৩১-এর ১ মে, আর ৮ আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক দিয়ে রঙমহলের যাত্রা শুরু হয়।

এরপর ১৯৩২-এর ১৭ জানুয়ারি অভিনীত হয় 'বিজয়িনী', ২৫ মার্চ 'রঙের খেলা'। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'বনের পাখী, 'শাদী কি শূল' প্রভৃতি নাটকও এখানে অভিনীত হল। 'বনের পাখী' নাটকটি খুব জমেছিল। ইতিমধ্যেই শিশিরকুমার ভাদুড়ি 'রঙমহল' ছেড়ে চলে গেছেন। আর্থিক কারণে রঙমহলের কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হয়। ১৯৩৩ থেকে যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিক এর দায়িত্ব নেন। এরা প্রযোজনা করল 'দেবদাসী'। এরপর সতু সেন নতুন 'ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ' তৈরী করেন। বাংলা তথা ভারতে রঙমহল থিয়েটারই প্রথম এই ধরনের মঞ্চ প্রবর্তন করে। এই নতুন মঞ্চে প্রথম অভিনীত হল অনুরূপা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'মহানিশা' (১৯৩৩-এর ১৫ এপ্রিল)। নাটকটি সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা পায়। এরই সঙ্গে রঙমহলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ডিসেম্বর মাসে অভিনীত হল মন্মথ রায়ের 'অশোক,' এরপর 'বাংলার মেয়ে' দুটি নাটকই ভালো সাফল্যলাভ করে।

এদিকে ১৯৩৫-এ শিশির মল্লিক রঙমহলের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। দায়িত্ব নেন অমর ঘোষ। তাঁর নেতৃত্বে অভিনীত হয় চরিত্রহীন। নাট্যরূপ দেন যোগেশ চৌধুরী। নাটকটি একটানা দীর্ঘদিন চলে রঙমহল এর গৌরব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। এরপর রঙমহল একটু খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়। কারণ পর পর বেশ কিছু নাটক ব্যর্থ হয়। তাই থিয়েটার বন্ধ রাখতে হয়। পরে তা সামলে উঠে আবার নতুন করে অভিনয় শুরু করে রঙমহল। এই সময় নাট্যপরিচালক হিসেবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং নতুন নাট্যকার হিসেবে বিধায়ক ভট্টাচার্য এখানে যোগ

দিলেন। নতুন উদ্যোগে এবার অভিনয় শুরু হল ১৯৩৭ এর মাঝামাঝি। প্রথমে নামানো হল 'অভিষেক', 'সর্বহারা' প্রভৃতি নাটক। এরপর শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' নাটকটি ভালো চলল। ১৯৩৭-৩৮ এ এখানে যোগ দেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনীত হল 'তটিনীর বিচার'। এটিও সফল হল। এই সময় রঙমহলের আর্থিক অনটন অনেকটা কেটে গেল।

এবার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯)। এই সময় সব থিয়েটারই প্রায় বন্ধ থাকে। জুলাই মাস থেকে আবার অভিনয় শুরু হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের লেখা নাটক 'বিশ বছর আগে' দিয়ে। পরপর অভিনীত হতে থাকে 'ঘূর্ণি', 'মালারায়', 'মেঘমুক্তি' প্রভৃতি। শেষেরটি ভালোই চলেছিল। ১৯৮০ এর ডিসেম্বর হল 'রত্নদীপ', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি। সে যুগে রত্নদীপ নাটকটি খুবই সাফল্য পায়।

১৯৪২-এ রঙমহলের 'লেসী' হন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সে সময়ের সেরা শিল্পীদের জড়ো করেন এখানে। অভিনীত হল — 'মাকড়শার জাল', 'ডা. মিস কুমুদ', 'আগামীকাল', 'আঁধার শেষে', 'রক্তের ডাক' ইত্যাদি। এই সময় প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক শম্ভু মিত্র যোগ দেন এখানে। অভিনীত হয় 'গোরা'। এরপর প্রায় পাঁচ বছর রঙমহল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরনো নাটক অভিনয় করে এবং নতুন বলতে অয়স্কান্ত বক্সীর অধিকার, তারাশঙ্করের বিংশ শতাব্দী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রাজপথ প্রভৃতি। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বরাত্রে অভিনীত হল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নতুন নাটক বাংলার প্রতাপ। এটি খুবই সাপল্য পেল। ১৯৪৮-এ অভিনীত হল দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, শচীন সেনগুপ্তের 'আবু হোসেন'। এরপর শরৎচন্দ্র ঘোষ দেউলিয়া হয়ে পড়েন। তখন ১৯৪৯ থেকে দায়িত্ব নেন সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। এই সময়ে অভিনীত হয় শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'। পরপর হল পন্ডিত মশাই, নিষ্কৃতি। নিষ্কৃতির অভিনয় সাফল্য পেল ও প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হল। তারপর 'চাঁদবিবি', 'জীজাবাঈ', 'রাণাপ্রতাপ', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিষবহ্নি', 'খুনীর বাড়ি' প্রভৃতি নাটকগুলি ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ এর মধ্যে অভিনীত হয়। এর কোনোটিই তেমন চলেনি। এরপরে রঙমহল বন্ধ হয়ে যায়। মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। দায়িত্ব নেন জীতেন বোস ও ভিটল ভাই মানসাটা। পরিচালক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। কিন্তু কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে নানা কারণে মতান্তর দেখা দেওয়ায় দায়িত্ব নেন শম্ভু মিত্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত বহুরূপীর অভিনেতৃবর্গ রঙমহল ছেড়ে দেন। এই সময় কোনোক্রমে 'দূরভাষিনী' মঞ্চস্থ হয়। এরপর নামানো হয় 'উল্কা'।

১৯৫৪-এর ২ অক্টোবর 'উল্কা' নাটক রঙমহলে প্রথম অভিনীত হল। নাটকটি বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা পায়। ৬০০ রজনী অভিনয় হয় উল্কার। এই উল্কাই আর্থিক সাফল্যের মুখ দেখায় কর্তৃপক্ষকে। এরপর অভিনীত হল 'শেষলগ্ন'। এটিও ভালো চলল। ১৯৫৭-তে মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার ছেড়ে রঙমহলে যোগ দেন। তিনি এসে নিজের নাটক 'শতবর্ষ আগে' অভিনয় করেন। তারপর তারাশঙ্করের 'কবি'। 'উল্কা'র মতো 'কবি' ও অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে দীর্ঘরাত্রি অভিনীত হল।

এরপর 'দুইপুরুষ', 'মায়ামৃগ', 'সাহেব বিবি গেলাম', 'একমুঠো আকাশ', 'একপেয়াল কফি', 'অনর্থ', 'চক্র' প্রভৃতি নাটকগুলি ১৯৫৭ থেকে ১৯৬১-এর মধ্যে অভিনীত হয়। ১৯৬২-তে এসে রঙমহলের সংকট ঘনিয়ে আসে। রঙমহলের দুই মালিক জীতেন বোস ও ভিটল ভাই মানসাটা দুটি সিনেমা হলের মালিক ছিলেন। তারা চাইলেন এখানে সিনেমা হল বানাতে। কিন্তু নাট্যকর্মীদের অবরোধের ফলে এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান রায়ের উদ্যোগে রঙমহল পরিলাচনার দায়িত্ব পান কলাকুশলী ও কর্মীরা। অভিনেত্রী সরযূবালা এবং অভিনেতা জহর রায় সমবায় ভিত্তিক (Co-operative) থিয়েটারের তরফে পরিচালনার দায়িত্ব নেন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এবার নতুন উদ্যমে অভিনয় শুরু হল। সমবায় প্রথায় প্রথম অভিনয় 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৬২-এর, ৩ ফেব্রুয়ারি)। নাটকটি এর আগেই এখানে সাফল্য পেয়েছিল; এবারও পেল। অভিনয় করলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়ের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সমবায় প্রথায় পরিচালিত রঙমহল থিয়েটারে পরপর সফলভাবে নাটক অভিনীত হতে থাকল এবং প্রায় সব নাটকই দর্শক আনুকূল্য লাভে সার্থক হল। এই সময়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'প্রতিমা', 'ছায়ানায়িকা', 'নহবত', 'বাবাবদল', 'আলিবাবা', 'অনন্যা' প্রভৃতি। এই 'অনন্যা' নাটক থেকে কুরুচিপূর্ণ ক্যাবারে নৃত্যের চল শুরু হয় থিয়েটারে। এই সময় থিয়েটারের ঐতিহ্য নষ্ট হতে থাকে। রঙমহলও অনেকটা স্তিমিত হয়ে যায়। সালটা ১৯৭০ এর মাঝামাঝি। সমবায় প্রথা ভেঙে পড়ে। অনেকে চলেও যান। এরপর ১৯৭৭-এ জহর রায়ের মৃত্যু হলে সমবায় প্রথার বিলুপ্তি ঘটে।

এরপর রঙমহলের কর্মাধ্যক্ষ হলেন শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজয় ভদ্র। রঙমহলের দুর্দিনে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৫-এর কিছুদিন 'থানা থেকে আসছি' অভিনয় করেন। তাতে শেষ রক্ষা হয় না। ক্যাবারে নৃত্যের অশ্লীলতার মধ্যে দিয়ে রঙমহলের সুনামের ঐতিহ্য বিঘ্নিত হয়। এর বিরুদ্ধে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নামানো হয় 'অমরকন্টক' (১৯৮০তে)। এতে অভুতপূর্ব সাফল্য আসে। এরমধ্যে অনুপ কুমারের পরিচালনায় 'হঠাৎ নবাব' নাটক অভিনীত হয়। এরপর কয়েক বছর ধরে চলে 'বিবর', 'স্বীকারোক্তি', 'নীলকণ্ঠ' প্রভৃতি।

এরপর অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে রঙমহল এগোল । কিন্তু একসময় আর চলল না। এরপর ১৯৯৯ থেকে রঙমহল বিয়েবাড়ির জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। এরপর আর কোনো অভিনয় হয়নি এখানে। অবশেষে, ২৮ আগস্ট, মঙ্গলবার। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের মাঝরাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রঙ্গালয়টি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ ঐতিহ্য লালিত রঙমহল থিয়েটারের ইতিহাস এখানেই শেষ হয়।

তাই আলোচনার উপান্তে এসে বলা যায়। একটানা পঞ্চাশ বছর নানা ভাব, বিষয় ও ভাবনার নানান নাট্যাভিনয় করে। বহু নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সমাহার ঘটিয়ে, বিভিন্ন খ্যাতিমান নাট্যপরিচালকের সাহায্য নিয়ে যে নাট্যসম্ভার বাঙালীকে উপহার দিয়েছে তারজন্য রঙমহল বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩০৩.২.৫.১৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান — শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ।

২. বাংলা নাটকের টেকনিক — শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহা, পরিবেশক — পুস্তক বিপণি।

৩. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — দর্শন চৌধুরী, পরিবেশক — পুস্তক বিপণি।

৪. বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক — পুলিন দাস।

৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৬. বাঙালী মধ্যবিত্তের থিয়েটার — ড. প্রসূন মুখোপাধ্যায়।

৭. বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

৮. পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রকাশিত নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা '৯৯।

৯. নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

১০. আজকের প্রতিভাস — বিশেষ নাট্য, মার্চ — মে, ২০০৮।

৩০৩.২.৫.১৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. অমরেন্দ্র নাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটার বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে কি অবদান রেখেছিল তা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

২. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল সে ইতিহাস ব্যক্ত করে, এই থিয়েটারের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩. প্রতাপচাঁদ জুহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটার কতটা ন্যাশনাল থিয়েটার হয়ে উঠতে পেরেছিল তা এই থিয়েটারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ব্যাখ্যা করো।

৪. স্টার, এমারেল্ড, বীণা, বেঙ্গল এই থিয়েটারগুলি সম্পর্কে আলাদা, আলাদা করে আলোচনা করো।

৫. বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী থিয়েটার কোন্‌টি? তার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৬. মিনার্ভা থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিল - আলোচনা করো।

৭. কোহিনূর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এখানকার অভিনীত নাটক সম্পর্কে আলোচনা করো। এই থিয়েটার বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কেন ব্যাখ্যা করো।

৮. বিশ্বরূপা থিয়েটার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

৯. স্বল্পস্থায়ী নাট্যশালা হিসেবে মনোমোহন থিয়েটার সম্পর্কে যা জানো লেখো।

১০. সখের নাট্যশালা হিসেবে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অবস্থান নির্ণয় করো।

————

একক - ৬

গণনাট্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

গণনাট্যর মূলে রয়েছে বস্তুতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামী জীবনবোধ, গভীর রাজনীতি সচেতনতা, বৃহত্তর অর্থে মার্ক্সীয় জীবনাদর্শ। গণ্যনাট্যের অনুসারী ভাবের নাটকের প্রচলন ইউরোপে ছিল না এমন নয়, তবে স্বতন্ত্র নাট্য প্রকরণ হিসেবে গণনাট্য বলতে আমরা যা বুঝি তার উদ্ভব ও বিকাশের মূলক্ষেত্র বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের কোলকাতা শহর। ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই কোলকাতায় 'প্রভাতি লেখক সংঘ' নামে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে তা রূপান্তরিত হয় 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ-এ'। 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র কোনো কোনো সদস্যের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৯৪৩ সালের ২৫শে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (Indian peaple's Theatre Accociation, IPTA)। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্সীয় ভাবনা অনুসারে শোষিত নির্যাতিত মানুষের মধ্যে তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে তাদের সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল। আই. পি. এর উদ্দেশ্য ভাবনার সঙ্গে ওই ইস্তাহারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে আই.পি.টি.এ একদল চিন্তাশীল, মানবদরদী মানুষের বহুদিনের চিন্তা চেতনার ফসল। নানা ক্ষেত্র থেকে রসদ সংগ্রহ করে তৈরি হয়েছে এর ভিত্তিভূমি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্যরা যখন কাজ শুরু করেন তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। অর্থাৎ এক অশান্ত পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল এদের জয়যাত্রা। তবে পরিস্থিতির চাপ রুদ্ধ করতে পারেনি এঁদের চলার পথ। নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তাঁরা অগ্রসর হন দৃঢ়পদে। আর তাঁদের নেতৃত্ব দেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য সহ নানা বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের আদর্শকে সামনে রেখে 'নবান্ন' নাটক রচনা করলে সূত্রপাত হয় বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের।

বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মী বৃন্দ 'নবান্ন' ছাড়াও আরও যেসব নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে গণনাট্যের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যথা —

ক. সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এক কথায় সর্বহারা মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনী এর মূল আশ্রয়।

খ. এখানে থাকে দুটি প্রধান শ্রেণী-বুর্জোয়াও সর্বহারা। দুই শ্রেণীর পারস্পরিক বিরোধ নাটকে চূড়ান্ত মাত্রা পায় এবং শেষপর্যন্ত সর্বহারা শ্রেণী জয়লাভ করে।

গ. সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম করে বলে গণনাট্যের মধ্যে উদ্দেশ্য মুখীনতা প্রাধান্য পায়। 'আর্ট ফর আর্ট সেক' এই নীতি গণনাট্যের শিল্পীরা মোটের উপর অস্বীকার করেছেন। আর্ট যার মেন সেক নীতির বশবর্তী হয়ে তাঁরা তাঁদের নাটকগুলিকে গড়ে তুলেছেন শোষিত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার করে।

ঘ. শোষিত মানুষের সংগ্রাম ও জয়লাভের কাহিনী নাটকের প্রধান অভিমুখ। অথচ দর্শকের বাস্তব অভিজ্ঞতা তার বিপরীত। এই অবস্থায় গণনাট্যে একটা কৃত্রিমতা আসার সম্ভাবনা থাকে। ওই সীমাবদ্ধতা থেকে নাটককে মুক্ত করার জন্য নাট্যকার সচেতন ভাবে শোষক শ্রেণীর অত্যাচার অবিচারের কিছু অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেন। যাতে দর্শকের মনে এই ভাবনা প্রাধান্য পায়, বিষয়টি বাস্তব না হলেও বাস্তবে এমনই হওয়া উচিত। অর্থাৎ যেন নাটকের ইতিবাচক পরিণতি দেখার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

ঙ. গণনাট্যের লক্ষ ব্যক্তি নয় সমষ্টি; শোষিত লাঞ্ছিত সর্বহারা সমাজের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মুক্তি। তাই এখানে নায়ক চরিত্র প্রাধান্য পায় না। জনগণই এখানে এক অর্থে নায়ক অন্য অর্থে গণনাট্য নায়কহীন।

চ. গণনাট্য দাঁড়িয়ে থাকে সর্বহারা শ্রেণীর জীবনচিত্র ও জীবনবাস্তবতার ভিত্তির উপর। এদের জীবনের নানা খুঁটিনাটি দিক খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা থাকে এখানে।

ছ. গণনাট্যের ভাষা ও সংলাপ একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। সর্বহারা শ্রেণীর জীবনছন্দের পূর্ণাঙ্গ রূপদানের চেষ্টা থাকে বলে এখানে ভাষাকে যতদূর সম্ভব মানুষের মুখের ভাষায় কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হয়। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশী, লোকজ, অশ্লীল, সবই সমান গ্রহণ যোগ্যতা পায়।

জ. গণনাট্যের অভিনয়ের নেপথ্যে কোনো বাণিজ্য বুদ্ধি কাজ করে না। তাই দর্শককে অতিরিক্ত চমৎকৃত করার জন্য মঞ্চসজ্জার বাহুল্য থাকেনা। খরচ-খরচা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করার বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়।

এই আন্তরিকতা আমরা গণনাট্যের যুগে এসে অনুসৃত হতে দেখলাম। গণনাট্যের নাট্যপরিচালক একজন করে রইলেন ঠিকই, কিন্তু অনুশীলনের সময় সকলের অভিমত পরিচালক শুনতেন এবং এখনও শোনেন। চল্লিশের দশকে গ্রুপ থিয়েটারের জন্মই হয়নি — 'জবানবন্দী', 'সংকেত', 'নবান্ন' ইত্যাদি প্রযোজনার ক্ষেত্রে গণনাট্য সমষ্টির অভিমতকে গুরুত্ব দিলেন। গণনাট্যের প্রথম পর্যায়ের রূপকার বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার প্রমুখরা। এঁরা সকলেই হয়ত নাট্যপরিচালনা করেননি, কিন্তু সকলেরই সে যোগ্যতা ছিল। গণনাট্যের ক্ষেত্রে কোনোও একক ব্যক্তিত্বের পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না একারণেই যে সংঘের দলিল মেনে ছোট বড় সব অভিনেতা-অভিনেত্রীই আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রামী নাটকে অংশ নিতেন। সাজসজ্জা, ম্যানারিজম, ভাঁড়ামি, আলোকসম্পাত ইত্যাদি গণনাট্যের পরিচালক ও শিল্পীদের বিভ্রান্ত করত না। তাই প্রতিটি প্রযোজনা নাড়া দিত। ১৩৫১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পরিচয়ে' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'নবান্ন' অভিনয়কে যে 'ভারতের মর্মবাণী' লিখেছেন তা কেবলই পরিচালকের সাফল্য-চিহ্নিত করতে নয়। তাঁর মন্তব্যই তুলে ধরছি —

'এদের এই অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্য কোথা থেকে এল ? কি এদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা ? এর একটিমাত্র জবাব জানি — এঁরা শুধু শিল্পপ্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণনাট্যসংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী অ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'-র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতের যে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারও তা অজানা নয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। অথচ এঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোনোও ইচ্ছাই গণনাট্য সংঘের নেই।'

এই বক্তব্যটির প্রতি দৃষ্টি দিলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। গণনাট্যের প্রতিটি প্রযোজনার ক্ষেত্রে সাফল্যের পিছনে শিল্পীদের আন্তরিকতাই প্রধান। পরিচালক তাই বলে উপেক্ষিত নন। তাঁরও সমাজ-রাষ্ট্র, নাট্যবিষয় এবং নাট্যাঙ্গিকের উপর যথেষ্ট দখল থাকে। তবেই তো তিনি পরিচালনার দায়িত্ব পান। কিন্তু তিনি নিজেকে জাহির করেন না। জনগণের শিল্পকে সফলরূপ দিয়ে তিনি নেপথ্যেই থাকেন, কেননা জানেন, শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই নাট্য-অভিনয়ের প্রধান শক্তি।

গণনাট্য থেকে গ্রুপ থিয়েটার ঃ নেতৃত্বের প্রশ্ন ?

এই বিষয়টি নিয়ে পঞ্চাশের দশক থেকেই বিতর্ক শুরু হয়েছে, চলছে এবং চলবে। প্রশ্ন ওঠে বহুরূপী কেন হল এবং তাতে শম্ভু মিত্র-র ভূমিকা কতখানি। প্রতিষ্ঠিত হল নান্দীকার। আবার তা থেকে সরে এসে সৃষ্টি হল থিয়েটার ওয়ার্কশপের। থিয়েটার ওয়ার্কশপ ভেঙে হল অন্য থিয়েটার।

ওদিকে নান্দীকার থেকে সরে এল গড়া দল নান্দীমুখ। লিটল থিয়েটার গ্রুপ নাম বদল করে হল পিপল্স লিটল থিয়েটার। নানা ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়েই তো পেলাম ক্যালকাটা থিয়েটার, থিয়েটার কমিউন প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটার। এঁরাই তো 'ব্যারিকেড', 'চাকভাঙা মধু', 'নরক গুলজার', 'মারীচ সংবাদ', 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'দানসাগর', 'তিন পয়সার পালা' ইত্যাদি সফল প্রযোজনা করলেন। তবে কেন গণনাট্য সংঘ ভেঙে যায় না ; গ্রুপ থিয়েটার বারবার ভাঙচুর হয় ? এক্ষেত্রে মোটামুটি সত্য হল এই — অন্তর্দ্বন্দ্ব জয় করে কেবল শিল্প ভাবনার কথাই চিন্তা করতে পারেন।

এখনকার নাট্যপরিচালকদের অনেক সুযোগ। প্রচারের সুযোগ, আধুনিক টেকনোলজির সুযোগ, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রঙ্গমঞ্চে নাটক উপস্থাপনের সুযোগ। এইসব সুযোগ কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে ক্ষতিও করে। আবার এমন গ্রুপ থিয়েটারের এমন পরিচালকও আছেন যাঁরা শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ের প্রশ্নে গণনাট্যের মতই পথে নেমে পথ নাটক করেন। তাদের নাম আলাদা করে করলাম না। তবে গণনাট্য ও অধিকাংশ গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালক ও নাট্যশিল্পীদের এই নিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

৩০৩.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গণনাট্য কাকে বলে? গণনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। গণনাট্য আন্দোলনের উদ্ভব ও তার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩। গণনাট্য ও নবনাট্যের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

একক - ৭

নবনাট্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৭.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৭.২ : লোকনাট্য

৩০৩.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৭.১ : ভূমিকা

গণনাট্য সমকালে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এর অন্তর্নিহিত একটা ক্রটির দিক ছিল। এখানে উদ্দেশ্য প্রাণতার দ্বারা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হতেন নাট্যকার। কোনো উদ্দেশ্য ভাবনার দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। তাই প্রাথমিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসার পর গণনাট্য কর্মীদের কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা উদ্দেশ্যের পদতলে শিল্পের সৌন্দর্যকে বিসর্জন দিতে আর উৎসাহ বোধ করেন না। সুতরাং শুরু হয় বিতর্ক। বিতর্ক পরিণত হয় বিরোধে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কঠোর আদর্শ থেকে সরে আসেন একদল শিল্পী। তাঁরা একই সঙ্গে একদিকে যেমন শোষিত নির্যাতিত মানুষের হয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন অন্যদিকে তেমনি শিল্পের সৌন্দর্যকে ও বজায় রাখার শপথ নেন। অর্থাৎ তাঁরা সাহিত্যকে মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে ততোদূর পর্যন্ত চালিত করেন যতদূর পর্যন্ত চালনায় সাহিত্য-সৌন্দর্যের চূড়ান্ত হানি না ঘটে। নবনাট্য গণনাট্য সংঘের ওই বিশুদ্ধ কর্মীদের নাট্য-কলমের চূড়ান্ত ফসল।

নবনাট্যের নাট্যাদর্শ নিয়ে সমকালে অনেক আলোচনা হয়েছিল। নাট্যকার কিরণ মৈত্র বলেছিলেন- "এ নাটকের বিষয়বস্তু আর এক নাটকের বিষয়বস্তু হবে না। হলেও বিচার বিশ্লেষণে, বক্তব্যে সে ভিন্ন হবে। চরিত্র সৃষ্টিতে, গঠন পদ্ধতিতে সে একক হবে। আমি তাকেই নবনাট্য বলব যা আমাকে বিস্মিত করে, চমকিত করে, সম্মোহিত করে" বোঝা যাচ্ছে গণনাট্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য নাট্যকাররা কতটা ব্যাকুল হয়েছিলেন। গতানুগতিকতা ও প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে আপোসহীন অবস্থানে দৃঢ় হয়েছিলেন তাঁরা। আর সে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁদের নাট্যসৃষ্টিতে।

নবনাট্য কর্মীদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর ‘পথিক’, ‘ছেঁড়াতার’ প্রতিনিধি স্থানীয় নবনাট্য। নাটকগুলি বিশ্লেষণ করলে নবনাট্যের নানা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে —

ক. নবনাট্য অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপোস করে না। শিল্পে সৌন্দর্য এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

খ. নাট্যকার সামাজিক মানুষ; মানুষের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা আছে। ওই দায়বদ্ধতার কারণে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেন।

গ. শোষক-শাসিতের সংগ্রাম গণনাট্যের মতো নবনাট্যেরও অন্যতম প্রধান বিষয়। কিন্তু গণনাট্যের মত এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে শোষিত শ্রেণীর জয়লাভ দেখান হয় না।

ঘ. কোনো বিশেষ চরিত্র নবনাট্যে নায়ক হয়ে উঠতে পারে, আবার জনগণেরও এখানে নায়ক হয়ে উঠতে কোনো বাধা নেই।

ঙ. কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে নবনাট্যে নাট্যকার বাস্তবতার ভিত্তির উপর দৃঢ় থাকতে পারেন। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য বাস্তবতার কোনো অতিরঞ্জিত চিত্রণ এখানে থাকে না।

চ. মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে নবনাট্যে কোনো বাধাধরা নিয়ম অনুসরণ হয় না। প্রয়োজনে নাট্যকার মঞ্চসজ্জার উপর গুরুত্ব দেন, প্রয়োজনে মঞ্চসজ্জার বিষয়টিকে উপেক্ষা করেন।

ছ. ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রে নবনাট্য গণনাট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোনো কৃত্রিম কাব্যভাষা এখানে গ্রাহ্য নয়। সমাজ বাস্তবতার গভীর থেকে তুলে আনা হয় নাট্যভাষার সূত্র।

ঝ. রস পরিণতির দিক থেকে নবনাট্যের বিষাদান্ত বা করুণ রসাত্মক হতে কোনো বাধা নেই। নাট্যঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি যদি বিষাদান্ত হয় তবে নাট্যকার স্বচ্ছন্দে বিষাদের স্রোতে পাত্রপাত্রীকে, সেই সঙ্গে দর্শককে ভাসিয়ে দিতে পারেন।

নবনাট্য, গণনাট্যসহ বর্তমান অধ্যায়ে আরও যে সব নাট্যরূপ সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা করা হল তার বাইরেও অনেক নাট্যরূপ প্রচলিত আছে। যেমন — লোকনাট্য, মাস্ক, প্যান্টোমাইম, মরালিটিপ্লে, ইন্টার লুড, মিরাক্‌ল প্লে নানা কারনে বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ অলোচনা করা গেল না। উৎসাহী পাঠকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু একটু সংকেত সূত্র তুলে ধরা হল —

৩০৩.২.৭.২ : লোকনাট্য

প্রচলিত নাট্যরূপগুলির সবই প্রায় শিষ্ট সমাজের মানুষের সৃষ্টি। লোকনাট্য শিষ্ট সমাজের মানুষের রচনা নয়। গ্রামের লোকসাধারণ তাদের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মুখে মুখে নাটকগুলি রচনা করে এবং বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নিজেরাই অভিনয় করে।

মাস্ক :

এটি একটি প্রাচীন ধারার নাটক। এখানে পাত্রপাত্রীরা মাস্ক বা মুখোস পরে অভিনয় করতো এবং নাট্যদ্বন্দ্ব অপেক্ষা গীতিধর্মিতা প্রাধান্য পেত।

প্রান্টোমাইম :

অঙ্গভঙ্গি বিশেষত মুখাভিনয় নির্ভর এক ধরনের প্রাচীন ধারার নাটক। এখানে সংলাপের গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে কম; অঙ্গভঙ্গিই ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন।

মিরাক্‌ল প্লে :

মধ্যযুগের ইউরোপে প্রচলিত সাধু, সন্ত বা এক কথায় ধর্মীয় পুরুষদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। নাটকীয়তা সৃষ্টি অপেক্ষা এখানে ধর্মকথা, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি প্রাধান্য পায়।

মরালিটি প্লে :

অনেকটা মিরাক্‌ল প্লের মতো, ধর্ম কথাশ্রিত ও নীতিশিক্ষামূলক। এর চরিত্রগুলি রূপকধর্মী। পাপ, পুণ্য, শুদ্ধ মানবতা প্রভৃতির রূপক হিসেবে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থাপন থাকে।

ইন্টারলুভ :

মিরাক্‌ল প্লে বা মরালিটি প্লের মতো ছোট মাপের নাটক। তবে কোনো ধর্মকথা এখানে থাকে না, থাকে না নীতিশিক্ষা দানের প্রবণতাও। দর্শককে নিছক আনন্দ উপহার দেওয়া এর লক্ষ।

ঠিক নাট্যরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আবার একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ও নয় এমন দুটি নাট্য বিষয় হল গ্রুপ থিয়েটার ও থার্ড থিয়েটার। এগুলি নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের দেশে অভিনয়ের যে প্রাচীনতম রীতিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাকে আজকের পরিভাষায় বলা যেতে পারে ফাস্ট থিয়েটার। ফাস্ট থিয়েটারে নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শক ও অভিনেতা--অভিনেত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকত না। অনেকটা বর্তমানে লোক সমাজে প্রচলিত লোকনাট্যের মত। লোকনাট্যের অভিনয়ে, অভিনেতা অভিনেত্রীরা দর্শকদের মধ্যে মিশে থাকে। নিজের অভিনয়ের কালে উঠে গিয়ে অভিনয়ে অংশ নেয়, অভিনয় শেষে আবার দর্শকের মধ্যে ফিরে আসে। অভিনয়ের জন্য কোনো বাধা মঞ্চ এখানে থাকে না। খোলা একটা

জায়গাকে মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফার্স্ট থিয়েটার পরে বিবর্তিত হয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার, সেখানে একটি স্থায়ী সুসজ্জিত মঞ্চ থাকে, দর্শকের বসবার জন্য থাকে নির্দিষ্ট আসন, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের থেকে সবসময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। ফার্স্ট থিয়েটারের যে সহজ অভিনয় পদ্ধতি তা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বজায় থাকেনি। একটা কৃত্রিমতা থেকেই যাচ্ছিল। ওই কৃত্রিমতা নাট্যশিল্পের পক্ষে উপযোগী নয়। বিশেষত আধুনিক যুগে নাটককে যখন খুব বেশি করে ব্যবহার করা হচ্ছে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে। এক্ষেত্রে দর্শক ও অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ অত্যন্ত জরুরী। অথচ প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারে তার বিশেষ সুযোগ নেই। স্বভাবত পরিকল্পনা হয় এক নতুন অভিনয় পদ্ধতির। এই নতুন পদ্ধতিরই অন্যনাম থার্ড থিয়েটার, থার্ড থিয়েটারে কোনো বাধা মঞ্চ থাকে না, অভিনেতা অভিনেত্রী সামান্যতম উপকরণ ব্যবহার করে অস্থায়ী কোনো মঞ্চে (মঞ্চ অবশ্য স্থায়ীও হতে পারে) দর্শকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সহযোগ বজায় রেখে অভিনয় কর্ম সম্পন্ন করে। যাত্রা বা লোকনাট্য মেকাপের বা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অঙ্গ সজ্জার ব্যাপারটি প্রাধান্য পায়। থার্ড থিয়েটার এইসব বাহুল্য বর্জিত অভিনয় রীতি। কোনো অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য এখানে মুখ্য নয়। নূন্যতম খরচ-খরচা চালানোর জন্য অভিনয় শেষে দর্শকের উদ্দেশ্যে ভিক্ষার ঝুলি বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

গ্রুপ থিয়েটার ঠিক থার্ড থিয়েটারের মত নয়। প্রসেনিয়াম থিয়েটারও থার্ড থিয়েটারের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রুপ থিয়েটারের অবস্থান। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নেপথ্যে কাজ করে বিরাট বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। লাভের প্রশ্নটি এখানে বড় কথা। গ্রুপ থিয়েটারে অর্থ উপার্জনের বিষয়টি প্রাধান্য পায় না। নাটককে যারা ভালোবাসেন, যারা অভিনয়কে নিজেদের স্বপ্ন ও সাধনার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে পারেন এমন দু-চার জন নাট্যকর্মী প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বাণিজ্যিক আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এসে গ্রুপ থিয়েটার তৈরি করেন। এঁরা নিছক দর্শক মনোরঞ্জন বা লাভালাভের কাছে নিজেদেরকে বিকিয়ে না দিয়ে নিজেদের রুচি -- বুদ্ধি -- অভিনয় ক্রিয়াকে সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা করেন। 'বহুরূপী', 'নান্দনিক' প্রভৃতি বাংলাদেশের বিখ্যাত গ্রুপ থিয়েটার।

৩০৩.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গণনাট্য ও নবনাট্য এই দুটি নাট্যধারার পরিচয় দাও।

২। নবনাট্য বলতে কি বোঝো? নবনাট্যের লক্ষণগুলির পরিচয় দাও।

—————

একক - ৮

গ্রুপ থিয়েটার

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৮.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৮.২ : গ্রুপ থিয়েটার কী?

৩০৩.২.৮.৩ : আই পি টি এ এবং নবান্ন

৩০৩.২.৮.৪ : গ্রুপের ধারণা

৩০৩.২.৮.৫ : আইপিটিএ এর পরবর্তী গোষ্ঠীসমূহ ও অন্তঃকলহ

৩০৩.২.৮.৬ : বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ

৩০৩.২.৮.৭ : বিশিষ্ট থিয়েটার ব্যক্তিত্ব

৩০৩.২.৮.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০৩.২.৮.৯ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩০৩.২.৮.১ : ভূমিকা

নাটক একটি প্রাচীন শিল্প মাধ্যম। সভ্যতার গোড়ার দিকে মানুষের সাথে নিয়তির দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে নাটকের প্রধান উপজীব্য। এরই বিবর্তিত পর্যায়ে নাটকের বিষয়বস্তুতে এসেছে পরিবর্তন। মানুষের সাথে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীর প্রধানের সাথে অন্যদের দ্বন্দ্ব, রাজার সাথে জনগণের দ্বন্দ্ব, যান্ত্রিক সভ্যতার সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব, অসত্যের সাথে সত্যের দ্বন্দ্ব, সুন্দরের সাথে অসুন্দরের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি সর্বহারার সাথে শোষকের দ্বন্দ্ব। বিষয়ের সাথে সাথে এভাবে এসেছে আঙ্গিকগত পরিবর্তন। আজ থেকে প্রায় দুই শত বছরেরও অধিক সময় পূর্বে সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাষাবিদ গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদফ প্রথম বেঙ্গল থিয়েটার (১৭৯৫)প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে বীজ রোপন করেন তা আজ মহীরুহ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্গদেশে আধুনিক ইউরোপীয় গোছের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের প্রবর্তক হিসেবে তাকে স্মরণ করতেই হবে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর, সংস্কৃত পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সক্রিয় উৎসাহে ও অনুবাদে 'উরংমঁরংব' নামক প্রহসনটির মঞ্চায়নের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা মঞ্চ নাটকের সূচনা হয়। এরই ধারাবাহিকতা হিসেবে বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গরা রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা নাট্য চর্চার ধারাকে বিকশিত করে। যদিও সে সময় মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগুলো মঞ্চায়িত হতো। মৌলিক বাংলা নাটকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রায় অর্ধশত বৎসর। ১৮৫২ সালে ‘কীর্তিবিলাস’ ও ‘ভদ্রার্জুন’ নামক দুটি নাটক রচিত হলেও ১৮৫৪ সালে রচিত রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুল সর্বস্ব’কেই

বাংলার সুধীজনরা প্রথম সার্থক মৌলিক নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন। বাংলা নাটক সূচনা থেকেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই জীবন ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিকে বুকে ধারণ করেছে তারই পথ ধরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইতিহাস আশ্রিত ট্রাজেডি ও প্রহসন এবং দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন সাড়া জাগিয়েছিল। তারপর মনমোহন বসু, মীর মোশারফ হোসে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ আরো অনেকের নাটক সমকালের মঞ্চকে সচল রেখেছিল।

৩০৩.২.৮.২ : গ্রুপ থিয়েটার কী ?

গ্রুপ থিয়েটার বা সংঘ নাট্যচর্চা নাটকের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করে এবং লাভ করে সামাজিক প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ফলে নাটক হয়ে ওঠে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাগরণের মাধ্যম।

গ্রুপ থিয়েটারের উদ্ভব মূলত বিদেশে। ১৯৩১ সালে নাটকই নিবেদিত তিন মার্কিন তরুণ হ্যারল্ড ক্লারম্যান, চেরিল ক্রাফোর্ড এবং লী স্ট্রসবার্গ আমেরিকান নাটকের গতানুগতিক চেহারা বদলে দেবার সংকল্প নিয়ে গঠন করেন 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে একটি নাট্যদল। তখনকার সময়ে সস্তা জনপ্রিয় বিনোদনসর্বস্ব নাটকের বিপরীতে জীবনঘনিষ্ঠ এবং সমসাময়িক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায় এমন নাটক প্রযোজনা করতে উদ্যোগী হলেন এই নতুন দলের ২৮ জন অভিনয়শিল্পী। তাঁরা এমন মার্কিন নাটক অভিনয় করতে চাইলেন যা সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

অভিনয়ে গ্রুপ থিয়েটার গোষ্ঠীর আদর্শ ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব স্তানিস্লাভস্কি। তাঁর মেথড অনুসরণ করে এরা নাট্যচর্চা শুরু করেন। দলটির ১০ বছরের জীবনে বাইশটি নাটক সাফল্যের সাথে প্রযোজিত হয় এবং গ্রুপ থিয়েটার সত্যিকার অর্থেই মার্কিন নাট্যচর্চায় নতুন ধারার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে ১৯৩২ সালে গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি ছোট্ট নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। সাত বছর পর তিনটি অপেশাদার নাট্যদল গ্রুপ থিয়েটার নামই এখানে তাদের নিজ নিজ প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতে শুরু করে। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে ১৯৭৮ সালে নাট্যশালাটি নতুন করে উদ্বোধন করা হয় প্রধানত অপেশাদার নাট্যদলগুলোর প্রযোজনার জন্য।

লণ্ডনে ১৯৩৩ সালে গ্রুপ থিয়েটার নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় আধুনিক, অবাণিজ্যিক এবং নিরীক্ষামূলক নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্য নিয়ে। বেশিরভাগ নাটকই নির্দেশনা করতেন রুপার্ট ডুন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল নিরাভরণ মঞ্চে খুব কম দৃশ্যসজ্জা ও প্রপ্স ব্যবহার করে নাটক প্রযোজনা করা। ১৯৫৩ সালে দলটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবান্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে।

৩০৩.২.৮.৩ : আই পি টি এ এবং নবান্ন

১৯৪৪ সালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সংঘের নবান্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে বাংলা থিয়েটার এক নতুন পথে যাত্রা করে। নবান্ন অনুষ্ঠানপত্রীতে লেখা হয়েছিল:

"বাংলার নাট্যশালাগুলো দর্শকদের সত্যিকার চাহিদা মেটাতে পাচ্ছে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘা খেয়ে অসন্তোষে বিষিয়ে উঠেছে মানুষের মন, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েই গণনাট্য আন্দোলন নতুন সত্তার সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠতে প্রয়াস পেলো। সেদিক দিয়ে এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক। এই সংঘের কাজ হলো যেমনি একদিকে স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তোলা তেমনি অন্যদিকে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা জনগণের ব্যপ্তির মধ্যে টেনে এনে। এই গণসংযোগের সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতি নতুনভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। মানুষকে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে বলীয়ান করে তুলতে সংস্কৃতির দান অনস্বীকার্য। তাই এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে।'

'নবান্ন' নাটকটি নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লেখেন। শম্ভু মিত্রের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত করেন। তারা দুজনই বামপন্থী থিয়েটার শিল্পী সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম নাটক 'আগুন' বিজন ভট্টাচার্যের রচনা। এই নাটকট১৯৪৩ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে লেখা নাটক 'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন' অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলিতে তিনি প্রধান অভিনেতা এবং নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় ও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল। এরপর ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যদলের প্রযোজনায় কুমার রায়ের পরিচালনায় নবান্ন মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বিষয় পঞ্চাশের মন্বন্তর (ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশের ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ)। গণনাট্য সংঘ এই নাটকটিকে ভারতের নানা জায়গায় তাদের 'ভয়েস অফ বেঙ্গল' উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মঞ্চস্থ করে দুর্ভিক্ষের ত্রাণে লক্ষাধিক টাকা তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার ২০ লক্ষ মানুষ অনাহার, অপুষ্টি ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। নাটকের প্রধান চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। তিনি বাংলার এক চাষি। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার অনাহারে কেমন কষ্ট পেয়েছিল তাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নবান্ন নাটকে কৃষকদের একটি দলকে দুর্ভিক্ষের শিকার হিসাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের কারণে কৃষকদের তাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল এবং তারা বেঁচে থাকার আশায় বড় শহর কলকাতায় চলে আসে। যাই হোক তারা একটি সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অবশেষে তারা কলকাতার সর্বাধিক অবহেলিত দারিদ্রতা, যেখানে তারা তাদের যন্ত্রণা একটি রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে হয় অভিব্যক্ত হয়।

৩০৩.২.৮.৪ : গ্রুপের ধারণা

সাধারণ দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয় সাধারণ রঙ্গশালা। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায়ের। এ সময়ের প্রধান পুরুষ, নট ও নাট্যকার গিরীশ ঘোষ ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা তুলে ধরেন তার নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়, বিদ্রোহ ও জনগণের আন্দোলন নিয়ে নাটক করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদাসীন।

সেইসময় বাংলার নাট্যশালাগুলি সমকালীন সঙ্কট থেকে দূরে গিয়ে দর্শকদের বাস্তব চাহিদা মেটাতে পারছিল না। সমকালীন সমাজব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত তখন মানুষের মন। এই সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য আন্দোলন

নতুনভাবে সম্পদশালী হয়ে উঠতে চাইল বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের ধারাপথে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ অভিঘাতে যে সংকট বাংলায় তৈরি হয়েছিল, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালি প্রত্যক্ষ করেছিল মানুষের তৈরি করা মন্বন্তরে তারই স্বজাতির সগোত্র সাধারণ মানুষের অসহায় করুণ পরিণতি। সেদিন এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি কোনো রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের শপথ নেয় নি। কিন্তু সর্বস্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবন চর্যা ও বিশ্বাসে সচেতনতা সঞ্চার করে বাঙালি তার সংগ্রাম করে তুলতে চেয়েছিল 'সামগ্রিক'। সরকারের এই "অন্তর্দাহ ও অকুণ্ঠ স্বভাবের আর্তি স্বরলিপির মত পড়তে পেরেছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন - ভারতীয় গণনাট্য সংঘ।"

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের শুরুতে কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটার জনপ্রিয় তারকা অভিনেতাদের উপর ভিত্তি করে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। যেমন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী ও অন্যদের মতো জনপ্রিয় অভিনেতাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ দর্শক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। গ্রুপ থিয়েটার এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রস্থান করার চেষ্টা করেছে। খ্যাতিমান অভিনেতৃবর্গের পরিবর্তে গ্রুপ থিয়েটারে জোর দেওয়া হয় গ্রুপে যা সাধারণভাবে অপেশাদার অংশগ্রহণ করেছিল। প্রচেষ্টা ছিল গণনাট্য (জনগণের থিয়েটার) তৈরি । যদিও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সংকট ও আদর্শগত কারণে গণনাট্য ভেঙ্গে যায়। একসময় যারা গণনাট্য পতাকা তুলে জড়ো হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বের হয়ে গেলেন গণনাট্য থেকে। এটা সত্য যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ চিন্তা ধারা ও বস্তুবাদী চিন্তার কারণেই এই গণনাট্যের এই ভাঙ্গন পরবর্তী সময়ে তারই পথ ধরে শুরু হলো নবনাট্য চর্চা বা আজকের গ্রুপ থিয়েটার।

৩০৩.২.৮.৫ : আইপিটিএ এর পরবর্তী গোষ্ঠীসমূহ ও অন্তঃকলহ

কলাকুশলীদের দক্ষতা সাংগঠনিক শক্তি ও অসচেতনতার ফলে অভিনয়ে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করলেও গণনাট্য সংঘের অন্তঃকলহ ক্রমশ প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে তোলে। নাটক ও নৃত্য এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, সংগঠক প্রধানের সঙ্গে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখদের নিত্য মতান্তর তীব্রভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করল গণনাট্য সংঘের দৈনন্দিন কর্মে। তবে শিল্পী বনাম সংঘটকদের এই বিরোধ কিন্তু শুধুমাত্র বাংলার অর্থাৎ প্রাদেশিক শাখার নিজস্ব সংকট ছিল না। প্রখ্যাত শিল্পী রবিশঙ্করের স্মৃতিকথা থেকে এই বিবাদের সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে – "...প্রথম প্রথম স্কোয়াডে এসে কাজের স্বাধীনতায় পার্টির ততখানি উপস্থিত বোধ করিনি।।... কিন্তু সেটাই ধরা পড়েছিল আস্তে আস্তে... ক্রমে ক্রমে পার্টির অফিস থেকে নানারকম ফরমায়েশ আসতে শুরু করল....যেখানটায় অসুবিধা দেখা দিলো তা হল ওদের পার্টির হুকুম, অর্ডার নিয়ে। একটা সময় বুঝতেই পারছিলাম বড় বেশি মাপজোকের মধ্যে প্রবেশ করেছি।...ক্রমেপার্টি অফিসের প্রস্তাবগুলো একটু যেন বেশি আসতে লাগল। ... ওদের কালচারাল স্কোয়াডের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গ্রামে শো দেখাবে, মোটর বা লরি নিয়ে গিয়ে লরির পিছনে একটা অস্থায়ী স্টেজের মত করে মানুষকে সচেতন করার জন্য কিছু কিছু নাটক, ট্যাবলো প্রেজেন্ট করবে। জোতদারের অত্যাচার, মজুতদারের স্বার্থপরতা, শঠতা এসবই ওদের বিষয়সূচির মধ্যে ছিল। নিশ্চয়ই খুব ভালো উদ্দেশ্য এবং এতে ওদের জোরটা ক্রমশ বেড়ে গেল। শিল্পের দিকটায় আগ্রহ যেন কমতে লাগলো থাকল। ...স্থায়ী সাহিত্যের সাথে সাংবাদিকতার যে দূরত্ব, এদের কাজ কারবারের সঙ্গে দেখলাম স্থায়ী কোনও শৈল্পিক কাজের সেই দূরত্ব থেকে গেছে। এই হচ্ছে, এই করছি - ভাবখানা মোটের উপর এই। আর তার ওপর সেই পার্টি লেভেলের নির্দেশ - এটা কর, ওটা বাদ দাও। প্রায়ই এই নির্দেশ আমার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল... কিরকম যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঠেকতে লাগলো।"

পরাধীন ভারতে গণনাট্য সংঘের অন্তঃকলহ তত প্রকট হয়নি, দারুণভাবে তা প্রকট হয়ে উঠল স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে - এমনকি বাংলা প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘ সচিব প্রকাশ ঘোষ তাঁর প্রতিবেদনে নানা বিভেদের স্বরূপ উদঘাটন করে পেশ

করেছিলেন সাত দফা সমাধান সূত্র। এত কিছুর সত্বেও গণনাট্য সংঘের ভাঙ্গন রোধ করা গেল না। অপরদিকে স্বাধীন বদেশের সরকার যখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন তখন গণনাট্যের অনেকেই বিপন্ন বোধ করলেন, বিশেষতঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন গণনাট্যে যুক্ত থাকার ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন ছিলেন না।

সেই সময় সাধারণ রঙ্গশালা সঙে গণনাট্য সংঘের কখোনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। গণনাট্য অভিনীত নবান্নের সাফল্যের পর শঙ্কিত মঞ্চ মালিকরা কেউ গণনাট্যকে অভিনয় প্রদর্শনের জন্য মঞ্চ রাজি ছিলেন না। জীবিকার প্রয়োজনে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (যিনি মহর্ষি নামে পরিচিত) যুক্ত ছিলেন চলচিত্র সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে কিন্তু প্রগতি সংঘের আদর্শে তার অনুরাগ ছিল। এদিকে রংমহল, নাট্যনিকেতন, মিনার্ভা্শ্রীরঙ্গম ইত্যাদি মঞ্চাভিনয়ে অতৃপ্ত শম্ভু মিত্র আবার বিজন ভট্টাচার্যের আহবানে কলকাতার ধর্মতলার ৪৬ নম্বর বাড়িতে পৌঁছালেন। এখানেই গড়ে ওঠে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্রের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক। এরপর ১৯৪৮এ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে গণনাট্যের সংঘের এক সভায় জনৈক সভ্য তাচ্ছিল্য করলে, শম্ভু মিত্র এই সংঘ পরিত্যাগ করেন।

এরপর মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বস্ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টচার্য শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কালিম শরাফি, মোহম্মদ ইসরাইল প্রমুখ শিল্পীগণ যৌথভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন নতুন কিছু করা শুরু করার। এরপর ১৯৪৮এ রঙমহলে 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' প্রযোজিত নবান্ন নাটক ১৩, ১৪ ও ১৬ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হলো। অনুপ্রেরণা শম্ভু মিত্রের পরিচালনা এবং কালিম শরাফিসহ তার তিন সহকর্মী অমর গাঙ্গুলী, অশোক মজুমদার এবং মুহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখের প্রচেষ্টা এবং কালীশংকর, ঋত্বিক ঘটক, সত্য জীবন ভট্টাচার্য, জলদ চট্টোপাধ্যায় আরো অনেকের সহযোগিতায় উৎকৃষ্ট প্রযোজনার সত্বেও 'নবান্ন' আর্থিক ভাবে সাফল্য পেল না। এরপর সংগঠন থেকে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় –

ক) পেশাদারি পথ ছেড়ে অবলম্বিত হলো পরীক্ষামূলক পথা খ) মাসিক ৮ আনা চাঁদা স্থির হলো। গ) দলে কাজের বিভাজনে অমর গাঙ্গুলী দায়িত্ব পেলেন মহলার এবং মহম্মদ জ্যাকেরিয়া হিসাব রক্ষার। ঘ) অনুশীলনের নির্দিষ্ট সময় স্থির হলো সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে নটা পর্যন্ত।

এরপর তুলসী লাহিড়ীর পরিমার্জিত নাটক 'পথিক' 'রেলওয়ে ম্যানশন ইনস্টিটিউট' প্রেক্ষাগৃহে ১৯৪৯এ ১৬ অক্টোবর 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' নিজস্ব প্রযোজনায় মঞ্চ সাফল্য লাভ করে। নাট্যদল প্রতিষ্ঠিত হয়, নাম হয় 'বহুরূপী'। মর্ষির ভাবনায় 'দ্যাখ, আমরা তো রংচং মেখে সব নাটক করি, থিয়েটার করি, তা আমরা তো সব বহুরূপীর দল – এক এক নাটকে এক এক রূপ। অতএব বহুরূপী দল নাম দিলে কেমন হয়?'। ৯মে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'বহুরূপী'র জন্মদিন নির্ধারিত হয়।

যদিও উৎপল দত্তের 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা আগেই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এঁরা তখন শেক্সপিয়ার ও বার্নার্ড শ এর নাটক ইংরেজি অভিনয় করতেন। তাই মনে করা হয় 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই প্রথম বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সূত্রপাত ঘটে। এরপর একে একে রূপকার, গন্ধর্ব, নান্দীকার, থিয়টার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি দলগুলি এসে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করল।

৩০৩.২.৮.৬ : বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের স্বরূপ

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার অস্তিত্ব রক্ষায় প্রথম পর্বে টিকিট বেচে থিয়েটার মঞ্চস্থ করলেও, তাদের লক্ষ্য কোনদিনই 'কমার্শিয়াল থিয়েটার' ছিল না। ব্যবসাভিত্তিক কমার্শিয়াল থিয়েটারে নাট্যকর্মীদের ওই দলের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না। এখানে প্রধান লক্ষ্য মালিকের স্বার্থ। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য সুস্থ ও প্রগতিশীল নাট্যচর্চা। আর গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যকর্মীরা অখণ্ডভাবে একটি যৌথ পরিবার। ১৯৪৮ থেকে ২০০০ পর্যন্ত বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এরকম দলগুলি বেশিরভাগই কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার বাইরে গ্রুপ থিয়েটারের ধারায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তবে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের সাংগঠনিক ভিত্তি সর্বত্র একই ধরনের। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা একজনের নেতৃত্বে একত্র দল তৈরি করে। এছাড়া অধিকাংশক্ষেত্রেই দলের সদস্যদের স্ত্রী বা বোন অথবা বান্ধবী। গ্রুপ থিয়েটারের নেতৃত্ব যিনি, তিনি পরিচালক। তিনি সাধারণত দলের সবথেকে সমর্থ এবং অভিজ্ঞ অভিনেতা, ফলে একথা অস্বীকার করার উপায় নে, যে বাংলা গ্রুপ থিয়েটারের প্রথম অবধি পরিচালককেন্দ্রিক কিছুটা একনায়কতন্ত্র চলে আসছে অর্থাৎ যদিও নামে গ্রুপ বা অনেকের দল কিন্তু বাস্তবে বাংলা গ্রুপ থিয়েটার মূলত 'ডিরেক্টরস্ থিয়েটার' একাধিকের নেতৃত্বে বা যৌথ নেতৃত্বে দল চলে এমন দল প্রায় নেই বললেই চলে। মনে পড়ে প্রথম পর্যায়ে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' দলে যৌথ নেতৃত্ব ছিল।

যদি সাল অনুযায়ী সময়ের প্রেক্ষিতে গ্রুপ থিয়েটারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রেখাচিত্র করি তাহলে দেখব ১৯৪৪ - ১৯৬০ (আনুমানিক) নবনাট্য (গণনাট্য) – গণনাট্য, সৎনাট্য। সৎনাট্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েন 'বহুরূপী সম্প্রদায়'। আবার নান্দীকার, রূপকার ইত্যাদ কয়েকটি দল অরাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (যেমন ব্যাপিকা বিদায়, নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র) ইত্যাদি। নান্দীকার নিজের ইচ্ছা বা দ্বিধার বিরুদ্ধে সৎনাট্য করেন বলে অভিহিত হন। পরে অবশ্য 'নান্দীকার' তার দলের স্লোগানে ঘোষণা করে 'ভালো নাটক করবো, ভালো নাটক ভালো করে করব।'

৩০৩.২.৮.৭ : বিশিষ্ট থিয়েটার ব্যক্তিত্ব

বাংলা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ:

● অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৩৩—অক্টোবর ১৪, ১৯৮৩)

ছাত্রজীবন থেকে তিনি নাটক রচনা ও অভিনয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৫০ থেকে ৫৪-এই পাঁচ বছরে ৯টি নাটকে নির্দেশনা ও অভিনয় সূত্রে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৪ তে লিখেছেন মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সংঘাত'। ২ বছর পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। এই সংঘে ১৫টি নাটকে অংশ নেন তিনি। ১৯৬০ সালে ২৯ শে জুন প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দীকার'। প্রায় ৪০টি নাটকে নির্দেশক বা অভিনয় অথবা উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। তিন পয়সার পালা নাটকে নির্দেশনা ওসঙ্গীত পরিচালনার জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন। সেতু বন্ধন, সওদাগরের নৌকা তার রচিত নাটক। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ এ নান্দীমুখ নামে নামে এক নতুন নাট্যগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এদের বিখ্যাত নাটক পাপপুণ্য।

● বাদল সরকার (১৫ জুলাই, ১৯২৫—১৩ মে, ২০১১)

একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙালি নাট্যব্যক্তিত্ব। যিনি থার্ড থিয়েটার নামক ভিন্ন ধারার নাটকের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। ৭০ দশকের নকশাল আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠান বিরোধী নাটক রচনার জন্যে তিনি পরিচিত হন, মঞ্চের বাইরে সাধারন মানুষের ভেতর নাটক'কে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রথম কাজ বাদল সরকারের। তার নিজস্ব নাটক দল শতাব্দী গঠিত হয়

১৯৭৬ সালে। ভারতে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে হাবিব তনভীর, বিজয় তেন্ডুলকর, মোহন রাকেশ এবং গিরিশ কার্নাডের পাশাপাশি বাংলায় বাদল সরকারের নাম উচ্চারিত হয়।

● শম্ভু মিত্র (২২ আগস্ট, ১৯১৫—১৯ মে, ১৯৯৭)

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের এক কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব, স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী ও চলচ্চিত্র অভিনেতা। ১৯৩৯ সালে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলি মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল: নবান্ন, 'বিভাব' ,ছেঁড়া তার, পথিক, দশচক্র, চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, কাঞ্চনরঙ্গ, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তার রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তার রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: উলুখাগড়া, বিভাব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গ: নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ।

● রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (৩১ জানুয়ারি, ১৯৩৫—)

১৯৬১ সালে তিনি কলকাতায় নান্দিকার নামের এক নাট্য গোষ্ঠীতে যোগদান করেন। ১৯৭০ সাল থেকে উনি ঐ নাট্য সংগঠনের পরিচালক হিসেবে অনেক নাটক পরিচালনা করেন ও ওই বছর থেকেই উনি ঐ নাট্য সংগঠনের প্রধান হন। ১৯৮০ সালের শ্রেষ্ঠ জাতীয় পুরস্কার, যা উনি সঙ্গীত নাটক একাদেমি থেকে লাভ করেন। তার স্ত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত - যিনি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ঘরে বাইরে (চলচ্চিত্র)-এ অভিনয় করার জন্য বিখ্যাত।

● তৃপ্তি মিত্র (ইংরেজি: Tripti Mitra) ডাকনাম তৃপ্তি ভাদুড়ী (২৫ অক্টোবর, ১৯২৫ – ২৪ মে, ১৯৮৯) ছিলেন বাংলা ভাষার থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী এবং শম্ভু মিত্রের স্ত্রী যিনি নাটক পরিচালনার জন্য খ্যাত ছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে বহুরূপী নাট্যদল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন। তিনি যুক্তি তক্কো আর গপ্পো, ধরতি কে লাল ইত্যাদি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন।

এছাড়া এছাড়া আগুন নবান্ন জবানবন্দি রক্তকরবী রাজা ডাকঘর প্রভৃতি বহু নাটকে অভিনয় প্রযোজনা ও পরিচালনা কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উষা গাঙ্গুলি, ১৯৭৬ সালে রঙ্গকর্মি থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উৎপল দত্ত: উৎপল দত্ত বিভিন্ন নাটক রচনা করেছেন, পরিচালনা করেছেন এবং অভিনয় করেছেন।

কৌশিক সেন: ১৯৯২ সালে স্বপ্নসন্ধানী প্রতিষ্ঠা হয়, গত দুই দশক ধরে তারা ৪০ টিরও বেশি নাটক রচনা করেছে।

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাকটিউল থিয়েটার আর্টস-এর (আইএফটিএ) প্রতিষ্ঠাতা দেবাশীষ দত্ত।

অরুণ কুমার সরকার, ১৯৬১ সালে গ্রিন অ্যালবাম গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অরিন্দম সাহা, ২০০২ সালে নাট্যচেতনা'০৩ (গণ শিক্ষা) থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়, আগস্ট, ২০১৩ সালে একেটিও প্রতিষ্ঠা করেন।

নিলকণ্ঠ সেনগুপ্ত: থিয়েটার কমিউন-এর প্রতিষ্ঠাতা

বিশ্বরূপ চট্টোপাধ্যায়: ২০১৩ সালে দমদম বিশ্বরূপম প্রতিষ্ঠা করেন।

চন্দ্র গুপ্ত: ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন অগ্রানের নবান্ন।

দীপ-গুঞ্জন (দীপঙ্কর বসু ও গুঞ্জন গাঙ্গুলি) ২০১২ সালে ঘোলা কালমুকুর প্রতিষ্ঠা করেন।

পিঙ্কি ঘোষ দস্তিদার ২011 সালে স্যামপন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

৩০৩.২.৮.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গ্রুপ থিয়েটার কী? আইপিটিএ এফ পুরো নাম কি? এর প্রতিষ্ঠা কবে?

২। গ্রুপ থিয়েটার নবান্নের সম্পর্ক নির্ণয় করো।

৩। গ্রুপ থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখো।

৪। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার এর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম লেখো।

৫। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার এর ধারণা ও স্বরূপ বিস্তারিত আলোচনা করো।

৩০৩.২.৮.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ- পবিত্র সরকার

২। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ - সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৩। নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা -সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ -অজিত কুমার ঘোষ

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস- আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস-দর্শন চৌধুরী

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

নাট্যতত্ত্ব

একক - ৯

নাটক ও নাটকীয়তা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

৩০৩.৩.৯.২ : নাট্যলক্ষণ, নাট্যসংজ্ঞা, নাট্যবিচার প্রভৃতি

৩০৩.৩.৯.৩ : নাটকের বৈশিষ্ট্য ও নাট্যলক্ষণ

৩০৩.৩.৯.৪ : নাটকীয়তা : নাট্যগতি

৩০৩.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

যেহেতু নাটক দৃশ্য শিল্প ও নাট্যরচনার সময় লেখককে কল্পনায় একটি মঞ্চ রাখতে হয় এবং দর্শকদের উপযোগী করে নাটকের কাহিনীকে উপস্থাপিত করতে হয়। নাট্যকাহিনীর মধ্যে কয়েকটি মূল লক্ষণ, নাটকীয়তা সৃষ্টি, নাট্যঘটনার বিন্যাস, নাট্যগতির সঞ্চার, চরিত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি এবং দর্শকের মনে কৌতূহল বজায় রাখা নাট্যকারের সামনে নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্ত। এখানে আমরা সেই বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৩০৩.৩.৯.২ : নাট্যলক্ষণ, নাট্য সংজ্ঞা, নাট্য বিচার প্রভৃতি

সাহিত্যের নানা প্রকরণের মধ্যে নাটক অন্যতম। নাটকের ইতিহাস বহু প্রাচীন। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন আমাদের প্রপিতামহরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য আকার ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়েছিল

সেদিনই উপ্ত হয়েছিল নাটকের বীজ। আর সেই নাট্যবীজই কালের স্রোতে অঙ্কুরিত পল্লবিত হতে হতে একসময় পূর্ণতা পায়। সাহিত্যের অঙ্গনে দেখা মেলে নাটকরূপ নতুন প্রকরণের।

কারা কবে কোথায় প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন সে নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না, তবে প্রাচীনতম নাটকের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে ভারতবর্ষ ও গ্রীস দেশে। সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে নাটক এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। বাংলা তথা বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ক্ষেত্রে নাটক আজ অন্যতম প্রধান বিষয়। প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্যধারায় এখনও পর্যন্ত যেসব নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে 'রাজা ওয়াদিপাউস', 'ইফিজেনিয়া অ্যাটতৌরিস' প্রভৃতি। ভারতীয় সাহিত্যে অনুরূপ নাটক হল ভাসের 'চারুদত্ত', 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' ইত্যাদি।

৩০৩.৩.৯.৩ : নাটকের বৈশিষ্ট্য ও নাট্যলক্ষণ

বস্তু বা বিষয় মাত্রেরই একটা নিজস্বতা থাকে। নাটকের নিজস্বতা হল তার নাটকত্ব। নাটকত্ব কী? "নাটকের নানা লক্ষণ তা বাহ্যিকই হোক আর, আভ্যন্তরীণ হোক, তা সামান্যই হোক, আর বিশেষই হোক-যে সকলের জন্য নাটক বিশিষ্টতা লাভ করে কাব্য উপন্যাস না বলে তাকে নাটক বলেই বুঝি, তাই নাটকের নাটকত্ব"। নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রাজ্ঞজনের উদ্ধৃত বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। নাটকের নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপই নাটকত্ব। নাটকত্বকে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন নাটকীয়তা, সে যাই হোক নাটকের প্রধান পরিচয় নাটকত্ব। আবার নাটকত্ব হল কতকগুলি নাট্যবৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ। নাটকের বৈশিষ্ট্য বিচার প্রসঙ্গে তাই ঘুরিয়ে বলা যায় যে সব লক্ষণ দেখে নাট্যতত্ত্বকে চিনে নেওয়া যায় তাই নাটকের বৈশিষ্ট্য বা নাট্যলক্ষণ।

আচার্য ভরত ও অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দেশ বিদেশের নাট্যতাত্ত্বিকরা নাট্যবৈশিষ্ট্যের সন্ধান করে এসেছেন। তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টিতে যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে এবং গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

৩০৩.৩.৯.৪ : নাটকীয়তা : নাট্যগতি

নাট্যক্রিয়া, নাটকের এই লক্ষণটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল action শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অ্যারিস্টটল যাকে 'action' বলেছেন, তাকে সাধারণভাবে বাংলায় বলা হয় নাট্যক্রিয়া। নাট্যক্রিয়ার অন্য নাম দেওয়া যেতে পারে গতিবেগ। গতিময়তাই নাটক। ঘটনা ও চরিত্রের গতিশীলতার মধ্যে দিয়েই নাটক ক্রমশ: পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। অন্য অর্থে নাট্যক্রিয়া গতির মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে। নাট্যক্রিয়া নাটকের প্রাণস্বরূপ। অ্যারিস্টটল কথিত action-এর ভাষ্যরচনা করতে গিয়ে শ্লোগল, হেগেল, জোন্‌স প্রমুখ ভাষ্যকাররা নানা কথা বলেছেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিমত এইরকম-ক্রিয়া হল এমন এক কর্ম যা

মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নাট্যক্রিয়া হল নাটকের পাত্র পাত্রীদের স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্ম। নাটকের পাত্রপাত্রীরা প্রত্যেকে এক সুরে বাঁধা থাকে না। ফলত নাট্যক্রিয়াও সরল, রৈখিক পথে চালিত হয় না। দুই বা ততোধিক পথের দ্বন্দ্বে নাট্যক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তৈরি হয় নাটকীয়তা, কোনো ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় নাটকের পাত্রপাত্রীরা যে ক্রিয়া করে তাই বিশেষ অর্থে নাট্যক্রিয়া।

নাট্যক্রিয়া নাটকের প্রকৃতির সঙ্গে অন্বিত। সব নাটকে নাট্যক্রিয়ার মাত্রা সমান নয়। ট্র্যাজেডিতে তা সম্ভবত বেশি। এখানে দর্শক খোলা চোখে নাট্যক্রিয়া দেখতে পায়। কিন্তু তত্ত্বধর্মী নাটকে বিশেষত সংকেত রচনায় এর বাহ্যিক প্রকাশ অনেক কম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এখানে কোনো নাট্যক্রিয়া নেই। আসলে এই সব নাটকে নাট্যক্রিয়া ঘটতে থাকে চোরাপথে। একটা বিশেষ পর্বে তার ক্ষণিক উদ্ভাস চোখে পড়ে মাত্র। যথার্থই সাহিত্য রসিক এই ক্ষণিক উদ্ভাসকে অনুভব করে তার রসাস্বাদন করেন। 'ডাকঘর' নাটকে নাট্যক্রিয়া তৈরি হয়েছে অমলের মৃত্যুদৃশ্যে রাজদূতের প্রবেশের সূত্রে।

নাটকে নাট্যক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার মাত্রই নাট্যক্রিয়া সৃষ্টির উপর জোর দেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যেমন— রঙ্গমঞ্চে দুজন পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের মাঝে, সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে তৃতীয় জনের আগমন ঘটান, অভিনেতাদের বিভিন্ন রকম অঙ্গভঙ্গি, কথা বলার ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দ্রুত চলাচল প্রভৃতি। নাট্যক্রিয়ার জন্য কোনো নাটকে তৈরি হয় নাট্যগতি। অর্থাৎ নাট্যক্রিয়া রূপ কারণটি নাট্যগতি রূপ ফলে পর্যবসিত হয়। নাট্যগতিকে অধ্যাপক লসন বলেছেন— 'নাটকীয় গতি'। (Dramatic movement)। নাটক মাত্রেই নাট্যগতি থাকে; কোথাও তুলনায় বেশি, কোথাও কম। নাটক অভিনয়ের সময় দৃশ্য পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও এই নাট্যগতি চলতেই থাকে। বস্তুত নাট্যগতির পথ অনুসরণ করেই দর্শক নাটকের রস পরিণতিতে উপনীত হয়।

৩০৩.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাটকীয়তা কাকে বলে? নাটকে নাটকীয়তার সঞ্চার করার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত কিনা বিচার করো।

২। নাটকীয় গতিবেগের আরেকটি উপকরণ হলো নাট্যশ্লেষ বা ড্রামাটিক আয়রনি, সংক্ষেপে আলোচনা করো।

একক - ১০

নাটকে ঘটনা, গতি, সংঘর্ষ, কৌতূহল

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১০.১ : নাট্যদ্বন্দ্ব : নাট্য সংঘর্ষ

৩০৩.৩.১০.২ : নাট্যোৎকণ্ঠা : নাট্যকৌতূহল

৩০৩.৩.১০.৩ : দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ

৩০৩.৩.১০.৪ : নাট্যঘটনা : বিভিন্ন পর্যায়

৩০৩.৩.১০.৫ : প্রাচ্য অভিমত

৩০৩.৩.১০.৬ : পাশ্চাত্য অভিমত

৩০৩.৩.১০.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.১০.১ : নাট্যদ্বন্দ্ব : নাট্য সংঘর্ষ

নাট্যদ্বন্দ্ব, নাটকের বিশেষ লক্ষণগুলির মধ্যে আর একটি। অনেকে একে নাটকের প্রাণস্বরূপ বলতে চান। এক অর্থে কথাটি সত্য। অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি তত্ত্বে action-এর অপরিসীম গুরুত্ব স্বীকৃত। নাট্যদ্বন্দ্ব এই action এর চূড়ান্ত পরিণতি। অ্যারিস্টটল action-এর কথা বললেও নাট্যদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেননি। উনিশ শতকের জার্মান দার্শনিক হেগেল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Aesthatices’-এ প্রথম দ্বন্দ্ববাদ বিষয়ক নাট্যলক্ষ্যটির উপস্থাপন করেন, নাট্যদ্বন্দ্ব বিষয়ে এক্ষেত্রে তাঁর অভিমত এইরকম-নাট্যক্রিয়া সরল ও নিশ্চিত ভাবে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের বিষয় নয়। মানুষের ভাবাবেগ এবং চরিত্রের সংঘাতের উপর তা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। গতিশীল সমস্ত বস্তু ও গতিমান জীবন দ্বন্দ্বগর্ভ। প্রবাহমান জীবনকে ঘিরে যে দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকে তা বাইরে থেকে সাধারণভাবে বোঝা নাও যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার

করা চলে না। এই দ্বন্দ্বের বাহ্যিক প্রকাশ হল নাট্যক্রিয়া এবং তার ফলশ্রুতি নাট্যদ্বন্দ্ব। ট্র্যাজেডিতত্ত্বের আলোচনায় অ্যারিস্টটল যে action-এর কথা বলেছিলেন, নাট্যদ্বন্দ্বের কথা বলে হেগেল তারই অন্তরতর রূপের সন্ধান দিলেন। নাট্যদ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তাঁর এই বক্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থিত হয়েছে, উইলিয়াম শ্লেগেল, আর্থার জোনস্, অধ্যাপক নিকল প্রমুখ বিদগ্ধ নাট্যব্যক্তিত্বের দ্বারা।

কোনো নাটকে নাট্যদ্বন্দ্ব তৈরি হয় সাধারণত তিনভাবে। প্রথমত, বিরুদ্ধ নিয়তির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বসূত্রে ; দ্বিতীয়ত, নিয়তি নিরপেক্ষ দুজন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের দ্বারা, তৃতীয়ত, একজন মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংঘাত থেকে। প্রথম শ্রেণির নাট্যদ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি। 'রাজা ওয়াদি পাউস' নাটকটি নিষ্ঠুর নির্মম নিয়তির বিরুদ্ধে নায়কের আপোসহীন সংগ্রাম এবং শেষপর্যন্ত পরাজয় বরণের সূত্রে আকর্ষণীয় হয়েছে। বাংলায় এই ধরনের নাটক বিশেষ নেই। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণকুমারী'র কথা স্মরণ করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যদ্বন্দ্বময় নাটকের বিশিষ্ট উদাহরণ শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াসসীজার' বাংলায় 'বিসর্জন' 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি। মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে ঋদ্ধ নাটক। শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান', 'সাজাহান', ইত্যাদি। অবশ্য এই তিন প্রধান ধারার বাইরেও আর এক ধরনের নাট্যদ্বন্দ্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে প্রবৃত্তির বিপরীত মুখীনতা নয়, মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আদর্শগত বিরোধের দ্বন্দ্ব মুখ্য।

নাটক দ্বন্দ্বময় । ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন যে কোনো ধারার রচনায় দ্বন্দ্ব থাকবেই। দ্বন্দ্বহীন নাটকের অস্তিত্ব প্রায় চোখে পড়ে না। তবে দ্বন্দ্বহীন নাটক রচিত হওয়া সম্ভব তত্ত্বগতভাবে এমন একটা সিদ্ধান্তকে নাট্যতাত্ত্বিকরা স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশ শতকের ইংরেজ নাট্যসমালোচক উইলিয়াম আর্চার দ্বন্দ্বহীন নাটকের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম সরব হন।

৩০৩.৩.১০.২ : নাট্যোৎকণ্ঠা : নাট্যকৌতূহল

নাট্যরস উপলব্ধির ক্ষেত্রে নাট্যোৎকণ্ঠাকে একটা আবশ্যক বিষয় বলে একালের নাট্যতাত্ত্বিকদের মনে হয়েছে। নাট্যোৎকণ্ঠা হল নাটকের অভিনয়কালে দর্শকের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। শ্রেষ্ঠ নাট্যঘটনার দর্শকমাত্র সবসময় একটা কি হয় কি হয় বোধের দ্বারা তাড়িত হয়। ঘটনার অসম্পূর্ণ বর্তমান ও সম্ভাব্য পরিণাম ভাবনা তাকে মানসিক চাপের মধ্যে রাখে। এই মানসিক চাপই এক অর্থে নাট্যোৎকণ্ঠা। অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, মানসিক চাপ রূপ কারণ নাট্যোৎকণ্ঠা রূপ ফলে পর্যবসিত হয়। একজন নাট্যকার সচেতনভাবে তাঁর নাটকে নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেন। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে তিনি একদিকে যেমন দর্শকের নাটক দেখার আগ্রহ ও কৌশল বৃদ্ধি করেন অন্যদিকে তেমনি ঐ আগ্রহকে বজায় রাখেন।

নাট্যোৎকণ্ঠা মূলত দুই ধরনের অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা এবং পূর্বভাসের উৎকণ্ঠা। অনিশ্চয়তাজনিত উৎকণ্ঠার মূলে রয়েছে দর্শকের অজ্ঞতা, দর্শক নাট্যঘটনার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ, কি হয় বোধের দ্বারা সর্বদা তাড়িত হতে হতে সে নাট্য ঘটনার অনুসরণ করে। অন্যদিকে পূর্বাভাসাত্মক উৎকণ্ঠার বিষয়টি হল

দর্শকের নাট্যঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য জানা আছে যা নাটকের পাত্রপাত্রীরা জানেনা এবং না জানার কারণে তাদের জীবনে ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘনিয়ে আসে। এক্ষেত্রে দর্শক উৎকণ্ঠিত হয় এই ভেবে কখন ঘনিয়ে আসবে ওই চূড়ান্ত পরিণতি, যা নায়ককে বিধ্বস্ত করবে। শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে অনিশ্চয়তজনিত উৎকন্ঠার সুন্দর নিদর্শন আছে। কোনো নাটক তখনই শ্রেষ্ঠ হয় যখন নাট্যোৎকণ্ঠা তীব্রতা পায়। একটি ঘটনার সূত্রে নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে তাকে পরিণাম পর্যন্ত ধরে রাখাতেই নাট্যকারের কৃতিত্ব। যিনি তা পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।

প্রচ্ছন্নতা নাট্যোৎকণ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে আলোচিত আর একটি বিষয়। আসলে প্রচ্ছন্নতা হল একটি কৌশল। নাট্যতাত্ত্বিকের ভাষায় - 'নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির জন্য কখনও কখনও নাট্যকার আর একটি কৌশল অবলম্বন করেন। কোনো চরিত্রের পরিচয় গোপন রেখে কিংবা পূর্বের কোনো চরিত্রের মৃত্যু ঘটেছে, এইরকম একটা সংবাদ আভাসিত করে একেবারে নাট্যঘটনার শেষ দিকে সেই চরিত্রের সত্য পরিচয় উদঘাটিত হয় এবং দেখানো হয় যে যার মৃত্যু হয়েছিল সে জীবিত। শেষের এই সত্যকে না জানা পর্যন্ত দর্শকচিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির এই কৌশলকেই বলা হয় প্রচ্ছন্নতা'। প্রচ্ছন্নতা নাট্যোৎকণ্ঠা বৃদ্ধির একটা সহায়ক উপাদান।

৩০৩.৩.১০.৩ : দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ

নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় নাটকের লক্ষণ হিসেবে দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগ এই দুই বিষয়ের উপস্থাপন ভারতীয় আলংকারিকদের বিশেষ অবদান। আদিমতম আলংকারিক আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের ১০৬ থেকে ১২২ সংখ্যক শ্লোকে নাটকের নানা লক্ষণের কথা বলেছেন। তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগের প্রসঙ্গ। নাটকের লক্ষণ হিসেবে দৃশ্যধর্মিতা ও জনসংযোগকে স্বীকার করে নিতে আমাদের কোনো বাধা নেই। নাটক অবশ্যই দৃশ্যকাব্য। কোনো নাটক হয়তো পাঠ করেই যথেষ্ট রসাস্বাদন করা যায় ; কিন্তু পাঠ করাতেই তার সার্থকতা নয়, নাটকের পূর্ণ পরিণতি অভিনয়ে। আবার জনসংযোগও নাটকের অপরিহার্য শর্ত। দৃশ্যকাব্য হিসেবে নাটককে দাঁড়াতে হয় দর্শকের আদালতে। সেক্ষেত্রে দর্শক যদি কোনো নাটকের নাট্য বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারে তবে সে নাটক মূল্যহীন। একটি নাটক রচনাকালে নাট্যকারকে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় দর্শকের রুচি সম্পর্কে। অনেকসময় আদর্শবোধ বিসর্জন দিয়ে দর্শকের রুচির সঙ্গে আপোস করতে বাধ্য হন তিনি। মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস অন্বেষণ করলে এর অনেক নিদর্শন মেলে, সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে পাঠকের রুচিবোধের সঙ্গে সাহিত্যিককে এইভাবে আপোশ করতে হয় না। সেদিক থেকে জনসংযোগের বিষয়টি অবশ্যই নাটকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

নাট্যলক্ষণ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিকদের আলোচনায় উঠে এসেছে আরও কিছু কিছু বিষয়। থর্নটন উইলডার মনে করেছেন ঘটনার ঘটমানতা নাটকের অন্যতম লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক নিকল আশ্চর্যজনকতা, অপ্রত্যাশা, আকস্মিকতা ও চমককে নাট্যলক্ষণ হিসেবে বর্ণনা

করেছেন। তবে এইসব বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। ঘটনার ঘটমানতাকে এক অর্থে বলা যেতে পারে নাট্যক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ধারা, যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আশ্চর্যজনকতা, অপ্রত্যাশা এই বিষয়গুলি পূর্ববর্তী আলোচনায় ফিরে ফিরে এসেছে। স্বভাবত এগুলিকে স্বতন্ত্র নাট্যলক্ষণ হিসেবে না চিহ্নিত করলেও চলে, তবে এত কথার পরেও স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, নাটক মিশ্র শিল্প ; এর বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণকে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাঁধনে বাঁধা চলে না। অনেক সম্ভাবনার দ্বারই উন্মোচিত থেকে যায়। স্বভাবত এক্ষেত্রে কোনো বক্তব্যই সম্পূর্ণ অযথার্থ নয় হয়তো।

৩০৩.৩.১০.৪ : নাট্যঘটনা : বিভিন্ন পর্যায়

বিভিন্ন পর্যায় বা অংশে বিভক্ত এই যে নাটকীয় বৃত্ত তার প্রকৃতি কেমন হবে সে সম্পর্কেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যতাত্ত্বিকরা তাঁদের সুনিশ্চিত অভিমত জানিয়েছেন।

৩০৩.৩.১০.৫ : প্রাচ্য অভিমত

১. একটা নাট্যঘটনায় মূল বৃত্তের পাশাপাশি এক বা একাধিক উপবৃত্ত থাকতেও পারে। তবে উপবৃত্ত কখনই মূল বৃত্তকে আবৃত করবে না, বরং তাকে আরও আলোকিত করতে সহায়তা করবে।

২. মূল বৃত্তের সঙ্গে উপবৃত্তের যোগসূত্রটি জৈবিক হবে। অর্থাৎ একটা কোনো প্রকৃত সম্বন্ধে দুটি বৃত্ত সংযুক্ত থাকবে, পরম্পরার যোগসূত্র শিথিল হলে চলবে না।

৩. উপবৃত্ত তার চলার পথে এক সময় মূল বৃত্তের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। আবার এর স্বতন্ত্ররস পরিণতিও সম্ভব। তবে, ওই রসপরিণতি মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ মূল কাহিনী করুণ রসাত্মক হলে উপবৃত্তের পরিণতিও করুণ রসাত্মক হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। সেক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের পথে উপবৃত্ত মূলবৃত্তকে অবলোকিত করে।

৪. উপবৃত্তের পাত্রপাত্রী বা প্রধান প্রধান চরিত্রসমূহ মূল বৃত্তের অধীনস্থ থাকবে। তারা তাদের চারিত্রিক সমুন্নতিতে কখনও মূল বৃত্তের চরিত্র বা নায়ককে ছাপিয়ে যাবে না।

৩০৩.৩.১০.৬ : পাশ্চাত্য অভিমত

১. বৃত্ত হবে সরল, স্পষ্ট ও সার্বজনীন। বোধগম্যতা বৃত্তের প্রধান গুণ হওয়া উচিত।

২. বোধগম্যতার সীমায় সীমায়িত রাখার জন্য আয়তনের দিক থেকে বৃত্তকে একটা নির্দিষ্ট পরিসরের করতে হবে, তা অতিরঞ্জিত হবেনা, আবার খুব সংক্ষিপ্ত হবে না।

৩. বৃত্ত হবে সংক্ষিপ্ত ও সংহত। নায়কের জীবনে অনেক ঘটনা থাকতে পারে। এইসব ঘটনার সমস্তই বৃত্তের বিষয় হবে না। নাটকের ঘটমান ঘটনার কোনো এক খণ্ডাংশের নাট্য নির্মিতির সূত্রে জীবনের পূর্ণাঙ্গরূপের আভাস দেওয়া হবে।

৪. একটি বৃত্তের মধ্যে একাধিক নয়, একটিমাত্র কাহিনী থাকবে এবং তার উদ্দেশ্য হবে একমুখী। একাধিক কাহিনী নাটকের একমুখী উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে হানিকর।

৫. কমেডিতে উপকাহিনী থাকলেও থাকতে পারে, এবং মূল কাহিনীর বিপরীতে তার স্বতন্ত্র পরিণতিও সম্ভব। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে মূল কাহিনীর বাহুল্য ও তার স্বতন্ত্ররস পরিণতি সম্পূর্ণ অনুচিত।

৬. বৃত্ত হতে পারে, জটিল বা সরল, যে কোনো রকমের। সরলবৃত্তে ঘটনার বৈপরীত্য বা প্রত্যাভিজ্ঞান থাকবে না, জটিল বৃত্তে এসব থাকতে পারে।

বৃত্ত প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার এই যে পরিচয় তুলে ধরা হল তা অ্যারিস্টটল আচার্য ভরত, আচার্য বিশ্বনাথ প্রমুখের বক্তব্য নির্ভর, আধুনিক আলংকারিকরা সবসময় এইসব বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না।

৩০৩.৩.১০.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাটকের ঘটনা পারম্পর্য নাট্যকার কিভাবে গড়ে তুলবেন।

২। নাটকের প্রধান সাফল্য নির্ভর করে নাট্যক্রিয়া বা নাট্যগতির উপর আলোচনা করো।

৩। যে-কোন নাটকের নাট্য সংঘর্ষের বারংবার ব্যবহার দর্শক ও পাঠকদের অন্যতম চাহিদা কিনা বিচার করো।

৪। নাট্যকৌতূহল না থাকলে কোনো নাটকেরই মঞ্চ সাফল্য হতে পারে না। —এই মন্তব্যটি যথাযথ কিনা দেখাও।

৫। নাট্যতত্ত্বের বিচারে কোন উপাদান নাটকের গতিমুখ পরিবর্তনে বড় ভূমিকা নেয়? দৃষ্টান্তসহ বিস্তৃত আলোচনা করো।

একক - ১১

ট্র্যাজেডি

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১১.১ : ট্র্যাজেডির উদ্ভব কথা

৩০৩.৩.১১.২ : ট্র্যাজেডি ও তার বিভিন্ন দিক

৩০৩.৩.১১.৩ : ট্র্যাজেডির নায়ক

৩০৩.৩.১১.৪ : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নায়ক

৩০৩.৩.১১.৫ : দ্বৈত নায়ক

৩০৩.৩.১১.৬ : নায়কবিহীন ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.৭ : নারী মুখ্য ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.৮ : ট্র্যাজেডির ভাব

৩০৩.৩.১১.৯ : ক্যাথারসিস

৩০৩.৩.১১.১০ : ট্র্যাজেডির শ্রেণী

৩০৩.৩.১১.১১ : ট্র্যাজেডির বিবর্তন : গ্রীক ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১২ : বাংলা নাটক ও গ্রীক ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৩ : এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৪ : বীরত্বমূলক ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৫ : ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৬ : পারিবারিক ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৭ : নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৮ : আধুনিক ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.১৯ : ইবসেন

৩০৩.৩.১১.২০ : স্ট্রিন্ডবর্গে ও হাউপ্টম্যান

৩০৩.৩.১১.২১ : চেকভ

৩০৩.৩.১১.২২ : সার্ত্রে

৩০৩.৩.১১.২৩ : নীল

৩০৩.৩.১১.২৪ : বাঙলা ট্র্যাজেডি

৩০৩.৩.১১.২৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.১১.১ : ট্র্যাজেডির উদ্ভব কথা

প্রাচীন গ্রীসের সুরা, শস্যের ও উর্বরাশক্তির দেবতা হলেন ডায়োনিসাস। ইনি ছাগরূপী বা বৃষরূপী। এই দেবতার বসন্তকালীন উৎসব থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব। এই উৎসবে গ্রামের সমস্ত লোকজন শোভাযাত্রা সহকারে দেবতার কাছে উপস্থিত হয়ে ছাগবলি দেওয়ার পর, কিছুসংখ্যক ভক্ত নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে গান গাইত, তার নাম 'ডিথির‌্যাম্ব'। এই গানে ডায়োনিসাসের মহিমা কীর্তিত হত। "ডিথির‌্যাম্ব" গানই চূড়ান্ত পরিণতি পায় ট্র্যাজেডিতে।

'ট্র্যাজেডি' শব্দটি গ্রীক। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ছাগগীতি (goat song)। ডায়োনিসাসের উৎসবে ছাগ বলি দেওয়া হত বলে এবং প্রতিযোগিতায় কৃতী ব্যক্তিকে ছাগ উপহার দেওয়া হত বলে ছাগরূপী দেবতার কথাআশ্রয়ী গান গোটে সং বা 'tragodia' নামে আখ্যাত হয়েছে। এই 'tragodia' শব্দটি থেকে 'tragedy' শব্দটির উৎপত্তি।

গ্রীসে আরিজনেই ট্র্যাজিক রীতির প্রথম প্রবর্তক। ডায়োনিসাসের উৎসব উপলক্ষে যে 'ডিথির‌্যাম্ব গানে' কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। কাহিনি বা সংলাপের প্রবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরো উন্নত করেন মেসপিস। মেসপিসের পর খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতকের দিকে আসেন লেসাস। তিনি আরও কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এরপর একে একে দেখা দিলেন এস্কাইলাস সফোক্লিস, ও ইউরিপিডিস। এঁদের সাধনায় গ্রীক ট্র্যাজেডি সর্বোত্তম রূপ লাভ করল।

৩০৩.৩.১২.২ : ট্র্যাজেডি ও তার বিভিন্ন দিক

ট্র্যাজেডি মানব জীবনের এক শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কাহিনি— জীবনের মহা সর্বনাশের এক মর্মান্তিক ইতিবৃত্ত। দৈবের বিরূপতায় বা নিজ প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ও চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ প্রবণতার একমুখিনতায় মানুষের যে দু:খ দুর্দশা বরণের কাহিনি — তারই নাম 'ট্র্যাজেডি'।

খ্রি: পূঃ চতুর্থ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা সাহিত্যিক, দার্শনিক ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে আসছেন। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন — "A tragedy, then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language. With pleasureable accessories, each kind brought in separately in the parts of

the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and Fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions.”

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা থেকে ট্র্যাজেডির কিছু বৈশিষ্ট্যর সন্ধান পাওয়া যায়, যথা—

ক. ট্র্যাজেডি হল কোনোও গুরুগম্ভীব ঘটনার অনুকরণ, যা দর্শকচিত্তে অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত করে।

খ. ট্র্যাজেডির যে ঘটনা তা একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই ঘটনা আদি-মধ্য ও অন্ত্যসমন্বিত হয়।

গ. এর যে ভাষা তাতে থাকে আনন্দদায়ক ছন্দ ও গান। অর্থাৎ তার কোনো অংশ ছন্দে ও কোনো অংশ গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়।

ঘ. এর প্রকাশভঙ্গিমা হয় উক্তি প্রত্যুক্তি সমন্বিত, নাটকীয়। কখনই তা বর্ণনাত্মক হয় না।

ঙ. ট্র্যাজেডি এমন এক ঘটনাকে রূপায়িত করে যা থেকে দর্শকচিত্তে Pity ও fear অর্থাৎ অনুকম্পা ও ভয় জাগ্রত হয়। অ্যারিস্টটল একে বলেছেন ক্যাথারসিস।

চ. এর লক্ষ হয় অনুকম্পা ও ভয়ের আবেগবাহুল্য থেকে চিত্তের মুক্তি।

প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্বকেই ট্র্যাজেডির প্রাণ বলেছেন। দুঃখের কাহিনী তাঁর কাছে ট্র্যাজেডি নয়, যদি তা নাটকীয় দ্বন্দ্বাত্মক পরিনাম লাভ না করে। তাঁর মতে ট্র্যাজেডির যে নায়ক, তার আত্মা পরস্পর বিরোধী ভালো বা সত্যের বা ন্যায়ের দাবী মেটাতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার জীবনে দেখা দেয় ট্র্যাজেডি।

অধ্যাপক ব্রাডলে তাঁর ‘Hegel’s theory of Tragedy’ নামক প্রবন্ধে হেগেলের বক্তব্যকেই অপেক্ষাকৃত নরম সুরে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে সব ট্র্যাজেডিতে নৈতিক সমস্যা থাকে না। তিনি ট্র্যাজেডির দু-রকম সমাপ্তির কথা বলেছেন— ক. সমন্বয় পরিণাম— নায়কের সঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষের একটা রফা ও মিলন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আরও মর্মান্তিক খ. বিপত্তি-পরিণাম বিভক্ত আত্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিদারুণ প্রয়াস কিন্তু পরিণামে দুর্গতি।

বিশ শতকের নাট্যতাত্ত্বিক রাজর ফ্রাইও তাঁর ‘Romance and Tragedy’ গ্রন্থে হেগেলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্র্যাজেডির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সর্বজনীন নৈতিক শৃঙ্খলার ট্র্যাজেডিকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় দার্শনিক শোপেনহাওয়ার উনিশ শতকে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে নতুন কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে জীবনে ট্র্যাজেডি তিনটি পথে আসতে পারে— ক. মানুষের নিজের অতিরিক্ত শয়তানির ফলে, যেমন-ইয়াগো খ. অন্ধ ও ক্রুর ভাগ্যের চক্রান্তে, দৃষ্টান্ত রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট গ. মানব চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের সংঘর্ষে, দৃষ্টান্ত — কতকটা হ্যামলেট।

আধুনিককালের নাট্যকার ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্নার্ড শ প্রমুখের হাতে যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হল তার স্বরূপ বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিকলের কথায় এগুলি পুরোপুরি যুগোপযোগী এবং এখানে মৃত্যু ট্র্যাজিক কিছু নয় এবং এখানে নায়কের অন্তরের মহিমাই মুখ্য।

৩০৩.৩.১১.৩ : ট্র্যাজেডির নায়ক

নাটকের নায়ক সেই চরিত্র, যাকে কেন্দ্র করে নাট্যাবেগ উৎসারিত হয়, যার মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্য রূপায়িত হয় এবং যার সংগ্রামী শক্তির ওপর আমাদের গভীর সহানুভূতি থাকে, যাকে আশ্রয় করে নাটকের অঙ্গীরস অভিব্যক্ত হয়, যার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের জীবনদর্শন প্রকাশ পায়। ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডির আত্মা ও উদ্দেশ্য যাকে আশ্রয় করে রূপ লাভ করে সেই নায়ক। ট্র্যাজেডিতে নায়ক চরিত্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা সর্বাধিক।

অ্যারিস্টটল তাঁর ‘Poetics’ গ্রন্থে ট্র্যাজেডির নায়কের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ —

ক. ট্র্যাজেডির নায়ক হবে অতিশয় খ্যাতিমান, সমৃদ্ধিশালী, বা বংশমর্যাদার অধিকারী। সে ‘above the common level’ হবে।

খ. নায়ক চরিত্রটি প্রবল সম্ভাবনাময় চরিত্র হবে।

গ. সে ভালো মন্দের মাঝামাঝি মনের মানুষ হবে।

ঘ. দৈবের কারণে বা চরিত্রের নিজস্ব কোনো দোষত্রুটির জন্য তার চূড়ান্ত ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে। অজ্ঞানতাবশত ভুলের উদাহরণ হিসেবে অ্যারিস্টটল সফোক্লিসের ‘ইডিপাশ’ নাটকের ইডিপাশ চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যে নিজের অজ্ঞাতে পিতৃহত্যা করেছে এবং নিজ মাতাকে বিবাহ করে তাঁর গর্ভে পুত্র কন্যার জনক হয়েছে। আবার যে ইচ্ছে করেই ভুল করে তার উদাহরণ হিসেবে অ্যারিস্টটল ইউরিপিডিসের ‘হিপ্পোলাইটাস’ নাটকের ফেড্রা চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

ঙ. ট্র্যাজেডির যে নায়ক হবে তার মধ্যে Doing and suffering থাকবে; আর এই Doing and suffering দর্শক পাঠকের চিত্তে Pity and Fear জাগাবে, যার ফলে তারা নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়বে।

৩০৩.৩.১১.৪ : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় নায়ক

ট্র্যাজেডির নায়ক কোথাও উদ্যমশীল কর্মতৎপর ও অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয়, আবার কোথাও নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির

হয়। প্রথম শ্রেণীর নায়ক নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কর্মতৎপর হয় এবং সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এস্কাইলাসের অরিস্টিস শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান প্রভৃতি চরিত্র এর দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় প্রকারের নায়কেরা কর্মতৎপর নয়। এদের মানসিক ও আত্মিক সক্রিয়তা নাটকে প্রকাশ পায় না। শেক্সপীয়রের লীয়র, মধুসূদনের ভীমসিংহ, দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরা একটা আদর্শে অবিচল থাকার চেষ্টা করে এবং শেষপর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়।

৩০৩.৩.১১.৫ : দ্বৈতনায়ক

অধ্যাপক নিকল ট্র্যাজেডিতে দুজন নায়কের কথা বলেছেন, এলিজাবেথীয় যুগের কিছু কিছু নাটকে দুজন নায়কের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এই সব নাটকে ট্র্যাজিক বোধ জাগে, ঐ দুই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ থেকে। তিনি শেক্সপীয়রের ‘ওথেলো’ নাটকের ওথেলো ও ইয়াগোকে, ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকের সীজার ও ব্রুটাসকে নায়ক বলেছেন। তাঁর মতে, ট্র্যাজেডির নায়ক নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে, নাট্যবৃত্তকে অগ্রগতি দান করে এবং নাটকে সে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্ররূপে দেখা দেয়। বক্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা আছে, আবার নেই। ‘ওথেলো’ নাটকে ইয়াগো সক্রিয় চরিত্র হলেও নিষ্ক্রিয় ওথেলোই নায়ক। অন্যদিকে ‘জুলিয়াস সীজার’-এ সীজার ও ব্রুটাস দুজনকেই নায়ক বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত হিসেবে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’— এর রাবণ ও মেঘনাদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

৩০৩.৩.১১.৬ : নায়কবিহীন ট্র্যাজেডি

অধ্যাপক নিকল কিছু কিছু ট্র্যাজেডির কথা বলেছেন, যেখানে কোনো নায়ক বা নায়িকা নেই। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি গলসওয়ার্দির Strife, Justice এবং মি: ও ক্যাসির ‘Silver Tassie’-র উল্লেখ করেছেন। এই ট্র্যাজেডিগুলি ট্র্যাজিকবোধ জাগ্রত করে অথচ এগুলির মধ্যে এমন কোনো প্রধান চরিত্র নেই যারা দর্শকচিত্তকে অধিকার করে নায়ক আখ্যা লাভ করতে পারে। আসল কথা এই নাটকে নায়কের নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব থাকে না, সে একটা শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে উপস্থিত হয়। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’, উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’ এই শ্রেণীর নাটক।

৩০৩.৩.১১.৭ : নারী মুখ্য ট্র্যাজেডি

নারী চরিত্রকে অবলম্বন করেও ট্র্যাজেডি রচনা হয়েছে। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে আমরা ইলেকট্রা, অ্যান্টিগোন, মিডিয়া প্রভৃতি নারী চরিত্র পাই। শ্রেষ্ঠ She Tragedy তে কোমল স্বভাব নারী থাকতে পারে, তারা নাটকের প্লটের বা বৃত্তের অগ্রগতিতে সাহায্য করবে না। কিন্তু নায়কের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার

করতে পারে তাকে নায়িকা রূপে উপস্থাপিত করতে গেলে তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও সক্রিয়তা দেখাতে হবে। 'নূরজাহান' (দ্বিজেন্দ্রলালের) নাটকের নূরজাহান নারী নায়িকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গিরিশচন্দ্রের 'জনা'ও নারী-নায়িকা।

৩০৩.৩.১১.৮ : ট্র্যাজেডির ভাব

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল শুধুমাত্র গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলির উপর নির্ভর করে ট্র্যাজেডির ভাবসম্পর্কিত আলোচনা করেন। তিনি 'Poetics' গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মূল ভাবের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে কখনো 'Pity and Fear' কখনো 'Fear and pity' কখনো 'Pity or Fear' আবার কখনো Fear বা Pity শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি 'অনুকম্পা' ও 'ভীতি' এই দুই ভাবকে ট্র্যাজেডি স্থায়ীভাবে বলতে চেয়েছেন। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাতেও তিনি এর উল্লেখ করেছেন। বলা যায় দুইয়ের প্রাধান্যেরই জন্য অন্যান্য পরিচ্ছেদেও Pity or Fear বা Fear or pity কথাগুলি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুকম্পা ও ভয় ট্র্যাজেডির এই দুই প্রধান ভাব জাগ্রত হওয়ার প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল বলেছেন, ট্র্যাজেডি নায়কের জীবনের বিপর্যয় বা শোচনীয় পরিণামকে যখন অনুচিত বলে বোধহয় তখনই জাগে অনুকম্পা, আর ঐ শোচনীয় পরিণামগ্রস্ত নায়কটিকে যখন আমাদের মতো একজন মানুষ মনে করা হয়, তখনই দর্শকচিত্তে জাগে ভয়।

নায়কের বিপত্তির পরিণামে দর্শকের বিচারশীল মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এই বিপর্যয়কে কখনই ন্যায্য বলে মনে করতে পারে না। নায়কের অনুচিত পরিণামে এক অদৃশ্য রহস্যময় অশুভ শক্তির ওপর দর্শক ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে নায়কের জন্য তার সমস্ত চিত্ত বিচলিত হয়ে ওঠে — নায়কের অবস্থাই দর্শকলাভ করে বসে। ফলে জাগে অনুকম্পা।

অ্যারিস্টটল ভীতি জাগ্রত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে বিপর্যয় নায়কের জীবনে দেখা দিয়েছে, তা আমাদের মতো মানুষের জীবনেও ঘটতে পারে। নিজের কথা ভেবেই দর্শক তখন ভয় পায়। এখানে দর্শকের আর বিচরণশীল মন কাজ করে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একই নায়কের শোচনীয় পরিণাম দুই ভাব উদ্বোধনেরই কারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নাট্যকার হেগেল অ্যারিস্টটলের এই মতকে মেনে নিলেন না। তাঁর মতে ট্র্যাজেডিতে দ্বন্দ্ব থাকবেই। আর নায়ককে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হতেই হবে — শাশ্বত বিচারবোধের রাজ্যে পৌঁছাতে হবে। এই শাশ্বত বিচারবোধই হল ট্র্যাজেডির মূলভাব।

সোপেনহাওয়ার হেগেলের এই মতকে অস্বীকার করে বলেছেন, জীবন অনন্ত দু:খময়, ট্র্যাজেডি দেখে মানুষ জীবনের প্রকৃত রূপটি সম্পর্কে সচেতন হয়। একটা বৈরাগ্যের শান্তভাবই চিত্তকে অধিকার

করে বসে। এটি ট্র্যাজেডির স্থায়ীভাব। দার্শনিক নীৎসে সোপেনহাওয়ারের এই মতবাদকে অস্বীকার করে ট্র্যাজেডিতে মানুষের ব্যক্তিত্বলোপের সুখাবস্থাকেই স্থায়ীভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিশ শতকে অধ্যাপক নিকল অ্যারিস্টটলের 'Pity' ও 'Fear' কে গ্রহণ করতে চাইলেন না। তাঁর মতে ভাবাবেগ খুব নিম্নস্তরের ব্যাপার। তাই এগুলি ট্র্যাজেডির মূলভাব নয়। কারণ চোখের জল ফেললেই ট্র্যাজেডি হয় না। আমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ বা পশুর ক্ষেত্রে আমাদের করুণা দেখানো চলে না তাই ট্র্যাজেডির স্থায়ী ভাব Pity' ও 'Fear' নয়।

আলোচ্য দার্শনিকদের অভিমত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবনা থেকে কোনো ট্র্যাজেডিকে দেখেছেন এবং একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই কোনো কোনো নাটকের প্রেক্ষিতে এঁদের প্রত্যেকের বক্তব্য যথার্থ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রত্যেক সার্থক ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে উক্ত অভিমতগুলি গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমাদের অভিমত হল শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি দর্শনে একই সঙ্গে কতকগুলি ভাব জাগ্রত হয়। ট্র্যাজিক অনুভূতি দর্শকের এক মিশ্র অনুভূতি। ট্র্যাজেডি নায়কের পরিণাম দেখে আমরা নিশ্চয়ই বেদনা বোধ করি। অনুকম্পা, ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, রহস্যময়তা বা দুর্জ্ঞেয়তা বোধ এবং বৈরাগ্য সব কিছু মিলে ট্র্যাজেডির অভিনয় দর্শকের চিত্তে একটা মিশ্রভাবের সৃষ্টি করে। এই রসবাদে একটিমাত্র মূলভাব, তার সহকারী ব্যভিচারী ভাবগুলির দ্বারা পুষ্ট হয়ে একটিমাত্র রসে পর্যাবসান লাভ করে। এখানে অনুকম্পার সূত্র ধরে বেদনা বা শোকভাবকে মূলভাব মনে করলে অন্য ভাবগুলি সহকারী বা ব্যভিচারী। আর সেক্ষেত্রে করুণ রসকেই ট্র্যাজেডির মূল রস বলতে হয়। কিন্তু আমরা মনে করি ট্র্যাজেডিতে অন্য ভাবগুলি সহকারী বা ব্যভিচারী নয়। সবগুলিরই গুরুত্ব আছে। সুতরাং ট্র্যাজেডির ভাব হল মিশ্রভাব।

৩০৩.৩.১১.৯ : ক্যাথারসিস

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দান কালে বহু বিতর্কিত 'Catharsis' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন যে ট্র্যাজেডি ঘটনার দ্বারা Pity ও Fear ভাবকে দর্শকচিত্তে জাগ্রত করে এবং যার ফলে 'অনুকম্পা' ও 'ভয়' ভাবের 'ক্যাথারসিস' সম্পন্ন হয় — অর্থাৎ ভাব বিমোক্ষণ হয়। পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। গিলাবার্ট মারি, অধ্যাপক নিকল প্রমুখ ব্যক্তি 'Catharsis' শব্দটিকে 'Katharsis' এই বানানে লিখেছেন এবং এর আক্ষরিক অর্থ হল বিশুদ্ধিকরণ বা ভাব বিমোক্ষণ। রেনেসাঁস যুগে ইতালিতে রবারতেল্লি মনে করেছিলেন যে ট্র্যাজেডি দেখে আমরা ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখতে অভ্যস্ত হই — এই অর্থেই অ্যারিস্টটল Katharsis শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। ইতালীয় সমালোচক জিরাল্ডিসিন্টিও মনে করেছিলেন 'ক্যাথারসিস' শব্দটি Pity ও Fear কে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে এ দুয়ের অনুরূপ ভাবসমূহকে।

কিন্তু আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেছেন 'ক্যাথারসিস' শব্দটি, চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত এবং অ্যারিস্টটল সেই বিশেষ শাস্ত্রের শব্দটি একটি উদ্দেশ্য নিয়েই প্রয়োগ করেছিলেন। অধ্যাপক ডাবলিউ. এম. ডিকসন বিষয়টি নিয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা করেছেন। 'Politics' ও 'Problem' গ্রন্থে অ্যারিস্টটল শারীরিক ও মানসিক নানা ব্যাধি ও তাদের চিকিৎসার কথা বলেছেন বলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দিক থেকে Kathersis কে বোঝাতে চেয়েছেন বলে তাঁর ধারণা।

অধ্যাপক নিকল কোনোপ্রকার নীতিঘেঁষা মতবাদ গ্রহণ করতে চাননি। তিনি বলেছেন কোনোরূপ মানসিক, ঔষধ সেবনের জন্য আমরা ট্র্যাজেডি নাটক দেখি না। অভিনয় দর্শনকালে Katharsis বা Purgation এর প্রভাবও আমরা অনুভব করি কিনা সন্দেহ।

অধ্যাপক টমসন 'ক্যাথারসিস' এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রীক ট্র্যাজেডির জন্মকথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার মতে অবদমিত আবেগ মোক্ষণের একটি উপায় হল ট্র্যাজেডি সুতরাং খুব সঙ্গতভাবেই তিনি Katharsis শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

দেখা গেল, 'Catharsis' শব্দটির অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ। তাই এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। তবে আমাদের মনে হয়, মানসিক চিকিৎসা বা নীতিকথা বা অন্যকিছু নয়। ট্র্যাজেডি অভিনয় দর্শককে এই আনন্দানুভূতির মুখোমুখী করে, দর্শকের ওই আনন্দমন চিত্তাবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল 'ক্যাথারসিস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে দেখলে 'ক্যাথারসিস' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় ট্র্যাজেডি দর্শনান্তে দর্শকের মধ্যে আনন্দময় অনুভূতি জাগরণে প্রক্রিয়া বা তার ফলাফল।

৩০৩.৩.১১.১০ : ট্র্যাজেডির শ্রেণী

অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির প্রধান চারটি রূপের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ক. কমপ্লেক্স ট্র্যাজেডি — যা ঘটনার বৈপরীত্য ও প্রত্যাভিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

খ. প্যাথেটিক ট্র্যাজেডি —যার উদ্দেশ্য কারুণ্য জাগানো। দৃষ্টান্ত Ajaxes ও Ixions.

গ. এথিক্যাল ট্র্যাজেডি — যেখানে উদ্দেশ্য নৈতিক। দৃষ্টান্ত 'Pelus' নাটক ।

ঘ. সিম্পল ট্র্যাজেডি — এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল কোনো মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছেন দৃশ্য সর্বস্ব ট্র্যাজেডির কথা বাদ দেওয়া হল, যেমন 'Phorcides' ও 'Promethes' নাটকের দৃশ্যাবলি।

অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থের চতুদর্শ পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডির আরও দুরকম শ্রেণীর কথা বলেছেন -- মেলোড্রামা ও 'হরর ট্র্যাজেডি'! অ্যারিস্টটলের পরেই ট্র্যাজেডির শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের জন

ড্রাইডেনের কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি ট্র্যাজেডিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন — ক. বিস্ময়মুখ্য খ. ভয়মুখ্য গ. শোকমুখ্য।

অষ্টাদশ শতকে বুমারেকাই বলেছেন ট্র্যাজেডির দুটি শ্রেণী — ক. নিয়তিমুখ্য ট্র্যাজেডি ও খ. বীরত্বমূলক ট্র্যাজেডি। উনিশ শতকের শেষে মোল্টন ট্র্যাজেডিকে Classical ও Romantic এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থে Tragedy -র যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক. কোরাস ও ঐক্যমুখ্য গ্রীক ট্র্যাজেডি খ. এলিজাবেথান ট্র্যাজেডি গ. হিরোয়িক ট্র্যাজেডি ঘ. হরর ট্র্যাজেডি ও ঙ. ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি।

৩০৩.৩.১১.১১ : ট্র্যাজেডির বিবর্তন : গ্রীক ট্র্যাজেডি

সুদূর অতীতে গ্রীসেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব এবং সেখানেই এর গৌরবময় সমৃদ্ধি। তিনজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার -- এস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিডিসের হাতে ট্র্যাজেডি নাটকের অসামান্য পরিণতি। অবশ্য এঁদের পূর্বে খ্রি: পূ: ষষ্ঠ শতকে মেসপিসই সর্বপ্রথম ডায়েনিসাসের কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সেকালে নাটকের রূপ ছিল গীতাত্মক।

মেসপিসের পরই এলেন এস্কাইলাস। প্রাচীন ট্র্যাজিকজগতের সার্থক রূপকার এস্কাইলাস। অসামান্য তাঁর কল্পনাশক্তি। ভাবজগৎ ও জড়জগৎকে তিনি করে তুলেছেন প্রাণবন্ত। অতুলনীয় ছিল তাঁর স্টাইল।

এস্কাইলাসের পরেই এলেন সফোক্লিস। 'Ajax', 'Antigone', 'Oedipus' ইত্যাদি তাঁর রচিত ট্র্যাজেডি। নাটকে তৃতীয় অভিনেতা যুক্ত করে নাট্যক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলার কৃতিত্ব তাঁরই। এস্কাইলাসের তুলনায় তাঁর নাটকে কোরাসের গুরুত্ব কিছু কম। কিন্তু ট্র্যাজেডি সৃষ্টির আঙ্গিকগত কৌশলে সফোক্লিসই শ্রেষ্ঠ। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি নিখুঁত ও সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর রচনায় গীতি কবিতার মৃদু ও স্নিগ্ধ সৌরভ আছে। ট্র্যাজিক আয়রণি বা নাট্যশ্লেষ প্রয়োগে তিনি খুবই নিপুণ।

ইউরিপিডিস প্রথম রিয়ালিস্টিক ও আধুনিক নাট্যকার রূপে খ্যাত। 'Suppliant', 'Women' 'Medes' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি। ইউরিপিডিসের সংশয়বাদ, প্রচলিত ধর্মমত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা; মতবাদের উদারতা, নারীসুলভ কোমলতা প্রভৃতি তাঁর নাট্যচিন্তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তাই, এস্কাইলাস ও সফোক্লিসের থেকে তাঁর রচিত নাটক ভিন্নধর্মী হয়েছে।

৩০৩.৩.১১.১২ : বাংলা নাটক ও গ্রীক ট্র্যাজেডি

বাংলা নাটকে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রভাব পড়েছে। এখানে ট্র্যাজেডি সংঘটনের পিছনে দৈবের প্ররোচনাকে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন অবিমিশ্রভাবেই, আবার কেউ কেউ দৈবশক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করেছেন। মধুসূদনের ট্র্যাজিকবোধের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে দৈবশক্তির চক্রান্তকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'কৃষ্ণকুমারী'তে কৃষ্ণার মৃত্যুদণ্ড বা 'পদ্মাবতী' তে পদ্মবতীর ভাগ্য বিড়ম্বনা দৈব চক্রান্তেরই যেন প্ররোচনা। 'মায়াকানন' তো আদ্যন্ত দৈবশক্তির লীলাক্ষেত্র।

'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকটির ট্র্যাজেডি, গ্রীক ট্র্যাজেডির কথাই স্মরণ করায়। 'গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে জনার জীবনে, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' এর কর্ণের জীবনে, আলমগীরের জীবনে এই ধরনের ট্র্যাজেডিই এসেছিল -- রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকে সুপ্রিয়ের মৃত্যু, বিসর্জন-এ জয়সিংহের মৃত্যু-এ সকলের পশ্চাতেও দৈবের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রেরই হাত আছে বলে বোধ হয়।

৩০৩.৩.১১.১৩ : এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডি

এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম পর্বে নাট্যকারদের মনে মধ্যযুগীয় চেতনা ও ষোড়শ শতকীয় রেনেসাঁস উত্তর মানবিক চেতনা দুয়ের মিশ্র প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। এ সময়ে ট্র্যাজেডির ধারণাটিকে সূত্রাকারে বলা যায় — ক. ট্র্যাজেডি কোনো মহৎ ব্যক্তির পতন খ. হোরেস ও সেনেকার প্রভাবে ধারণা হল, নাটক হবে পাঁচ অঙ্কের। গ. নাটক লেখা হবে পদ্যে। ঘ. নাটকে নীতি থাকবে। এছাড়া এই যুগের রোমান্টিক নাট্যকারেরা ক্লাসিক নাট্যকারদের পৃথক বলে ঘোষণা করেছেন। এই যুগের প্রধান নাট্যকারেরা হলেন —

৩০৩.৩.১১.১৩.১ : মার্লো

ম্যাকিয়াভিলির আদর্শে 'অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রিস্টোফার মার্লো' 'Tambarlain', 'Dr Faustus' ইত্যাদি নাটক উপহার দিলেন। নাটকগুলিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট এবং পরবর্তীকালে ঠিক এই পথে কেউ অগ্রসর হননি। তাঁর নায়কেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। Faustus একজন সাধারণ ডাক্তার। এছাড়া মার্লো নীতিকথার প্রশ্নটি মানলেন না। তাঁর নাটকের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়— ক. Blank verse - এর সার্থক প্রয়োগ তাঁর পূর্বে কোনোও নাট্যকার করতে পারেননি। খ. ড: ফস্টাসের মধ্যে তিনি অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন তবে মার্লোর নাট্যগঠনও শিথিল। নায়কের একছত্র প্রাধান্য। স্ত্রী চরিত্র থাকলেও ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়নি।

৩০৩.৩.১১.১৩.২ : শেক্সপীয়র

মার্লোর পরেই শেক্সপীয়র। তাঁর ট্র্যাজেডি বলতে প্রধানত 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' ও 'কিং লীয়র' এই চারটি নাটককে বোঝানো হয়। প্রত্যেক ট্র্যাজেডির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করার মতো । 'ওথেলো'

ষড়যন্ত্রমূলক, "লীয়র" নিষ্ক্রিয়-চরিত্রের ট্র্যাজেডি। হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ পৃথক ধরনের ট্র্যাজেডিগুলি বুদ্ধির সঙ্গে অনুভূতির বা চরিত্রের কোনো বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুভূতির দ্বন্দ্বে অপরূপ। হ্যামলেটে প্রতিহিংসাবৃত্তি ও প্রেমের সঙ্গে নৈতিক দ্বিধা, ওথেলোতে অতিতীব্র আবেগময় প্রেমের সঙ্গে ঈর্ষার লীয়রে অহমিকার সঙ্গে কোমলতর বৃত্তির, ম্যাকবেথে উচ্চাশার সঙ্গে বিবেকজাত অনুভূতির দ্বন্দ্ব লক্ষনীয়। অধ্যাপক নিকল শেক্সপীয়রের নাটকের আরো দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন — ক. অলৌকিক শক্তির প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া। খ. পরিবেশের সঙ্গে নায়কের একটা বিশেষ সম্পর্ক।

৩০৩.৩.১১.১৪ : বীরত্বমূলক (Heroic) ট্র্যাজেডি

রেস্টোরেশন যুগে জন ড্রাইডেন এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডির সূচনা করেন। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলির অতিরঞ্জিত রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। এখানেও ভিতর ও বাহির উভয়ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব আছে। এর নায়ক চরিত্রের মহনীয়তা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য — তবে তা কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না।

৩০৩.৩.১১.১৫ : ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি (Horror Tragedy)

ওয়েবস্টার ও ফোর্ডের প্রচেষ্টায় 'ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি' একটি নূতন শ্রেণী এক সময় বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক কমেডির মিল লক্ষ করা যায়।

অধ্যাপক নিকল এই ট্র্যাজেডির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক. রঙ্গমঞ্চে চরিত্রের মাধ্যমে নয় ঘটনার মাধ্যমেই আবেদন সৃষ্টি করা হয়। খ. এতে ভয়-ভাবের উপাদান বেশি থাকে গ. বাহ্য উপাদানগুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঘ. নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও তা মুখ্য হয়ে ওঠে না। জন ওয়েবস্টারের 'The Dutches of Mulfi' এই ধরণের ট্র্যাজেডি।

৩০৩.৩.১১.১৬ : পারিবারিক ট্র্যাজেডি (Domestic Tragedy)

অধ্যাপক নিকল পারিবারিক ট্র্যাজেডিকে উচ্চমূল্য দিতে চান না, কারণ ট্র্যাজেডিতে নায়কের যে সমুন্নত মহিমা তা এই শ্রেণীর ট্র্যাজেডিতে থাকে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ট্র্যাজেডি প্রচুর লেখা হয়েছে। এলিজাবেথীয় যুগে 'Arden of Feresham' এর নাটক দিয়েই পারিবারিক ট্র্যাজেডি সূচনা হয় এরপর টমাস হে উডের 'The English Traveller' টমাস ডেকারের 'The Shoemaker's Holiday,' প্রভৃতি পারিবারিক ট্র্যাজেডির ধারাকে সমৃদ্ধ করে।

৩০৩.৩.১১.১৭ : নিউ ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি

অষ্টাদশ শতকে ফরাসী ক্লাসিক্যাল নাটকগুলি রচিত হয়। কর্নেই ও রাসিন ছিলেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কর্ণেই-এর নাটক এককালে বাস্তবতা ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধির জন্য প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর রচিত 'Horace', 'Cinna' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডি। নাট্যকার রাসিন তাঁর যুগের প্রবণতাকে অনেকটা ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্যিক ভাষার সৌন্দর্য, চরিত্রের মুখে যুগোচিত ভাষা, এপিগ্রাম প্রয়োগের নৈপুণ্য। চরিত্রপ্রকাশক পদ্য ভাষা তাঁকে সমকালীন ফ্রান্সে প্রিয় করে তুলেছিল। প্রেমকেই তিনি ট্র্যাজেডির মূল উপজীব্য করেছিলেন। তাঁর 'Andromache', 'Britannicus' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডি।

অষ্টাদশ শতকে ইতালিতে নব্য ক্লাসিক্যাল শ্রেণির নাটক লিখে আলফিয়েরি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর নাটকে রাজনৈতিক উদ্দীপনার অনুপ্রবেশও লক্ষনীয়। 'Cleopatra', 'Antigone' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ ট্র্যাজেডি।

৩০৩.৩.১১.১৮ : আধুনিক ট্র্যাজেডি

এরপরেই আসে আধুনিক ট্র্যাজেডির ধারণা। এ যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্রমোন্নতি মানুষের অনেক অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করল। প্রেম এখন হয়ে উঠেছে যৌনচেতনারই একটু উর্ধ্বায়ন অথবা প্রজাতিরক্ষার একটা জৈব প্রেরণা মাত্র। জোসেফ উড্‌ক্রাচ — 'The Tragic Fallacy'-তে আধুনিক কালের এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরে বললেন যে বর্তমান যুগে ট্র্যাজেডি রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও অল্প হলেও এযুগে ট্র্যাজেডি লেখা হচ্ছে। এই ধরণের রচনায় ভগবান ও মানুষের মাহাত্ম্য অবলুপ্ত হচ্ছে। প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে সাধারণ বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যক্তি। এই কালের প্রধান নাট্যকারেরা হলেন—

৩০৩.৩.১১.১৯ : ইবসেন

ইবসেনের মধ্যে 'বুর্জোয়া ট্র্যাজেডি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। তাঁর 'Ghosts' নাটকটি আধুনিক যুগের পত্তন ঘটিয়েছিল। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা -- 'Pillars of Society', 'A Doll's House', 'The Wild Duck' ইত্যাদি। 'Ghosts' নাটকটিতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক মারাত্মক ব্যাধির কারণে একজন পুত্র কিভাবে তার পিতার গুণপ্রাপ্ত হয়েছিল তারই বর্ণনা রয়েছে। তৎপ্রসঙ্গে তার মাতার পুত্রকে নিয়ে তীব্র জীবনযন্ত্রণার পরিচয় রয়েছে।

৩০৩.৩.১১.২০ : স্ট্রিন্ডবার্গ ও হাউপ্ট ম্যান

স্ট্রিন্ডবার্গ ও হাউপ্ট ম্যান দুজনেই অতিবাস্তবধর্মী ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন। চরিত্রের অজ্ঞাত অবচেতন মনের প্রবণতার দিকে স্ট্রিন্ডবার্গ গুরুত্ব দিলেন। ‘মিস জুলিয়া’-তে তিনি দেখালেন স্নায়বিক রোগগ্রস্ত একটি মেয়ের ট্র্যাজেডি। হাউপ্ট ম্যানের ‘উইভার্স’ নাটকের নায়ক আবার একটা শ্রেণীর প্রতিনিধি।

৩০৩.৩.১১.২১ : চেকভ

চেকভ নাটকের ক্ষেত্রে নিজস্বতা নিয়ে এলেন। তাঁর রচিত ট্র্যাজেডিগুলির নায়ক সবসময় একটি ঐক্যবদ্ধ দল। জীবনের হতাশা, অবক্ষয় বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার চিত্র তিনি ট্র্যাজেডিগুলিতে দেখিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলির উচ্চাশা বা কামনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর কোনো কিছুর ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মনে করতেন আশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদ দুইই মানুষের ক্ষতি করে। তিনি প্রকৃত অর্থে বাস্তবধর্মী লেখক।

টি.এস. এলিয়ট কাব্যনাট্যের রচয়িতা হলেও কিছু ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন। তাঁর ‘Murder in the Cathedral’ নাটকটি গ্রীক ধর্মীয় পরিবেশে রচিত হলেও আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত।

৩০৩.৩.১১.২২ : সার্ত্রে

Existentialist tragedy-র রূপ আমরা দেখতে পেলাম সার্ত্রের মধ্যে। এই মতবাদে মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ভগবান বা প্রকৃতি কারুর দ্বারাই মানবিক মূল্য সমর্থিত হয় না। মানুষ যা করে তার পূর্ণদায়িত্ব তারই, সে পরিবেশের দাস নয়। প্রকৃতপক্ষে সার্ত্রের নাটক এই মতবাদের আলোকেই লিখিত এবং তা বাস্তবধর্মী। রচনাশৈলীর দিক থেকে তাঁর কতকগুলি নাটক খাঁটি বাস্তবধর্মী। আর কতকগুলিতে উৎকল্পনার (Fantancy) প্রাধান্য থাকলেও সেগুলি রোমান্টিক নয়। তাঁর ‘No Exit’, ‘The Files’ ও ‘The Victors’ প্রসিদ্ধ নাটক।

৩০৩.৩.১১.২৩ : ও'নীল

আমেরিকার ও'নীলও বাস্তবধর্মী ট্র্যাজেডি লিখেছেন। তাঁর ‘The Iceman Cometh’ তেমন সফল নয়। কিন্তু ত্রয়ী নাটক ‘Mourning becomes Eleotra’ তে তিনি গ্রীক কিংবদন্তীকে আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত করে চমৎকার রূপ দিয়েছেন।

৩০৩.৩.১১.২৪ : বাঙলা ট্র্যাজেডি

নিকল ট্র্যাজেডির যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন আমাদের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তা ঠিক প্রযোজ্য হবে না। আমাদের মনে হয় বাঙলা ট্র্যাজেডিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা সমীচীন যথা —

ক. ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি

খ. সামাজিক বা পরিবারিক ট্র্যাজেডি

গ. পৌরাণিক ট্র্যাজেডি

ঘ. সমস্যামূলক ট্র্যাজেডি

পাশ্চাত্য ট্র্যাজেড্রির তুলনায় আমাদের বাংলা ট্র্যাজেডির বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত অনুজ্জ্বল তবু ট্র্যাজেডিশূন্য নয়। বাঙালি নাট্যকাররা নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করতে গিয়ে বেশকিছু ট্র্যাজেডি নাটক লিখেছেন। পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডির আদর্শে সেগুলির বিচার করলে হয়তো দোষত্রুটির শেষ থাকে না। কিন্তু বাঙালির জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য ও তার স্বভাব ধর্মের কথা স্মরণে রেখে যদি পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি বিচারের কঠোর আদর্শকে কতকটা শিথিল করে নেওয়া হয়, তাহলে কিছু সার্থক ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত চয়ন করা সম্ভব। শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি নাটকে আমরা দেখি চরিত্রই ব্যক্তি বিশেষের নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়। শেক্সপীয়রের এই আদর্শ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের সুনামের প্রতি লোভ, অভিমান ও নিজের ওপর আত্মবিশ্বাসহীনতাই মূলত তার ট্র্যাজেডির কারণ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান'— নাটকে সাজাহানের অতিরিক্ত পুত্রবাৎসল্য, 'নূরজাহান' নাটকে নূরজাহানের অতিরিক্ত উচ্চাশা; যোগেশ চৌধুরীর 'রাবণ' নাটকে রাক্ষস রাবণ ও ব্রাহ্মণ রাবণ — এর দেহ আত্মার প্রবল সংঘর্ষ, বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে মধুসূদনের অপরিমেয় উচ্চাশা ও মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসার সংঘাত প্রভৃতি শেক্সপীরীয় ট্র্যাজিডির আদর্শঅনুসারী বিষয়।

৩০৩.৩.১১.২৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'ট্র্যাজেডি' কাকে বলে? ট্র্যাজেডির উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল? উদাহরণসহ ট্র্যাজেডি নাটকের শ্রেণীবিভাগ করো।

২। ট্র্যাজেডির নায়কের লক্ষণসমূহের পরিচয় দাও। দ্বৈত নায়ক সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। বাংলায় রচিত তিনটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। বাংলা ট্র্যাজেডি নাটকে ট্র্যাজেডির বিভাজনগুলি উপযুক্ত উদাহরণসহ নির্দেশ করো।

৫। ট্র্যাজেডি আনন্দ দেয় কেন? নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

একক - ১২

কমেডি; প্রহসন ও অতিনাটক

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১২.১ : ভূমিকা

৩০৩.৩.১২.২ : কমেডি ও তার নানা রূপ

৩০৩.৩.১২.৩ : বাংলা কমেডি

৩০৩.৩.১২.৪ : কমেডির সংজ্ঞা ও তার লক্ষণ

৩০৩.৩.১২.৫ : ড্রেম ও বিশুদ্ধ কমেডি

৩০৩.৩.১২.৬ : কমেডি ও সমাজ

৩০৩.৩.১২.৭ : ট্র্যাজেডি ও কমেডি

৩০৩.৩.১২.৮ : কমেডির শ্রেণি

৩০৩.৩.১২.৯ : রোমান্টিক কমেডি

৩০৩.৩.১২.১০ : ব্যঙ্গার্থক কমেডি

৩০৩.৩.১২.১১ : আচারমূলক কমেডি

৩০৩.৩.১২.১২ : মার্জিত বা শোভন কমেডি

৩০৩.৩.১২.১৩ : ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি

৩০৩.৩.১২.১৪ : কমেডি ও বাংলা নাটক

৩০৩.৩.১২.১৫ : ফার্স বা প্রহসন

৩০৩.৩.১২.১৬ : বাংলা ফার্স

৩০৩.৩.১২.১৭ : ট্র্যাজি কমেডি

৩০৩.৩.১২.১৮ : সিদ্ধান্ত

৩০৩.৩.১২.১৯ : ট্র্যাজেডির উদ্ভব কথা

৩০৩.৩.১২.২০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৩.১২.২১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.১২.১ : ভূমিকা

ইংরেজি নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক নাটক ও অন্যান্য দেশের নাটকের ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন ও মেলোড্রামার নানা রূপ আমরা পাই। আবার একাঙ্কিকার এবং একস্ট্রাভাগেঞ্জার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকের উপরোক্ত রূপগুলি ভিন্ন পরিচিতি বহন করে। একস্ট্রাভাগেঞ্জা ঠিক নাটকের বিচারে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেবল দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই তার তাৎক্ষণিক ব্যবহার। নাট্যতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় এইসব বিষয়গুলি কিভাবে আসে তার কিছুটা পরিচয় বর্তমান অংশে পাওয়া যাবে।

৩০৩.৩.১২.২ : কমেডি ও তার নানা রূপ

মানব জীবন সুখদু:খের লীলাক্ষেত্র, জীবনে যেমন ব্যথা আছে, দু:খ আছে; তেমনই আছে হাসি ও আনন্দের প্রফুল্লতা জীবনের এই হাল্কা মেজাজের প্রসন্নতার, সুরটি কমেডিতে ফুটে ওঠে। এখানে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা জীবনের অনিবার্য বিনষ্টি মানুষকে পীড়িত করে না। হাসিখুশির আবরণে জীবন এখানে মোটের উপর স্বপ্নমধুর।

সুদূর অতীতে গ্রীসের অ্যারিস্টোফেনিসের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কমেডির ধারা অব্যাহত হয়েছে। যুগে যুগে কালধর্মে জীবনের মূল্যবোধ ও রূপবৈচিত্র্যের সঙ্গে কমেডির বিবর্তন ঘটছে। তাই মিলনান্ত হলেও জীবনের গুরুগম্ভীর দিককেও সে উপেক্ষা করছে না। এককথায় কমেডির সংজ্ঞা দেওয়া আজ কঠিন। কমেডির জন্ম, লক্ষণ, সংজ্ঞা প্রবণতা, শ্রেণি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করলেই এর জগৎ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হবে।

৩০৩.৩.১২.৩ : বাংলা কমেডি

দেশীয় যাত্রা, সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজি নাট্যাদর্শের সম্মিলিত প্রেরণা বাংলা নাটক সৃষ্টির মূল। বাংলা নাটকের প্রথম পর্যায়ে পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বনে নাটক রচনা সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের রূপরীতির দিকে নাট্যকারদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। 'প্রণয়' কে মূল উপজীব্য করে তারাচরণ শিকদার সর্বপ্রথম রোমান্টিক ট্রাজি কমেডি 'ভদ্রার্জুন' লেখেন। এটি প্রথম বাঙালি নাট্যকারের কমেডি রচনার প্রয়াস।

৩০৩.৩.১২.৪ : কমেডির সংজ্ঞা ও তার লক্ষণ

অ্যারিস্টটল তাঁর ‘Poetics’ গ্রন্থে কমেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন “As for Comedy it is (as has been observed) an imitation of man worse than the average; Worse however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous, which is a species of the ugly” অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কমেডির লক্ষণগুলি হল —

ক. কমেডি হল সাধারণ মানুষের থেকে নিম্নতর মন্দ মানুষের জীবনবৃত্তের অনুকরণ।

খ. এখানে ‘মন্দ’ বলতে মানুষটি যে নানা রকম দোষে দোষী একথা বলা হচ্ছে না।

গ. শুধুমাত্র তার একটি দোষের কথাই বলা হচ্ছে যা হাস্যোদ্দীপক এবং কুৎসিতেরই প্রকারভেদ মাত্র।

ঘ. অ্যারিস্টটল ‘Ridiculous’ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এর অর্থ ভ্রান্তি বা অঙ্গবিকৃতিও করা যেতে পারে এবং তা কখনই ক্ষতিকারক নয়।

-অ্যারিস্টটল অ্যারিস্টোফেনিস বা তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের কমেডিগুলি দেখেই এ কমেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন। তবে অনেকক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন।

অ্যারিস্টটল কমেডির আয়তনকে নির্দিষ্ট করে দেননি। ‘পোয়েটিক্স’ এ তিনি জানিয়েছেন, কমেডির শেষে কোনো মৃত্যুর ব্যাপার থাকবে না, পরম শত্রুও বন্ধুভাবে মঞ্চ ত্যাগ করবে। কমেডির বৃত্তে যদি বিরোধ ঘনীভূত হয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শত্রুতার পরিমন্ডল সৃষ্টি করে, তাহলেও সেই আবহাওয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে মিলনান্ত সমাপ্তি হয়। সুতরাং ব্যক্তি আক্রমণমুক্ত; অপেক্ষাকৃত নিম্ন চরিত্রাশ্রয়ী, বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক মিলনান্ত বৃত্তের রূপায়নই কমেডি।

অ্যারিস্টোফেনিসের পরে মিনান্ডার ও তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারদের কমেডি রচনায় রোমান্টিক প্রেম ধরা দিয়েছে। আরও পরবর্তীকালে রোমের প্লটাস মিনান্ডারের রচনা ও প্রাচীন ‘বারলেস্কে’র বিদ্রূপ ও হাস্যকে মিশ্রিত করে কমেডি লেখেন। এর অনেক পরে শেক্সপীয়র তাঁর অপরূপ রোমান্টিক কমেডি ও ট্রাজি কমেডি নিয়ে আবির্ভূত হলেন ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে, বেন জনসন এলেন বিদ্রূপাত্মক কমেডি নিয়ে। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে এলেন বিশ্বখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের, ইংলন্ডে জন ড্রাইডেন, স্যাডওয়েল, জর্জ এথিরীজ প্রমুখ। ফলে কমেডির রূপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে লাগল। একে একে সৃষ্টি হল হিরোইক কমেডি ও মেলোড্রামার।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের মনোভঙ্গির কথা মনে রেখে রিচার্ড ডুপ্লে সার্থক কমেডির পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন যে জগৎ সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণের ফল হল কমেডি। কমেডির রচয়িতা হবেন তীক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। নিরাসক্তভাবে তিনি মানুষের ভুলত্রুটি লক্ষ করবেন। মানুষের এই ভুলত্রুটির জন্যে তাঁর চিত্তে কোনো গভীর বেদনা থাকবে না।

একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থের 'Comedy' অধ্যায়ে কমেডির নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির কথা বলেছেন :

ক. কমেডিতে সাধারণত কোনো নায়ক চরিত্র থাকে না।

খ. কোনোও বিশেষ শ্রেণীর একটি বা কতকগুলি টাইপ চরিত্রই এখানে প্রধান।

গ. সাধারণত একটি বা একাধিক হাস্যস্পদ চরিত্রের পাশাপাশি আরও কয়েকটি সাধারণ চরিত্র থাকে যার ফলে অসঙ্গতিগুলি পরিস্ফুট হয়।

ঘ. কমেডিতে থাকে সমাজের একটা বিশেষ দিকের চিত্র।

ঙ. ফরাসী দার্শনিক বেগর্সর সূত্র অনুসরণ করে নিকল বলেছেন কমেডির দর্শকরা অনুভূতিশীল নয়।

চ. কমেডির সাধারণ বিষয় প্রেম এবং এখানে চিরন্তন পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ দেখানো হয়।

জ. কমেডিতে বাস্তবতার পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

ঝ. এর উপসংহারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ নিষ্পন্ন হওয়ার কথা বা মিলনদৃশ্য থাকে।

সার্থক কমেডি রচনা করতে হলে একজন নাট্যকারকে বৃত্ত, চরিত্র ও সংলাপ এই তিনদিকেই সমান নজর দিতে হয়। রোমান্টিক কমেডি ও ট্রাজি কমিডিগুলিতে সুস্পষ্ট ও সংহত বৃত্ত থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর কমেডির বৃত্ত অনেক শিথিল। রোমান্টিক কমেডি গঠনের একটা নির্দিষ্ট ছক আছে। নাট্যকার্যের সূচনায় নায়ক - নায়িকার অনুরাগের বীজ বপন করা হয়। পরে একটা বাধা তাদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে ওঠে এবং বৃত্তটি তখন অনেক দ্বন্দ্বাত্মক রূপ নেয়। বাংলায় মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' অমৃতলালের 'খাসদখল" রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি কমেডিতে বৃত্ত গঠনের এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। অ্যারিস্টোফেনিসের নাট্যবৈশিষ্ট্যের মধ্যে ব্যঙ্গ, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, বাস্তবতা, হাস্যোদ্দীপকতা প্রভৃতি পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ কমেডি লেখকদের মধ্যে নানভাবে গৃহীত হয়েছে। তাঁর প্রয়োগপদ্ধতি এঁদের হাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতর হয়েছে, তাঁর বহু উপাদানের মধ্যে এঁরা যে সবগুলি গ্রহণ করেছেন তা নয় — কারও মধ্যে একটি, আবার কারও মধ্যে একাধিক লক্ষণ সূক্ষ্মতর হয়েছে।

৮.২.৪.৬ : ড্রেম ও বিশুদ্ধ কমেডি

'ড্রেম' নামে এক শ্রেণীর নাটকের উদ্ভব ঘটে ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে। দিদেরোর বুর্জোয়া নাটকের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভিক্টর হুগোর রোমান্টিক ড্রেমের আশ্রয়ে এবং সমকালীন বেশ কিছু নাট্য চর্চার সূত্রে শ্রেণীটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

ফরাসী দার্শনিক বেগর্স ড্রেম ও কমেডির পার্থক্য নির্ণয় প্রসঙ্গে যে মূল্যবান কথাটি বলেছেন, সেকথা

স্মরণে রেখে অধ্যাপক নিকল ড্রেমকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন (ক) মিলনান্ত ড্রেম (খ) পুরোপুরি সুখদায়ক উপসংহার নয় এমন ড্রেম (গ) গুরুগম্ভীর বৃত্তের সঙ্গে কমিক উপাদানের মিশ্রণ সম্বলিত 'ড্রেম-কমিডি'। এগুলির দৃষ্টান্ত যথাক্রমে The Road to ruin, The Merchant of Venice ও Secret Love। কিন্তু এগুলিকে যথার্থ কমেডি বলা যায় না।

ইবসেনের A Doll's House বার্নার্ড শ এর 'Widower's Houses' প্রভৃতি আধুনিক কালের ড্রেম, কমেডি নয়। আমাদের মতে ড্রেমকে ট্র্যাজেডি বা কমেডি কোনো 'শ্রেণীভুক্ত' করা যায় না। আধুনিক কালের মানুষের জটিল সমস্যা রূপায়ণে ড্রেমের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাভাষায় অনেকেই এই ধরনের সমস্যামূলক নাটক লিখেছেন, এগুলোকে ড্রেম বলা যেতে পারে।

৩০৩.৩.১২.৬ : কমেডি ও সমাজ

হাস্যরস কখনও একক মানুষের উপভোগ্য বিষয় নয়। বহু মানুষের সাহচর্যে এর সার্থকতা। 'হাসি এক সামাজিক বৃত্তি এবং বহুজন সম্মিলিত আসরই হল তার প্রকৃত ক্ষেত্র। হাসি কোনো এক ব্যক্তি বা টাইপ চরিত্রকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয় অন্যান্যরা উপভোগ করে। সমাজের কোনো সুস্থ কৃতী স্বাভাবিক ও শক্তিশালী মানুষকে কেন্দ্র করে সামাজিক অপর মানুষ হাসে না। সমাজে মানুষের জীবনযাপনের, আচার আচরণের যে সাধারণ বিধি বা আদর্শ প্রযোজ্য আছে তা থেকে চ্যুত অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর মানুষই হাসির পাত্র হয়। বিশুদ্ধ কমেডিতে এইসব চরিত্র একটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে সামাজিক হাসি অসামাজিক ব্যক্তি বা শ্রেণীকে আশ্রয় করে রচিত হয়।

স্যাটায়ারমুখ্য বা ব্যঙ্গাত্মক কমেডিতে হাস্যরসিকের সমাজচেতনা খুব প্রবল। সমাজের সমকালীন দোষ ত্রুটিগুলিকে উৎখাত করবার গূঢ়তর অভীপ্সা অ্যারিস্টোফেনিস, মলিয়ের, বার্নার্ড শ বা প্রমুখ ব্যক্তিদের রচনায় দুর্লক্ষ নয়। বাংলা হাস্যরসাত্মক নাটকে সমসাময়িক সমাজের নানা দোষত্রুটি, সামাজিক মানুষের স্খলন-পতন সংশোধনের অভিপ্রায় লক্ষ করা যায়। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যধর্মের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

৩০৩.৩.১২.৭ : ট্র্যাজেডি ও কমেডি

ট্র্যাজেডি ও কমেডি — নাটকের এই দুই প্রধান শ্রেণী জীবনের দুই ভিন্ন অথচ একান্ত সত্যরূপের প্রকাশ। ট্র্যাজেডিতে জীবনের অন্ধকারময় দিক এবং কমেডিতে আলোকিত দিক ফুটে ওঠে। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি ও কমেডির মধ্যে বিভিন্ন কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তী নাট্যতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে বিভিন্ন ভেদ সূত্র। ট্র্যাজেডি ও কমেডির এই ভেদরেখা নিম্নরূপ :

(ক) প্রাচীন গ্রীসে উর্বরাশক্তির বৃদ্ধিকল্পে ডায়োনিসাস দেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুয়েরই সৃষ্টি হয়েছিল। ডায়োনিসাসের মৃত্যুযন্ত্রণা ও মৃত্যুর কাহিনি ট্র্যাজেডির বিষয়

ছিল, তাই ট্র্যাজেডি তে ব্যথাহত আশাহীন জীবনের ব্যর্থতার চিত্র প্রাধান্য পেত, আর দেবতার পুনর্জীবন ও বিবাহের বিষয়কে আশ্রয় করা হত কমেডিতে, ফলত আনন্দেই তার পরিণতি। আর এই দুই মিলে জীবনচক্রের পূর্ণতা। অর্থাৎ ট্র্যাজেডিতে যার শেষ, কমেডিতে তার সূচনা।

(খ) ট্র্যাজেডিতে বৃত্তের গতিপথ মোটের উপর সরলরৈখিক; কমেডির এই গতিপথ বৃত্তাকার বা চক্রাকার। একস্থান থেকে শুরু হয়ে পুনরায় সেই স্থানে ফিরে আসে।

(গ) ট্র্যাজেডির আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে, তা সমস্ত অন্তরদেশকে আলোড়িত করে; কিন্তু কমেডির সঙ্গে আমাদের চিত্তদেশের যোগ নিতান্তই ক্ষীণ। এখানকার হাসি-আনন্দ-গান সব কিছুই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপার অর্থাৎ ট্র্যাজেডি অনুভূতিগ্রাহ্য, কিন্তু কমেডি বুদ্ধিগ্রাহ্য।

(ঘ) ট্র্যাজেডির নায়ক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন করে -- সে কি ছিল, কি করেছে এবং কেন তার এ পরিণতি এ সম্পর্কে সে সচেতনই থাক বা অবচেতনই থাক। তার পরিণাম সম্পর্কে প্রথম থেকেই নাট্যঘটনা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দর্শকদের কৌতূহলী করে রাখে। এই ধরনের উৎকণ্ঠা, মানসিক আলোড়ন, ঘটনার তরঙ্গ ও ঘাত-প্রতিঘাত কমেডিতে নেই। প্রধান পাত্রপাত্রীদের পরিণাম এখানে তেমন অনিশ্চিত নয়।

(ঙ) ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য মূলত অভিজ্ঞতা ও স্বতোলব্ধ জ্ঞানের পার্থক্য। মানুষ ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে কিংবা ব্যক্তিগত স্বপ্নপূরণের জন্য অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু সে অভিজ্ঞতা থেকেই জানে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা; কিন্তু স্বতোলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের উৎকেন্দ্রিকতা, খেয়ালিপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে লাভ নেই। বলাবাহুল্য প্রথমটির চিত্র থাকে ট্র্যাজেডিতে আর দ্বিতীয়টির চিত্র ফুটে ওঠে কমেডিতে।

(চ) ট্র্যাজেডিতে থাকে জীবনের চিরন্তন, বিশ্বজনীন রূপ এবং কমেডিতে একটি বিশেষ কালের সামাজিক ও পরিবর্তনশীল রূপ। অবশ্য শ্রেষ্ঠ কমেডিতে মানুষ বা সমাজের যে ত্রুটি তুলে ধরা হয় তারও একটা চিরন্তন আবেদন থাকে।

(ছ) কমেডিতে থাকে বহু চরিত্রের সমাবেশ। ট্র্যাজেডিতে কিন্তু নায়ক চরিত্রেরই সর্বব্যাপী প্রাধান্য। তার বেদনা ও অন্ত:হীন দু:খের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাট্যকার।

(জ) ট্র্যাজেডির গঠন দৃঢ়পিনদ্ধ, কমেডির গঠন তুলনামূলকভাবে শিথিলবদ্ধ। ট্র্যাজেডিতে থাকে ব্যক্তিচরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিতে শ্রেণীচরিত্রের প্রাধান্য; ট্র্যাজেডিতে কাহিনির রসপরিণাম ভয়ানক ও করুণ। কমেডির লঘুচালের কাহিনির রসপরিনাম হাস্যরসাত্মক এবং মনমুগ্ধকর।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুয়েতেই নায়ক বাধা বা দ্বন্দ্বের আবর্তে পতিত হয়। কিন্তু ট্র্যাজেডির বাধা দুস্তর ও অনতিক্রম্য, কমেডির বাধা তুলনামূলক ভাবে শক্তিহীন ও সহজেই অতিক্রম্য।

৩০৩.৩.১২.৮ : কমেডির শ্রেণী

অধ্যাপক এ. নিকল কমেডিকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন— ক. ফার্স, খ. কমেডি অব রোমান্স, গ. কমেডি অব হিউমার্স, ঘ. কমেডি অব ম্যানার্স, ঙ. কমেডি অব ইন্ট্রিগ্। তাঁর কমেডি অব রোমান্সের একটি উপবিভাগ রোমান্টিক ট্রাজি-কমেডি এবং কমেডি অব ম্যানার্সের একটি উপবিভাগ জেন্টল কমেডি। শেক্সপীয়র ও তাঁর পরবর্তী যুগের কমেডিগুলির দিকে লক্ষ রেখে নিকলের এই শ্রেণীবিভাগ। অবশ্য 'World Drama' তে অ্যারিস্টোফেনিসের কমেডিকে 'ওল্ড কমেডি' বা প্রাচীন কমেডি অ্যারিস্টোফেনিস ও মিনান্ডারের মধ্যবর্তীকালের গ্রীক কমেডিকে 'মধ্যবর্তী কমেডি' ও মিনান্ডারের কমেডিকে 'নব কমেডি' বলেছেন, প্লুটাস ও টেরেন্সের রোমান কমেডিগুলিও এক 'নব কমেডি' তবে এগুলিকে 'ক্লাসিকাল কমেডি' ও বলা হয়। মলিয়েরের কমেডিগুলি 'কমেডি অব সোসাইটি' বা 'হিউমান কমেডি', 'কমেডি অব ম্যানারস', 'কমেডি অব ম্যাটায়ার' প্রভৃতি নামে পরিচিত। এছাড়া আছে ব্রাইট কমেডি, কমিক কমেডি, হিরোয়িক কমেডি, সিরিয়াস কমেডি প্রভৃতির ধারণা।

৩০৩.৩.১২.৯ : রোমান্টিক কমেডি (Comedy of Romance)

কমেডির সকল শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্য ও অভিনয় মূল্যে রোমান্টিক কমেডিই শ্রেষ্ঠ। শেক্সপীয়রের কমেডিগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীর কমেডির লক্ষণ নির্মিত হয়েছে। শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডিতে প্রেক্ষাপটে দৃশ্যসন্নিবেশ প্রবণতা রয়েছে 'Midsummer Night's Dream' এর পটভূমি এথেন্সের নিকটবর্তী এক অরণ্য। প্রকৃতি চরিত্রচিত্রণেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। কতকগুলো চরিত্র অতিমাত্রায় রোমান্টিক বাকিগুলি বাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রবণতা এর প্রধান গুণ। প্রেমই রোমান্টিক কমেডির প্রধান বিষয়। নায়ক-নায়িকার মধ্যে অনুরাগ সঞ্চার, মিলনের পথে বাধা, পরিশেষে সংকট মুক্তি ও মিলন এর মুখ্য উপজীব্য। বস্তুত: একটা রোমান্টিক পটভূমি বা রোমান্টিক উপাদান সম্বলিত কোনো কমেডিতে যদি সংবেদনশীল চরিত্র চিত্রণের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাহলে তা রোমান্টিক কমেডিতে উন্নীত হয়। অপেক্ষাকৃত এই শিথিল আদর্শে মিনান্ডারের কমেডি, প্লুটাস ও টেরেন্সের কমেডি, রোমান্টিক কমেডি, আরও একটু শিথিল আদর্শে দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা', অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। তবে ধারাবাহিকভাবে শেক্সপীয়রের আদর্শে এ নাটক লেখা হয়নি।

৩০৩.৩.১২.১০ : ব্যঙ্গার্থক কমেডি (Comedy of Humours)

কমেডি অব হিউমার্স বা ব্যঙ্গার্থক কমেডির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বেন জনসন। মানুষের মেজাজ বা স্বভাব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে দেহস্থ চারপ্রকার রসের সমানুপাতিক মিশ্রণে। এগুলি হল humour, choleric, philegmatic ও Melanocholic। এদের মিশ্রণ যদি সমানুপাতিক না হয়, তাহলেই মানুষ হবে উৎকেন্দ্রিক। মানুষের এই উৎকেন্দ্রিকতাকে অবলম্বন করে রচিত যে কমেডি তাকে প্রথম রসটির নাম অনুসারে জনসন নাম দিলেন 'কমেডি অব হিউমার্স'। এই ধরনের কমেডির বৈশিষ্ট্যগুলি হল— ক. এ কমেডিতে উৎকেন্দ্রিক বা ছিটগ্রস্ত মানুষের বিদ্রূপ করা হয়। খ. রোমান্টিক কমেডির সঙ্গে এর বড় পার্থক্য বাস্তবতায়। অবিশ্বাস্য রোমান্সের রাজ্য থেকে কমেডি সাধারণ মানুষের দরজায় এসে পৌঁছেছে। গ. এ কমেডিতে শ্রেণীচরিত্রগুলিকে অতিরঞ্জিত করা হয় বলে বিদ্রূপের সুবিধে। অধ্যাপক নিকল তাই এগুলিকে ব্যঙ্গাত্মক কমেডি বলেছেন। খ. সাধারণত কৃপণ, ভণ্ড, দাম্ভিক, মনুষ্যদ্বেষী চরিত্রকে এতে আশ্রয় করা হয়। ঙ. এ কমেডি গঠনের একটা রীতি আছে। চরিত্র নিজের কোনো বদ্ মতলবকে হাসিল করার জন্য সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে। আয়োজন যখন সাফল্যের সীমা স্পর্শ করতে যাচ্ছে, তখন অন্য একটি ষড়যন্ত্রের ব্যর্থ কৌশলের সাহায্যে তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয় ও স্বস্তিজনক উপসংহার আনা হয়। পাশ্চাত্যের বেন জনসন, মলিয়ের, বার্নার্ড শ ও আমাদের বাংলা সাহিত্যে অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধরনের কমেডি লিখেছেন। অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট' ও 'বৌমা' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম' এর দৃষ্টান্ত।

৩০৩.৩.১২.১১ : আচারমূলক কমেডি (Comedy of Manners)

যে কমেডিতে সমকালীন সমাজের আচার আচরণ, রীতিনীতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি হাস্যকরতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত তা কমেডি অব ম্যানার্স। এখানে টাইপ চরিত্রের উৎকেন্দ্রিকতা দেখানো হয় না-সমাজ থেকে চরিত্র যেসব ত্রুটি, বিচ্যুতি আহরণ করে, তারই জন্য তারা এখানে হাস্যাস্পদ, তাদের ত্রুটি চরিত্রগত নয়। যেমন লোভ মানুষের একটা চরিত্রগত দোষ, তাই এখানে দেখানো হয় না। এই ধরনের কমেডিতে ব্যঙ্গ থাকলেও তা আক্রমণাত্মক নয়, অত্যন্ত মৃদু।

চমৎকার উইট প্রয়োগের সুযোগ আচরণমূলক কমেডিতে বেশি থাকে। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তু ও চরিত্রের কৃত্রিমতা। এতে বাস্তবতা থাকলেও তার চিত্র প্রতিফলিত হয় কৃত্রিমভাবে। অবশ্য বাংলায় কোনো আচরণমূলক কমেডি নেই। তবে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', অমৃতলাল বসুর 'বাবু'তে এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

৩০৩.৩.১২.১২ : মার্জিত বা শোভন কমেডি (Gentele Comedy)

তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজের কৃত্রিম ভাব, চাল চলন ও রীতিনীতিকে নিয়ে পরিহাসমূলক যে রচনা তার নাম মার্জিত বা শোভন কমেডি। আচারমূলক কমেডির পৃষ্ঠপোষকগুলি পরিবর্তিত হয়ে 'শোভন কমেডি'-র জন্ম দেয়। The Modern British Drama তে বলা হয়েছে এখানে মানুষ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম রূপের পরিচয় থাকে। কোনো গ্রাম্যতা থাকে না। সবকিছুকেই ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হয়। কৃত্রিম ভাবপ্রবণতার আবরণে অবৈধ প্রেম আচ্ছাদিত থাকে উইট বা বাক্‌চাতুর্য্যে। সাধারণ মানুষের কোনো প্রবেশাধিকার এখানে নেই। ষড়যন্ত্র থাকবে ভাবাবেগের মোড়কে। অমৃতলালের 'ব্যাপিকাবিদায়' কে এই শ্রেণীর কমেডির প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়।

৩০৩.৩.১২.১৩ : ষড়যন্ত্রমূলক কমেডি(Comedy of Intrigue)

ফ্লেচারের সময় থেকে অষ্টাদশ শতক জুড়ে ইংলন্ডে এই কমেডির ধারাটি বহমান ছিল। ছদ্মবেশ, ষড়যন্ত্র ও বৃত্তের জটিলতা থেকেই এখানে হাসির সৃষ্টি হয়। ঘটনা পরম্পরার নিপুণ সজ্জায় ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় ফ্লেচারের এই শ্রেণীর কয়েকটি কমেডি উল্লেখযোগ্য। ভুলের উপর ভিত্তি করে এর বৃত্ত আকর্ষণীয় হয়। ফার্সের মতো ঘটনানির্ভর হলেও ফার্সের সমগোত্র নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র ও ঘটনার জটিলতা মিলিয়ে হাসির সৃষ্টি করে। উইট, হিউমার বা স্যাটায়ার - এর প্রয়োগ এখানে নেই বললেই চলে। রামনারায়ণের 'উভয়সঙ্কট', অমৃতলালের 'চোরের উপর বাটপাড়ি' দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' প্রভৃতিকে ষড়যন্ত্রমূলক কমেডির অন্তর্ভূক্ত করা চলে।

৩০৩.৩.১২.১৪ : কমেডি ও বাংলা নাটক

বাঙালি নাট্যকারগণ হাস্যরসাত্মক রচনায় অধিকতর উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন। পাশ্চাত্য কমেডি অনুযায়ী বাংলা কমেডিও হাস্যরসাত্মক লঘু কমেডি ও গম্ভীর ভাবের গুরু কমেডি এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। বাংলা ভাষায় পৌরাণিক নাটকগুলি প্রায় সবই গম্ভীর রসাত্মক ও মিলনান্তক। এগুলিকে ট্রাজি কমেডি বলাই শ্রেয়। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকটি বাংলা ভাষায় প্রথম কমেডি। পরবর্তীকালে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটক দুটিকে গুরু কমেডি বলা যেতে পারে, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মিশ্র কমেডি।

দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী' ও 'কমলে কামিনী' তিনটিই রোমান্টিক লঘু কমেডি। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক 'মায়াবসান' গুরু কমেডি।

অমৃতলালের ‘খাসদখল’ ও ‘নবযৌবন’ লঘু রোমান্টিক কমেডি রবীন্দ্রনাথের ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’, ‘চিরকুমার সভা’, ‘শেষরক্ষা’ লঘু কমেডি। রবীন্দ্রোত্তর যুগে প্রমথনাথ বিশীর ‘ঋণংকৃত্বা’, ‘ঘৃতং পিবেৎ’, মনোজ মিত্রের ‘অবসন্ন প্রজাপতি’ লঘু কমেডি।

৩০৩.৩.১২.১৫ : ফার্স বা প্রহসন

ফার্সের জন্ম হয় সপ্তদশ শতকে পাশ্চাত্য দেশে; তবে এই সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বেই। মধ্যযুগে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল এর বীজ। ল্যাটিন শব্দ Farcio শব্দটি থেকে ইংরেজি Farce শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ কোনো কিছু ঠেসে ভর্তি করে স্ফীত করে তোলা। মধ্যযুগের গীর্জায় প্রার্থনামূলক অনুষ্ঠানে কিছু ব্যাখ্যার অতিরিক্ত অংশ সংযোজনকে অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশকেই বলা হত ফার্স। পরে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে দাঁড়াল, ‘পূর্ব প্রস্তুতিহীন এক ধরণের ভাঁড়ামি’। আরও পরে হল ‘এক শ্রেণীর নাট্যরচনা যাতে নিম্নশ্রেণীর কৌতুক ও অতি রঞ্জিত সংলাপ থাকবে। অধ্যাপক নিকল তিন অঙ্কের অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের রচনাগুলিকে ‘ফার্স’ নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ফার্স হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত, হাস্যকর নাট্যরচনা যাতে অতিরঞ্জিত, অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ থাকবে। চরিত্র বিশ্লেষণ এখানে থাকবে না। প্লট বা বৃত্তের সংহত বিন্যাসও থাকবে না। হৈ হুল্লোড় ধস্তাধস্তি চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে অট্টহাস্যের জগৎ সৃষ্ট হবে এতে।

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রহসনের প্রাচুর্য রয়েছে। সংস্কৃত ‘দৃশ্যকাব্য’-এর অন্তর্গত দশ রূপকের অন্যতম হল প্রহসন। ভরত প্রহসনকে শুদ্ধ এবং সংকীর্ণ বা মিশ্র এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ ‘বিকৃত’ প্রহসন নামে আরও একটি বিভাগ করেছেন। ভরতের মতে শুদ্ধ প্রহসনে উচ্চস্তরের চরিত্রই প্রধান হবে, তবে নীচপাত্রও থাকতে পারে। আর সংকীর্ণ প্রহসনে চরিত্র হবে বিট-চেট, বেশ্যা বা ধূর্ত, নপুংসক। বিশ্বনাথের মতে, প্রহসনের বিষয়বস্তু হবে কবিকল্পিত। এ হল নিন্দনীয়ের নিন্দাখ্যান। তিনি বলেন, শুদ্ধপ্রহসনে নায়ক হবে ‘ধৃষ্ট’। নায়ক ধৃষ্ট না হলে তা হয় সংকীর্ণ প্রহসন। প্রহসনের আয়তন সর্বদা এক অঙ্কের হবে। তবে মতান্তরে সংকীর্ণ প্রহসন দুই অঙ্কেরও হতে পারে।

পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত আলংকারিকদের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উভয় দেশের আলংকারিকেরা এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রয়াতন নাট্যকে নিম্নমানের বলেছেন ও হাসিসৃষ্টি এর প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তবে একথাও স্মরণ রাখতে হবে পাশ্চাত্য ফার্স ও সংস্কৃত প্রহসনকে এক মনে হলেও এ দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

৩০৩.৩.১২.১৬ : বাংলা ফার্স

বাংলা ভাষায় ফার্সের অপ্রতুলতা নেই, তবে অধিকাংশ বাংলা ফার্সই শিল্পের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর, এখানে

হাস্যরস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের নানা দোষত্রুটির সমালোচনা করতে নাট্যকার সংযম ও শালীনতার পরিচয় দিতে পারেননি। এত ব্যর্থতার মাঝেও মধুসূদনের সাফল্য কিন্তু ঈর্ষার যোগ্য। তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই দুখানি নাটিকার একটিতে একশ্রেণীর 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের আচরণকে ও অন্যটিতে প্রাচীন সমাজের ভণ্ড জমিদার শ্রেণীর নীচতা, স্বার্থপরতা ও লাম্পট্যকে আক্রমণ করা হয়েছে। তবে রচনার গুণে নাটিকাদুটি ঠিক ফার্সের মধ্যে সীমিত থাকেনি, কমেডিরও কিছু কিছু লক্ষণ এতে প্রাধান্য পেয়েছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'উভয়সংকট', 'চক্ষুদান', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এই তিনখানি প্রহসনে সপত্নীবিদ্বেষ, পুরুষের লাম্পট্য, বহুবিবাহ প্রভৃতিকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে, তবে শিল্প সার্থকতা আসেনি।

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাইবারিক' প্রহসন জাতীয় রচনা। এই রচনাগুলি চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যে সংলাপ প্রয়োগে নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'হঠাৎনবাব', 'দায়েপড়ে দারগ্রহ', হিতেবিপরীত', 'অলীকবাবু' প্রভৃতি উল্লেযোগ্য প্রহসন। এখানে রচনারীতিতে ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের প্রভাব রয়েছে।

বাংলায় প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু। তৎকালীন সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দোষত্রুটিগুলিকে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাতে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। 'বাবু', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'গ্রাম্যবিভ্রাট', 'ডিসমিস' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে না পারলেও তিনি কতকগুলি প্রহসন লিখেছিলেন। 'বিরহ', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'পুনর্জন্ম' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। গিরিশচন্দ্র ফার্স লেখার চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। 'য্যায়সা কি ত্যায়সা', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতিতে সামান্য দক্ষতার পরিচয় আছে।

এছাড়া বাংলা প্রহসনের ধারায় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'টোটকা', 'জুজু', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমি' অমরেন্দ্রনাথ রায়ের 'থিয়েটার' 'চাবুক' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলি ভিন্ন জাতের ও আস্বাদনেও ভিন্ন। উত্তর-রবীন্দ্রপর্ব বাংলায় যেসব প্রহসন লেখা হচ্ছে তা থেকে নতুন কোনো সম্ভাবনার দ্বারোন্মোচন হচ্ছে না।

৩০৩.৩.১২.১৭ : ট্র্যাজি কমেডি

মানব জীবনে হাসি এবং কান্না, বিষাদ ও আনন্দ নিত্য সহচর। এক হিসেবে এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। জীবনে কান্না ও বিষাদের তীব্রতা হ্রাস পেলেই হাসি ও আনন্দের রাজ্য শুরু হয়। আবার হাসি

ও আনন্দের সীমা পেরিয়ে কান্নার জগত। জীবনে হাসি ও কান্না হাত ধরাধরি করে রয়েছে। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, ট্র্যাজেডির মধ্যে কমিক উপাদান বা কমেডির মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদানের মিশ্রণ হতেই পারে। অতীত থেকেই সৃষ্টি হয় ট্রাজি কমেডির।

রেনেসাঁস যুগে ইতালির নাট্যতত্ত্ববিদরা ট্র্যাজেডির সুখসমাপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকে তাই ট্রাজি কমেডিকে একটি স্বতন্ত্র নাট্য শ্রেণীরূপে স্বীকৃতি জানানো হয়। নাট্যকার পিয়েরি কর্নেই এর "The cid" নামক নাটকটিকে ফরাসি অ্যাকাডেমি ১৬৩৮-এ 'ট্রাজি কমেডি' বলে ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক নিকল তাঁর 'The Theory of Drama' গ্রন্থে ট্রাজি কমেডির স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে নাট্যকার তাঁর মূল অভিপ্রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনভাবে কমেডির উপাদান মিশ্রিত করতে পারেন :

ক. ট্র্যাজিক চরিত্র বা ঘটনার সঙ্গে বৈপরীত্য সৃষ্টি করার জন্য। এখানে কমিক উপাদান হাসির তরঙ্গে আমাদের আন্দোলিত করে না।

খ. কখনো কখনো ট্র্যাজেডিতে কমিক উপাদান সংযোজিত হয় 'রুদ্ধশ্বাস' বেদনাময় ট্র্যাজিক আবহাওয়ার মাঝখানে একটুখানি স্বস্তির অবসর সৃষ্টির জন্য।

গ. ট্র্যাজেডি হল, মূলবৃত্তের সমান্তরাল এবং কখনো বা মূলবৃত্ত নিরপেক্ষ একটি কমিক-বৃত্ত সৃষ্টির জন্য।

অধ্যাপক নিকল ট্রাজি কমেডির তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন—

ক. ট্রাজি কমেডি — যেখানে ট্র্যাজিক ও কমিক উপাদান প্রায় সমান সমান। দৃষ্টান্ত — The Chargeling.

খ. ট্রাজি কমেডি — যেখানে একটি কমিক উপকাহিনি মূল ট্রাজিক কাহিনির অধীন। দৃষ্টান্ত — The English Traveller.

গ. ট্রাজি কমেডি — যেখানে কমিক কাহিনিই মুখ্য এবং ট্র্যাজিক উপাদান বা উপকাহিনি তার অধীন। দৃষ্টান্ত- The Winter's Tale.

৩০৩.৩.১২.১৮ : সিদ্ধান্ত

ট্রাজি কমেডি অবশ্যই ট্র্যাজেডি ও কমেডির মিশ্রণজাত রচনা। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ ট্র্যাজিক বৃত্ত ও একটি সম্পূর্ণ কমিক বৃত্ত জুড়ে দিলেই ট্রাজি কমেডি হয় না। ট্রাজি কমেডিতে দুই ধরনের কাহিনি থাকলেও তা শেষপর্যন্ত একটি কাহিনিতে পরিণত হয় এবং কাহিনিতে নায়ক বা নায়িকার জীবনে ঘোরতর অন্ধকার নেমে এলেও শেষ পর্যন্ত সেই ট্র্যাজিক বেদনা দূরীভূত হয়। বিপদজাল থেকে মুক্ত করে নায়ক-নায়িকাদের এমন

একটি স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়, যাতে দর্শকের মন থেকে ট্র্যাজিক সম্ভাবনার সুরটি মিলিয়ে যায়। মোট কথা ট্রাজি কমেডি হল মূলত কমেডি, তবে কমিক কমেডি নয়। এ আসলে গুরু কমেডি ও ট্র্যাজিক ঘটনার সমন্বয়ে এক নূতন ধরনের প্রজাতি। শেক্সপীয়রের 'The Winter's Tale', 'The Merchant of Venice' ও 'The Tempest' এই জাতীয় রচনা।

সপ্তদশ শতকে ব্লেমন্ট ও ফ্লেচার ট্রাজি কমেডিকে ইংলন্ডে বেশ জনপ্রিয় করে তোলেন, 'বাংলা নাটকে মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী'- কে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'রক্তকরবী' গুরুগম্ভীর ট্রাজি কমেডির নিদর্শন।

সুতরাং, ট্রাজি কমেডি শ্রেণীর রচনা ট্র্যাজেডি ও কমেডির মিশ্রণে সৃষ্ট হলেও তা দুয়ের সহযোগে জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপার কিছু নয়। এখানেও নাট্যকারকে একটি পরিকল্পনা স্থির করে নিয়ে দুই ভিন্ন উপাদান সমন্বয় করতে হয় যাতে তা ট্র্যাজেডিও না, অবিমিশ্র কমেডিও না, হয় একটি নূতন প্রজাতি।

৩০৩.৩.১২.২০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। একশ বছরের বাংলা থিয়েটার -- ড. শিশির বসু

২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস -- ড. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও একশ বছরের নাটক -- ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস -- ড. দর্শন চৌধুরী

৫। বাংলা নাটকের ইতিহাস -- ড. অজিত কুমার ঘোষ

৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস -- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭। নাট্যতত্ত্ব বিচার -- ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৮। সংলাপ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ — অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০৩.৩.১২.২১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। কমেডির সংজ্ঞা দাও। ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য নিরূপণ করো।

২। কমেডির বিভিন্ন শাখার পরিচয় দাও।

৩। প্রহসন কাকে বলে ? কমেডি ও প্রহসনের পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। প্রহসনের সংজ্ঞা দাও। প্রহসনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। একটি সার্থক প্রহসন সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

৫। মেলোড্রামা বা অতিনাটক বলতে কি বোঝো সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

নাট্যতত্ত্ব

একক - ১৩

একাঙ্কিকা, প্লট, চরিত্র, সংলাপ, সংগীত

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৩.১ : উদ্দেশ্য

৩০৩.৪.১৩.২ : ভূমিকা

৩০৩.৪.১৩.৩ : একাঙ্ক নাটক

৩০৩.৪.১৩.৪ : প্লট

৩০৩.৪.১৩.৫ : নাট্যচরিত্র

৩০৩.৪.১৩.৬ : নাট্যসংলাপ

৩০৩.৪.১৩.৭ : নাট্যসংগীত

৩০৩.৪.১৩.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৩.১ : উদ্দেশ্য

নাটক যৌথ শিল্প (Multiple Art) -- তাই তার রচনার ক্ষেত্রে শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ে নাট্যকারের প্রচুর জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বিশিষ্ট নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা নাটকের প্লট, চরিত্র, দ্বন্দ্ব, রস, পরিণতি প্রভৃতির কৌশল সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তার একটাই উদ্দেশ্য, সেগুলি অনুসরণ করে নাট্যকাররা যাতে, সঠিক আঙ্গিকে এমন সৃষ্টি করতে পারেন যাতে পাঠক ও দর্শকরা আকৃষ্ট হতে পারে।

৩০৩.৪.১৩.২ : ভূমিকা

প্রাচ্য নাট্যতত্ত্ববিদ্‌রা সংস্কৃত ভাষায় নাটকের Form বা গঠন, তার রস, Critics, Fallacy সম্পর্কে যা বলেছেন তার অনেকটাই পাশ্চাত্য নাট্যতত্ত্ববিদ্ আরিস্টটল, হুডোল, পিকক্, এগরি, নিকল, ব্রাজল ও লুকাসের নাট্যকৌশল ভাবনার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মেলে, তাই ভরতমুনি, বিশ্বনাথ কবিরাজ, ধনঞ্জয় প্রমুখের নাট্যতত্ত্ব জানা জরুরী। এখানে নাট্যবিষয় ভাবনার দিক থেকে নাট্যতাত্ত্বিকদের নির্দেশ আমরা বুঝে নিতে চাই।

৩০৩.৪.১৩.৩ : একাঙ্ক নাটক

আমাদের বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক একটি নতুনতর নাট্য আঙ্গিক হিসেবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি নতুন হলেও কালের বিচারে একাঙ্ক কিন্তু অভিনব কোনো নাট্যআঙ্গিক নয়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এর বহুল প্রচলন ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যেও এই ধরনের নাটকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রাচীন ওইসব নাটকগুলির তুলনায় আধুনিক একাঙ্ক নাটকের একটা নিজস্বতা নিশ্চয়ই আছে। সংস্কৃতে একাঙ্ক শ্রেণীর নাটকের মুখ্য অভিমুখ ছিল আয়তনের সংক্ষিপ্ততার দিকে। অর্থাৎ ব্যায়োগ মানেই আকারে সংক্ষিপ্ত হবে, সংক্ষিপ্ততাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এমন ধারণা প্রাধান্য পেত। আধুনিক একাঙ্ক নাটকও আয়তনে সংক্ষিপ্ত; কিন্তু সংক্ষিপ্ততা এর প্রধান নাট্যবৈশিষ্ট্য নয়। ভাব প্রকাশে, চরিত্র নির্মাণে, ভাষা ব্যবহারে একাঙ্ক নাটকের এমন একটা নিজস্বতা আছে যা দেখে সাধারণ পঞ্চাঙ্ক নাটকের তুলনায় এর স্বাতন্ত্র্যকে সহজে চিনে নেওয়া যায়। একাঙ্ক নাটকের এই স্বাতন্ত্র্য নির্দেশক বৈশিষ্ট্য, যেমন —

- একটিমাত্র বিষয় বা ঘটনা সংস্থানের সংহত নাট্যরূপায়ণ কাহিনী উপকাহিনীর শাখায়িত বিস্তার এখানে থাকে না।
- চরিত্রের বিকাশ, চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতির বিস্তৃত প্রকাশ দেখানোর সুযোগ এখানে নেই, অথচ তার প্রয়োজন আছে। স্বভাবত নাট্যকার সংহত পরিসর ভাব ও ভাষার তীক্ষ্ণতা বজায় রেখে চরিত্রকে যতদূর সম্ভব আলোকিত করেন।
- ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা প্রভৃতির প্রভাবে এখানে ঘনীভূত নাট্যরসের জাগরণ ঘটে। অন্যদিক থেকে বলা যায় সংক্ষিপ্ততা ও বাহুল্যবর্জনের অত্যধিক প্রবণতা এর কেন্দ্রসংহতিকে অনিবার্য করে তোলে, অনেকটা গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের মতো।
- গীতিকবিতা বা ছোটগল্পের ভাষা ঠিক সাধারণ সমাজভাষার মত হয় না। সংকেত, প্রতীক, চিত্রকল্পের ব্যবহারে এর যেমন একটা নিজস্বতা তৈরি হয়, একাঙ্ক নাটকের ভাষাতেও সেই নিজস্বতা থাকে। এ ভাষার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ঘটনা ও চরিত্রের গভীর পর্যন্ত আলোকিত হয়।

- ❑ দ্রুতগতি কাহিনী ও বিকাশশীল চরিত্রের সহযোগে কোনো একাঙ্কিকায় ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণের সূত্রে নাটকীয় শীর্ষবিন্দুকে চূড়ান্ত করে তোলার বিষয়টি অনেকটা 'a monument's of monument'
- ❑ আধুনিক একাঙ্কিকার অন্যতম প্রধান লক্ষ একালের মানুষের চিত্ত সংকট বা ট্র্যাজিক অনুভূতিকে ধরা। আর তার জন্য প্রয়োজন কোনো একটি নির্দিষ্ট মানুষের জীবনবৃত্তের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ। শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা মাত্র তাই সাধারণভাবে চরিত্রআশ্রয়ী হয়।

একাঙ্ক নাটকের পরিসর যে একটি অঙ্কের মধ্যে সীমায়িত থাকবে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হয়েছে এর সময়সীমা নিয়ে। কতক্ষণ স্থায়ী হবে একটি একাঙ্ক নাটকের অভিনয়। চল্লিশ মিনিট? এক ঘন্টা? কারও মতে এই সময়সীমা হওয়া উচিত আরও বেশি, কারও মতে আরও কম। আমাদের মনে হয় এইরকম নিক্তিতে সময় মাপার প্রবণতা ঠিক নয়। সংহতপরিসর একাঙ্ক নাটকের অত্যাবশ্যক শর্ত। এই অত্যাবশ্যক শর্ত মেনে রচিত কোনো নাটকে অভিনয়ে যত সময় লাগা প্রয়োজন ঠিক তত সময়ই দিতে হবে। বাইরে থেকে সময় বিষয়ে বাধা নিষেধ আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই। তবে যেহেতু অভ্যন্ত সংক্ষিপ্ত আয়তনের সেইহেতু এর অভিনয়ে একঘন্টার বেশি সময় লাগবে না বলে ধরেই নেওয়া যায়।

জার্মান নাট্যকার লেসিড্ এর 'Dil Judan' প্রথম উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক। বাংলায় এই ধারার নাটকের মধ্যে রয়েছে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', বনফুলের 'শিককাবাব' প্রভৃতি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শুধু বাংলা সাহিত্যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাসাহিত্যে এখন একাঙ্ক নাটকের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আর এর মূলে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রনির্ভর মানুষের জীবনানুভূতি।

৩০৩.৪.১.৪ : প্লট

নাটকের কাহিনী বিন্যাস বা Plot নির্মাণ নিয়ে অ্যারিস্টটল থেকে নিকল, লুকাস, সাধন কুমার ভট্টাচার্য, অজিতকুমার ঘোষ প্রমুখরা নানা মন্তব্য করেছেন। এইসব মতামত একত্র করলে আমরা কয়েকটি গ্রহণযোগ্য সূত্র পাই। সেগুলি হল :

১. নাট্যকাহিনীকে সবসময়ই গতিময় (action) হতে হবে।

২. নাট্যপ্লটে যতবেশি দ্বন্দ্ব (conflict) থাকবে ততই দর্শক খুশি হবে।

৩. নাটকের Plot - এর তিনটি স্তর — begining, middle এবং end.

৪. প্লটের সাফল্য নির্ভর করে নাট্যপরিণতির যথাযথ উপস্থাপনায়। একে বলা হয় Dramatic excellence.

৫. নাট্যপ্লটের উৎকর্ষতা নির্ভর করে কাহিনীর ত্রয়ী ঐক্যের উপর : Unity of Time, Unity of Place, Unity of Action.

৬. মূল প্লটের সঙ্গে এক বা একাধিক Sub-Plot বা উপকাহিনী থাকতে পারে। Unity of Action বলতে শুধু একমুখীন কাহিনী জরুরী নয়।

পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস ও দেববিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং সংস্কারাগত ধর্মাদর্শ পৌরাণিক নাটকের গঠনকর্মে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। নাটকের গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার নয়, কেননা নাটকের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘকালীন ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করতে হয়। নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, দর্শকের রসানুভূতিতে ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটি আঘাত সৃষ্টি যেন না করে। ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে নাট্যকাহিনী গঠনে অসুবিধা জাগার অবকাশ কম। কেননা এই শ্রেণীর নাট্যকারদের হাতে প্রাপ্ত উপকরণের মধ্যে নাটকীয় জটিলতা সৃষ্টির প্রভূত সুযোগ বর্তমান। পৌরাণিক নাটকে একদিকে যেমন সীমিত উপকরণ অন্যদিকে তেমনি উপকাহিনী - যোজনা এবং নূতন চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সামাজিক নাটকে কাল-ঐক্য (Unity of Time) এবং স্থান-ঐক্য (Unity of Place) প্রায় সর্বত্র রক্ষিত, ঐতিহাসিক নাটকে 'কালাতিক্রমণ' দোষ মাঝে মাঝে ঘটলেও নাটকের তীব্র গতিময় ঘটনা সেই ত্রুটিকে প্রায়শ চাপা দিয়ে দেয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এই ত্রুটি ঘটে এবং নাট্যকারের পক্ষে তা অস্বীকার করার পথ থাকে না। পুরাণ-কথিত কাহিনীর এই ত্রুটি এড়িয়ে গেলে আবার পৌরাণিক নাট্যাদর্শের বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

ঐক্যবিধি সম্পর্কে T.S.Elliot বলেছেন — I believe they (unities) will be found highly desirable for the drama of the future., ... The Unities do make for intensity.

— 'Selected Essays', New York, 1932, P - 58.

পুরাতন নাট্যধারায় পঞ্চসন্ধির মধ্য দিয়ে নাট্যপ্লট গঠিত হত। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে পৌঁছে দেখা গেলো নাট্যকাহিনী যতোই ব্যপ্ত হোক না কেনো, উপকাহিনী কমল এবং কাহিনী হল একমুখী। প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' কেমন সফল দেখা যাক্।

গ্রামনির্ভর নাটকটির কাহিনীবৃত্তের শুরু অবশ্য শহরের দৃশ্য দিয়ে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, কিছু Flash back -এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই শহরে বন্ধুর গৃহে যখন রহিম প্রবেশ করে তখনই জানা যায় পড়া ছেড়ে চাষের কাজে রহিমের অনিবার্য আত্মনিয়োগের কারণ, তার পারিবারিক সুখ, মহিম ও রহিমের বাল্যের মধুর সম্পর্কের কথা। এ দৃশ্যে মহিম যখন তাকে দিলরুবা উপহার দেয়, তখন রহিমের উক্তি --

'দিলরুবা নামেও ভাল, কামেও ভাল। বাইজের আওয়াজ ঠিক মাইনবেরের মতও।' এই সংলাপের একাংশ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ, দারিদ্র্যের কারণেই রহিমের সংগীত আরাধনা এতদিন রুদ্ধ হয়েছিল। নাটকটির নামকরণের যাথার্থ্য বুঝতে হলেও এই দৃশ্যের উদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয়।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। এটিকে আমরা অ্যারিস্টটল অনুসারে Rising action -এর উদারহণ হিসেবে ধরতে পারি। গ্রামে ফিরে এসে রহিম হাকিমের গরু খোঁয়াড়ে পাঠাল। এভাবেই উভয়ের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সূচনা। বোঝা যাচ্ছে, দুজনের মধ্যে ধারাবাহিক সংঘর্ষের পটভূমি তৈরি হচ্ছে ---

হাকিম ঃ মাথা তোর অনেকদিন হয় গরম হইছে।

রহিম ঃ কিসে গরম দেখিলেন?

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। রহিম ও ফুলজানের মনোরম সংলাপের মধ্যে হাস্যরসের ছোঁয়া লেগেছে রহিমের কিনে আনা ফুলজানের জুতো পরা ঘিরে। এখানে দ্বন্দ্বময় নাটকে কিছুটা Comic relief -এর ছোঁয়া পায় দর্শক। কিন্তু এই পরিবেশের তার অকস্মাৎ ছিঁড়ে যায় যখন হঠাৎ চুরির সাজানো প্রসঙ্গটি জানা যায়। ইতিমধ্যে গোবিন্দ ও শ্রীমন্ত ফিরে এসে রহিমের শক্তি বাড়িয়েছে। দৃশ্যটিতে সাজানো চুরির অভিযোগের বিরুদ্ধে রহিমের প্রতিবাদ লক্ষ করার মত :

রামেশ্বর ঃ ঘরের ভিতর মাচার নীচে মাটির উপর ছিল হুঁজুর ... দেখা যাইতেছিল।

দারোগা ঃ (ভদ্রলোককে) দেখুন তো?

ভদ্রলোক ঃ (দেখে) এটা আমাদের জিনিস।

(রহিমুদ্দী হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে হাকিমুদ্দীর গলা টিপে ধরল)

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী দর্শকদের হাকিমুদ্দীর কাছারিঘরে পৌঁছে দিয়ে তার ভণ্ডামির মুখোশ খুলতে সাহায্য করেছেন। বর্তমানে অসুস্থতার কারণে রহিম তীব্র অর্থসঙ্কটে পড়েছে, যার ফল অনাহার। দৃশ্যটিতে প্রেসিডেন্ট ও হাকিমের গোপন পরামর্শ সেকালের সামাজিক-রাজনৈতিক জগতে গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধার নগ্নচিত্র রয়েছে। দৃশ্যটি Dramatic crisis -এর পূর্বাভাস।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য। খবর আসে জোতদার হাকিমুদ্দীর ধানকল লুঠের; নাট্যদর্শকরা টান টান উত্তেজনায় আরও দেখে হাকিম-প্রেসিডেন্টের গোপন চুক্তির সর্বনাশা রূপ। এটিকে climax -এর বিন্দুতে পৌঁছানোও বলা যায়। রহিমুদ্দীর স্বপ্নের মতো খণ্ড খণ্ড ভাবনা এবার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের নিয়ে একটা সম্ভাব্য লড়াই রচনা করবে বলে ভাবা গিয়েছিল।

Climax -এর ধারা চলবে ফুলজান ও বসিরকে ফুলজানের ফুফার বাড়িতে রেখে আসায়। আবার একই দৃশ্যে ফুলজানকে ফিরিয়ে এনে নাট্যপ্লটের গতি দ্রুত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। Climax তখনই শীর্ষচূড়ায় পৌঁছোল যখন (১) ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির বসিরকে কিছুতেই রহিম লঙ্গরখানায় নিয়ে যেতে পারল না (২) ফুলজান একা লঙ্গরখানায় গেল এবং প্রত্যাখ্যাতা হয়ে ফিরে এল। এবার রহিম অন্তর্দ্বন্দ্বে সত্যিই বিপর্যস্ত, ফুলজানের প্রতি বসিরের প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি তার প্রমাণ --

ঘুম গেইছে। ভোখে আউলী গেইছে না তাতেই। জাগি উঠি যখন খাবার চাইবে তখন? --- হা! খোদা!

Climax -এর শেষ পর্যায়ে রহিম হঠাৎ যেন ভ্রান্তির রাজ্যে চলে গেল। সে Error of Judgement -এর শিকার হল। ফুলজানকে তালাক দিয়ে, বসিরকে নিয়ে, সদরের পথে চলল। দর্শকের কানে ফুলজানের আর্তনাদও ঘুরতে লাগল --

ঘর আর মোর তো নয়।

অধিকাংশ গণনাট্যকারই মন্বন্তর -এর সর্বনাশা রূপ কিভাবে গ্রামের গরিব কৃষিজীবী মানুষদের সংসার তছনছ করে দিয়েছিল তার মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন। তুলসী লাহিড়ীর বর্তমান নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, Falling action -এর শুরু। রহিম আবার কলকাতায় বাল্যবন্ধু মহিমের বাড়ি এসে একটা চাকরি করছে, দেখা যাচ্ছে। তবে সে বেশিদিন শহরে থাকতে পারেনি। দ্বিতীয় দৃশ্যেই তার গ্রামে ফেরা। তবে এই দুই দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিশেষ একটা এগোয়নি। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে হঠাৎ কাহিনী ঘটনার ঘনঘটায় সংঘর্ষমুখী হয়ে উঠল। এই নাট্যপরিণতি বা Cathersis অংশটি এরকম -- বসিরের অসুস্থতা; কানা ফকিরকে

সাময়িকভাবে বিয়ে করে রহিমের ঘরে ফুলজানের ফিরে আসার তীব্র কামনা। দুটি বিষয় অতি দ্রুত বর্ণনার পর এল শেষ crisis! রহিম হাদিস-এর নির্দেশ মানতে রাজী নয়। তাই কানা ফকিরের সঙ্গে অর্থ নিয়ে দরকষাকষি। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম একটি প্রতিবাদী মুসলমান যুবককে পেলাম যে হাদিস-এর খেলাপ করে, স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছাড়তে চেয়েছে। গণচরিত্রের এই নতুন ভাবনা নাট্যকারের গভীর আশার প্রকাশ। কিন্তু ফুলজানের আপত্তি ও অনেকটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারীর বাস্তব প্রকাশ, যদিও সে ভাবেনি তার এই আপত্তিতে বিপর্যস্ত রহিম শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে।

'ছেঁড়া তার' নাটকের শেষে রহিমের পারিবারিক জীবনের যে তার ছিঁড়ে গেল, তারও একটা শিক্ষা আছে। এর আগেও আর একটি তার ছিঁড়ে ছিল, অনাহারে রহিমের মায়ের মৃত্যুতে। কিন্তু রহিমের এই যে মৃত্যু, তা নিশ্চয়ই হাকিমুদ্দীর সঙ্গে তার পরাজয় বলে নয়, বরং বলা যায় হাকিমদের বিরুদ্ধে সে সব সময়ই প্রতিবাদ করে গেছে। গ্রাম-নগরের মধ্যে একটা সেতু গড়ে, গণচরিত্রের প্রগতিশীল বিকাশের পরিচয় রেখেছে।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ব্রেখটই প্রথম দৃশ্যাঙ্গিকের বদল ঘটালেন, কিন্তু তার ফলে প্লটের বিন্যাস আহত হয়নি। প্লট সম্পর্কে ফ্রেতাগ, লুকাস, ব্রাডলে প্রমুখরা যে সব তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন তা অ্যারিস্টটল-এর বক্তব্য ও সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধি, -- কোথাও নস্যাৎ করা যায়নি।

৩০৩.৪.১৩.৫ : নাট্যচরিত্র

সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন ধারায় গঠনশৈলীর তুলনায় নাট্যধারার গঠনশৈলী যথেষ্ট জটিল। ঔপন্যাসিক, কবি অথবা প্রাবন্ধিক তাঁদের বর্ণিত বিষয়কে নিজ মননের আলোকস্পর্শে বর্ণনা করে যান, কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব-রীতি অনুসরণ তাঁদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নাটক রচনার সময় অঙ্কদৃশ্যসজ্জা, সংগীত, সংলাপ এবং রসের প্রতিষ্ঠায় যেমন নাট্যকারকে সদা সচেতন থাকতে হয় তেমনই কাহিনী এবং চরিত্রকে দুটি সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নাটকের কাহিনী এবং চরিত্রই প্রাণ — নাট্যকার আমাদের মত সম্মুখ সারির দর্শকমাত্র। যে নাটকের কাহিনী যত বেশী জটিল এবং চরিত্রসমূহ যত বেশী দ্বন্দ্বদীর্ণ, সেই নাটক ততবেশী প্রাণবন্ত। নাট্যকাহিনীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, চমৎকারিত্বে এবং আবেগে নাট্যচরিত্র যতবেশী দোলায়িত হয়, উপন্যাস অথবা আখ্যানকাব্যে চরিত্রের বিকাশের সে সুযোগ থাকেনা। নিরবচ্ছিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র ধীরে ধীরে তার মনের অন্দরমহলের দ্বারটি উন্মুক্ত করে দেয় এবং কখনও মহৎ, কখনও অসৎ কখনও বা ভাল-মন্দ মিশ্রিত চরিত্রের নাট্যপরিণতি দেখে দর্শক তৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করে। এমনও দেখা যায় যে, নাট্যকার সুন্দর কাহিনী নির্বাচন করেছেন, গভীর নাট্যরসের জন্য সুন্দর সংলাপও ব্যবহার করেছেন কিন্তু চরিত্রের বিকাশ সমভাবে না হওয়ায় নাটকটি কাম্য পরিণতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় নাটকে কাহিনীর যেমন স্থান, চরিত্রেরও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কাহিনী এবং চরিত্র --- নাটকে এই দুটি মুখ্য উপাদানের ভিতর কোনোটির স্থান উচ্চে এ নিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচক এবং নাট্যকারগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটকের নায়কের স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেও কাহিনী এবং চরিত্রের ভিতর কোনোটির গুরুত্ব বেশী সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো অভিমত দেননি।

বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারে দেখা যায়, কাহিনীই এই নাটকগুলিতে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে সক্রিয় এবং চরিত্রগুলি কাহিনীর আবর্তে পড়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। সেজন্য এই শ্রেণীর নাটকে কি অতিমানব, কি ব্যক্তিচরিত্র — এর কোনোটিরই একটি নিটোল নাট্যচরিত্র রূপে বিবর্তন সম্ভব হয়নি। অবশ্য ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সম্পর্কে এই উক্তি সর্বত্র সম্ভব নয়।

নাট্যশাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত অ্যারিস্টটল কাহিনীকেই নাটকের আত্মা বলেছেন। তাঁর মতে জীবনের কাহিনী নিয়েই নাটক হাজির হয় এবং সেইজীবনের আগাগোড়াই ঘটনাময়। জীবনেরই সূত্র ধরে আসে চরিত্র (‘‘Character comes in a subsidiary to the actions.’’)। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, একমাত্র সুচারু কাহিনীই ভাল ট্র্যাজেডির জন্ম দিতে পারে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, চরিত্রের অভাবে ভাল করুণ-রসাত্মক নাটক লেখা যায় কিন্তু করুণ-রসাত্মক কাহিনীর অনুপস্থিতিতে ভাল চরিত্রের সাহায্যেও ট্র্যাজেডির ঘনীভূত রসসৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল -- ‘‘Again if you string together a set of speeches, expresive of character and well finished in point of diction and thought you will not produce essential tragic effects nearly so well as with a play, which however, deficient in these respects, yes has a plot and artistically constructed incidents.’’ গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় নাটক থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত রচিত নাটকে ঘটনার স্থানটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান।

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ নাট্যসমালোচক জন ড্রাইডেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমালোচক হেনরি আর্থার জোনস্ --- এঁরা দুজনেই অ্যারিস্টটলের মত থেকে দূরে সরে গিয়ে বলেছেন নাটকের প্রধান উপকরণ হল চরিত্র। নাটকে ঘটনার বর্ণনা আড়ম্বরের সঙ্গে করা হল কিন্তু চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টি নেই -- সেক্ষেত্রে নাটকটিতে অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। হাডসনও বলেছেন -- “Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.’’

প্রকৃতপক্ষে নাট্যকাহিনীর রসের বিকাশ ঘটে কাহিনীর মধ্য দিয়ে এবং বক্তব্য অথবা ভাবের বিকাশ ঘটে চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ঘটনাহীন চরিত্র যেমন নাটকে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনা তেমনই চরিত্রহীন ঘটনাও প্রকৃত রসমোক্ষণে অসার্থক। শেক্সপীয়রের নাটকের প্রকৃত প্রাণবস্তু লুকিয়ে আছে অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতার উপর। জুলিয়াস সীজারের ঐতিহাসিক কাহিনীর অগ্রগমনের পাশাপাশি ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যালপূর্ণিয়া, অ্যাণ্টনি ইত্যাদি চরিত্রের নানা মানসিকতার চমৎকার বর্ণনাই নাটকটিকে উচ্চমূল্য দিয়েছে। হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শাইলকের জিঘাংসা, ডেসডিমনার নিকষিত হেম প্রেম, ইয়াগোর চক্রান্ত নানা নাটকের কাহিনীকে জটিল ঘূর্ণির মুখে পৌঁছে দেয় এবং দর্শকের রসবোধ এক অনির্বচনীয় সুখস্বাদে ভরপুর হয়ে ওঠে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সার্থক নাটকের জন্য প্রয়োজন কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন।

নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখার চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনায় পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁর ‘Romantic imagination’ অধিকারের সাহায্যে ঐতিহাসিক চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কল্পনার তুলি টানতে পারেন। শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সকল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সেই অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করায় তাঁদের সৃষ্ট

ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের চরিত্র হয়ে থাকেনি, নাটকের জীবন্ত চরিত্রের সত্যমূল্যও অর্জন করেছে। সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে চরিত্রসৃষ্টির সময় নাট্যকার স্বেচ্ছাবিহার করে থাকেন। তাঁরা খুশীমত চরিত্রগুলিকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দেন, ইচ্ছামত তাদের মুখে সংলাপ বসান -- চরিত্রগুলির পরিণতিও নাট্যকারদের ইচ্ছাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে যদি অতিনাটকীয়তা সৃষ্টির কোনো সুযোগ নাট্যকার না নেন তা হলে সমালোচকদের আর কিছুই বলার সুযোগ থাকে না।

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে সমালোচকরা চরিত্রসৃষ্টির সময় কল্পনার স্বাধীনতা-প্রয়োগে কোনো সুযোগ দিতে রাজী নন। পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি একান্তই সিদ্ধ চরিত্র -- কয়েক হাজার বছরের একনিষ্ঠ চর্চায় পুরাণের চরিত্রগুলি তাঁদের নির্দিষ্ট স্বভাব নিয়ে পুরাণপ্রিয় মানুষদের মনে জাগরূক। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী অথবা রাবণ, বিভীষণ, সাবিত্রী, সত্যবান, নল, দময়ন্তী, শ্রীবৎস, চিন্তা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র -- প্রভৃতি অজস্র চরিত্রের ভিতর যে চরিত্রটিকেই স্মরণ করা যাক না কেন সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই চরিত্রগুলি তাঁদের সকল দোষ-গুণ নিয়ে আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠেন। আজন্মলালিত আমাদের সংস্কার এ চরিত্রগুলির সিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির কোনো বিচ্যুতি দেখলে তাই আহত হয়।

অপরদিকে নাটক উপহার দেয় রিক্ত এবং অসম্পূর্ণ চরিত্রকে, যে চরিত্র জীবনে অপ্রাপ্তি, দৈন্য এবং গ্লানির সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে কখনও জয়ী হয়, কখনও পরাজয়ের সমুদ্র-আবর্তে ঘুরে মরে। এই চিরকালের চাঁদ সদাগরের দল জীবনের অতলস্পর্শে গভীরতার দিকে আমাদের নিয়ে যায়। পুরাণের মায়াকাজল চোখে দিয়ে নয়, বাস্তব জগতের দুঃখ-কষ্টের অনুভবশক্তি দিয়েই নাট্যদর্শকরা চরিত্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন। পুরাণের চরিত্রের সঙ্গে নাটকের চরিত্রের এখানেই প্রকৃত দূরত্ব।

৩০৩.৪.১৩.৬ : নাট্য সংলাপ

নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতা নাট্যকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ একটি নাটকের সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে সংলাপের ভূমিকা কম নয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের সাফল্যের পিছনে তার শক্তি প্রয়োগ করে। ঊর্ধ্বমুখী দ্বন্দ্বই ভাল সংলাপের সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অবশ্য নাটকে সংলাপের প্রাধান্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সমালোচক Lajos Egri বলেছেন — "Do not overemphasize dialogue. Remember that it is the medium of the play, but not greater than whole".

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, যথা উপন্যাস, কাব্য অথবা প্রবন্ধে সংলাপ কোনো নিশ্চিত উপাদান নয়; ঔপন্যাসিক, কবি এবং প্রাবন্ধিক তাঁদের স্বাধীন গতিময় বর্ণনায় সবকিছু প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু নাটকই একমাত্র শিল্পকর্ম যার প্রতিটি গতিপ্রকৃতিই নির্ভর করে সংলাপের উপর। উপন্যাস এবং কাব্যে যেমন ঔপন্যাসিক এবং কবি মুখর, নাটকে নাট্যকার তেমনি নীরব। নাটকে কাহিনীর অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ এবং সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত দর্শক-পাঠকমনে ঔৎসুক্য সৃষ্টির পূর্ণ দায়িত্ব সংলাপের। সংলাপের উপর এই অপরিমেয় দায়িত্ব থাকে বলেই কাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারকে দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

সংলাপ সৃষ্টির সময় নাট্যকারকে কয়েকটি বিষয় সতর্করূপে মেনে চলতে হয়। প্রথমত নাট্যকারকে লক্ষ রাখতে হয় একটি দৃশ্য থেকে পরবর্তী দৃশ্যে অগ্রসর-সময় সংলাপ যেন নাটকীয় ঔৎসুক্য বজায় রাখতে পারে। নাটকীয় সংলাপে কাহিনীর ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত যদি আগেই প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে নাটকের কৌতূহল কমে যেতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত ঔপন্যাসিক ইচ্ছামত যত্রতত্র ‘flash back’ প্রক্রিয়ায় অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু নাটকে চলমান সংলাপের মধ্য দিয়েই অতীত, বর্তমান ও ভাবী ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে হয়। নাট্যকার অসতর্ক হলে সংলাপে সেই ফাঁক থেকে যায় এবং নাটকীয় ঘটনায় বিচ্ছিন্নতা আসে। তৃতীয়ত কাহিনীর মত বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার ভঙ্গীতেও সংলাপে একটি সাধারণ ধর্ম অনুসৃত হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে এবং পরস্পর বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে সংলাপ রচনা করতে হয়। চতুর্থত সামাজিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদিতে জীবন্ত বাস্তবের চিত্রণ হয় বলে এই জাতীয় নাটকে যেমন গদ্য সংলাপ কাম্য তেমন পৌরাণিক নাটকে পদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হলেও তেমন আপত্তির কারণ থাকে না। ঐতিহাসিক নাটকেও পদ্য সংলাপ আসতে পারে কিন্তু এই পদ্য সংলাপে ভারসাম্যের প্রায়শ অভাব ঘটায় পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক ‘কাব্যনাট্যে’র দিকে চলে যায়। নাটক কাব্য নয়, এই ধারণাটি সর্বত্র সজাগ থাকলে নাট্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পদ্য সংলাপও ভাল সংলাপের জন্ম দিতে পারে। পৌরাণিক নাটকের আলোচনার সময়ও এই সূত্রগুলিকে অবশ্যই মনে রাখতে হয়।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে পদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের ‘গৈরিকছন্দ’কে অনেকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ধরেন। একথা সত্য গিরিশচন্দ্রই পদ্য সংলাপের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন এবং সমকালীন বহু নাট্যকার তাঁর প্রচলিত ছন্দের উপর নির্ভর করেই নাট্যসংলাপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ‘গৈরিশছন্দে’র জন্মের পিছনে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী নাট্যসংলাপের প্রভাব কম নয়। ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন : “পয়ারের অনুরূপ বহিরঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচনা ব্যতীতও তিনি অন্য এক রীতির অমিত্রাক্ষর ইহাতে রচনা করিয়াছিলেন; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে যতি স্থানে চরণ-ছেদ হইত, পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ইহারই অনুরূপ ছন্দ তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাই ‘গৈরিশছন্দ’ নামে পরিচিত হইয়াছে।” মধুসূদন বিশ্বাস করতেন .... ‘no real improvement in the Bengali drama could be expected untill Blank verse was introduced into it.’ তিনি পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন এমন কথা দৃঢ়ভাবে বলা না গেলেও তাঁর পৌরাণিক নাটক ‘পদ্মাবতী’তেই যে এই ভাষা কেবলমাত্র আংশিক ব্যবহৃত তা বলা যায়। ‘পদ্মাবতী’ রচনার একবছর পরে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন --- ‘I am of opinion that our drama should be in Blank Verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.’ কিন্তু পরবর্তী নাটক সমূহে মধুসূদন এই কাব্যসংলাপ ব্যবহার না করার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের ‘মঙ্গলাচরণ’ অংশে। তিনি লিখেছেন : ‘এ কাব্যেও আমি সংগীতে ব্যতীত পদ্যরচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।’ .... পদ্য সংলাপের প্রতি যে তৎকালীন জনসাধারণের একান্ত আকর্ষণ ছিল না তার পরিচয় তারাচরণ শিকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এবং হরচন্দ্র ঘোষের নাটক। তাঁরা সংলাপের ক্ষেত্রে পদ্য ও গদ্য ভাষার মধ্যে কোন্‌টিকে গ্রহণ করবেন বুঝতে না পেরে একই নাটকে উভয় ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে তারাচরণের পদ্য সংলাপে পয়ার এবং ত্রিপদী সংলাপে দীর্ঘ আকর্ষণহীন বিকাশ দেখি, তেমনি সাধু গদ্য

ভাষায় রচিত সংলাপে আড়ষ্টতা চোখে পড়ে।

নাট্যসংলাপের বিবর্তন : কয়েকটি দৃষ্টান্ত -----

প্রথম দৃষ্টান্ত : করুণ রসাত্মক প্রহসন

দীনবন্ধু মিত্র দেখেছিলেন, একদিকে একঝাঁক উনিশ শতকীয় তরুণ যুবক নিজের চারিত্রিক অধ:পতনের মুখে দাম্পত্যপ্রেমকে ধ্বংস করেছে। ধনী জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলবিহারী কেবলই বৈঠকখানায় ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে মদ্যপান করে। আর তার স্ত্রী কুমুদিনী সধবা হয়েও বিধবার মত স্বামীহীনা। এর ফলে সৌদামিনীর সঙ্গে কুমুদিনী যখন কথাবার্তা বলে, তাও হয়ে ওঠে অশ্লীল। কিন্তু দীনবন্ধু যেহেতু প্রহসনটিকে করেছেন নিমচাঁদ-অভিমুখী তাই সে বেশ্যা কাঞ্চনের সঙ্গে রসালাপ করে, কিন্তু কাঞ্চনের সঙ্গে সহবাস করে না। সে বন্ধুদের মাঝে নারী বিষয়ে আলোচনা করে কিন্তু তার স্ত্রীর কথা উঠলে সে তীব্র আহত হয়। কাজেই নিমচাঁদের মুখের অশ্লীল সংলাপ দিয়ে তার চরিত্রকে সর্বাঙ্গীন বোঝা যাবে না।

বিপরীত দিক থেকে বলা যেতে পারে এমনকি মদ্যপ অবস্থাতেও নিমচাঁদ এমন সব ইংরেজি উদ্ধৃতি ব্যবহার করে যার মধ্য দিয়ে তার পরিণত জীবনদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকে গোকুল, জীবনচন্দ্র, অটল -- কেউ বাংলার সামাজিক অধ:পতনের কথা ভাবেনি। কিন্তু অধ:পতিত নিমচাঁদ তা ভেবেছে। মদ্যপ অবস্থাতেও নিমচাঁদ তার অতীতকে স্মরণ করে ---

রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্মলজ্জামানমর্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে কি হয়েছ।

এই ভাষাই নিমচাঁদের প্রাণের ভাষা। তৎসমবহুল সংলাপটি কোথাও অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। তার কারণ তৎকালীন সামাজিক সঙ্কটই এই সংলাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিমচাঁদ হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার, ডন জুয়ান এবং ওথেলোর নির্ভুল সংলাপ বলে। সেই সংলাপ কত হৃদয়গ্রাহী এবং তার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাবাহী! অটল তাকে বলেছে -- তুই তোর মেগের কাছে যা। তা শুনে নিমচাঁদ তীব্র আহত হয়েছে। শেক্স্পীয়রের অসামান্য সংলাপ তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়েছে। প্রহসনের আদর্শ সংলাপ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ

দ্বিজেন্দ্রলালের ‘সাজাহান’ নাটক ‘নুরজাহান’ নাটকের এক বছর পরে লেখা হলেও এই নাটকে সাজাহান চরিত্রের সংলাপের আবেগকম্পিত গদ্যে গভীরতা বেশী। জাহানারার সংলাপে তেজ, দৃঢ়তা, তীব্রতা নুরজাহানের তুলনায় অনেক বেশি। যদিও চরিত্র অনুযায়ী সংলাপের গদ্যে পার্থক্য আসবেই। তবুও গদ্যের গঠনে সমধর্মিতা আছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ‘সাজাহান’ নাটকে সাজাহান, জাহানারা প্রমুখের সংলাপের মূল ভিত্তি উপমা সৃষ্টি। তবে গতানুগতিক উপমা নয়। ক্লাইম্যাক্স-ধর্মিতাও এখানে প্রধান ফর্ম। কিন্তু সাজাহানের সংলাপে তৎসম শব্দ থাকলেও বাক্যগঠন খানিকটা চলিত রীতির কাছাকাছি পৌঁছেছে। আর সেই কারণেই জাহানারার সঙ্গে তার সংলাপে আন্তরিক প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় ---

> **জাহানারা ঃ** বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পঙ্গুর মত বসে দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না।

‘সাজাহান’ নাটকের কোনোও কোনোও সংলাপ বাঙালী দর্শকদের মুখে মুখে পরবর্তীকালে প্রবাদের মত ফিরত। এই সংলাপ-প্রশংসা আর কোনোও বাঙালী নাট্যকারের ঝুলিতে নেই। যেমন --

ক. "এতো বড় দু:সংবাদ দারা!"

খ. "শীর্ণ হয়ে গিয়েছে সত্য, শীর্ণ হয়ে গিয়েছে।"

গ. "যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।"

ঘ. "প্রাণের চেয়ে মান বড়।"

ঙ. "কারণ ভাইয়ের মত শত্রু আর কেউ নেই।"

তৃতীয়, আধুনিক পুরাণ-নির্ভর নাটকের সংলাপ

লক্ষ্মণের তীব্র বিরোধিতা রামকে বিচলিত করতে পারেনি। অগত্যা লক্ষ্মণ যখন সীতাকে ঘটনাপ্রবাহ জানায় তখন উর্মিলাও বিস্ময়ে বিমুখ, সীতার প্রতি এই তার অশ্রুসজল, স্বপ্নঘোর সংবাদ পরিবেশনে অসহায়ের মতো উদ্যোগী করেছে। কেবল লক্ষ্মণের উর্মিলা নয়, সীতা সম্পর্কে ভরতেরও স্পষ্ট উক্তি -- 'অসম্ভব'।

পৌরাণিক নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ অত্যন্ত কম, বিশেষত রামের ন্যায় চরিত্রে, পুরাণে যে চরিত্র পুরোপুরি দ্বন্দ্বহীন, সরলরেখ। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'য় সেটাই আমরা লক্ষ করেছি। ভবভূতির রামচন্দ্রের মতো দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্রের মতো তার হৃদয় প্রথম থেকে উচ্ছ্বসিত। দুর্মুখের মুখে সীতার চরিত্র সম্পর্কে লোক অপবাদ শুনে রাম রাজ্যের উপর, অযোধ্যাপুরীর উপর আস্থা কামনা করে, জনমতকে দ্রুত মেনে নেয়। এদিকে যোগেশচন্দ্র দেখালেন রামের মুখ থেকে নাটকীয় ভঙ্গিসুলভ কথাগুলি শুনে সীতার উক্তির একটি অংশ, যা তাকে আধুনিক প্রতিবাদী চরিত্ররূপে স্থাপিত করেছে।

যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটকের প্রথম অঙ্কে অযোধ্যা প্রাসাদের একাংশে রামের জানুদেশে মাথা রেখে সীতার গভীর নিদ্রা। কিন্তু নাটকের crisis সূচিত হয়েছে অষ্টাবক্র ঋষির অনুরোধক্রমে রামের সেই অযাচিত উক্তিতে ---

দুর্মুখ, দুর্মুখ। মোর জানকীরে। এই দণ্ডে বিসর্জন দিতে পারি।

নাট্যতত্ত্ববিদরা এই ধরনের সংলাপকে নাটকের ট্র্যাজেডি বীজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই বীজ রোপিত হয়েছিল বাল্মীকি রামায়ণেই যেখানে রাম সীতাকে 'অগ্নিসমা পরিশুদ্ধ' জেনেও, কেবল প্রজানুরঞ্জনের জন্য নির্বাসন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন।

যোগেশচন্দ্র সচেতন ছিলেন বলেই জনকনন্দিনীকে কলঙ্কিত হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে রামের মধ্যে দোলাচলচিত্ত নায়কের বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। অন্যদিক থেকে যোগেশচন্দ্র জানেন, পৌরাণিক নাটকের প্রধান শর্ত পুরাণের মূলসত্য রক্ষা করা। অন্যথায় 'সীতা' পৌরাণিক নাটক হতে পারে না। এ জন্য তিনি রামের মুখে আরোপ করেছেন কয়েকটি টুকরো টুকরো উক্তি ---

ক. কর্তব্য করেছি স্থির, জানকিরে দেব বিসর্জন --- সত্যরক্ষা অবশ্য করিব।

খ. নিরুপায় আমি অন্য পথ নাহি আর জানকির নির্বাসন বিনা।

চতুর্থ : কাব্যনাট্যের ভাষা

এলিয়ট যেমন বিশ্বাস করতেন গদ্যসলাপের চেয়ে কাব্যসংলাপই জীবনের অত্যন্ত গভীর, সংঘর্ষময় উত্তেজক রূপ তুলে ধরতে পারে, বুদ্ধদেব বসুও সেই মত পোষণ করতেন। এ নিয়ে যত বিতর্কই দেশ

বিদেশে হয়ে থাকুক, এর সমর্থন মেলে এলিয়ট এবং বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যের জনপ্রিয়তায়। আর বুদ্ধদেব তো নিজেই দাবি করেছেন---

সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের (তপস্বী ও তরঙ্গিনী) অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত।

বুদ্ধদেব 'কাব্যনাট্য' না বলে 'নাটক' বললেন কেন? তার কারণ এ নাটকে কাব্যভাষা ও গদ্যভাষা সমান্তরাল। 'কালসন্ধ্যা'তেও একই পদ্ধতি নিয়েছেন নাট্যকার। এবং তার ফলে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র চরিত্রগুলির সংলাপে নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে ---

নাট্যাবেগ সমৃদ্ধ সংলাপ

ঋষ্যশৃঙ্গ ঃ ....নারী। ....নূতন এক জগৎ। ..... মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার। ...আমি অস্নাত থাকব। তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে। আমি অভুক্ত থাকবো, তোমার চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করবো তোমাকে।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা। কোথায় বারাঙ্গনা তরঙ্গিনী, আর কোথায় কামজয়ী ঋষিকুমার! কিন্তু হেরে গেল তরঙ্গিনী। বহু রজনীর বহু পুরুষের কামনিবৃত্তকারিনী নারীটি নিজ জীবিকাধর্ম থেকে চ্যুত হল। আসলে 'অন্য এক স্বপ্ন' দেখল দুজনেই। সংযমী ঋষ্যশৃঙ্গ কিভাবে কামজর্জরিত হল তা তার কাব্যময় গদ্যসংলাপ থেকে আগেই জেনে গেছি। কিন্তু বারাঙ্গনা চিন্তামণির সংলাপে গিরিশচন্দ্রও যেখানে প্রথম পুরুষপ্রেমিক বিল্বমঙ্গলের প্রতি ঘনীভূত আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেননি, সেখানে বুদ্ধদেবের পতিতা তরঙ্গিনী প্রথম পুরুষকে বরণ করল। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হতে পরামর্শ দিল, আর জননী লোলাপাঙ্গীর শতবাধা সত্ত্বেও, লোকসংস্কার, অর্থবাসনা ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে প্রেমিকের প্রতি আত্মনিবেদনে উজাড় হল তরঙ্গিনী। তার সংলাপ, রোমান্টিক প্রেমিকার সংলাপ ---

অ. কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

আ. তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ই. তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

ঈ. এসো প্রেমিক, এসো দেবতা -- আমাকে উদ্ধার করো।

বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্যের সংলাপ অন্যান্য কাব্যনাট্যকারদের প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশেষ করে গদ্যসংলাপের মধ্যে কবিতার প্রবাহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

৩০৩.৪.১৩.৭ : নাট্যসংগীত

"Most discussions about the music of poetry seem to assume tacitly that the music lies in the language. This is an error. The music lies in the voice, with language – considered as a spoken phenomenon – providing certain corditions within which the voice, operates. It is essential to emphasize the fact that the voice being the natural organ of feeling, has its own purely auditory expressiveness."

— Peacock, Ronald : The Art of Drama, London, 1960, PP. 121-22.

নাটক রচনার বহু পূর্ব থেকেই সংগীত তার রূপমাধুরী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে যুগে সভ্যতার সামান্যমাত্র বিকাশ হয়নি, আদিম মানুষ যখন প্রকৃতির বুকে ঘর বেঁধে আরণ্যক জীবনের সুখানুভব করত — সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতের বুকেই সংগীতের জন্ম। এমনকি যখন কথার প্রয়োগ পর্যন্ত অভাবিত ছিল তখনও মানুষ সুরের গভীরে অনুভূতির দ্যোতনায় বিস্ময়ভরা পুলকে কম্পিত হয়েছে। সুরের অনুভূতিতেই যে সুখ-দু:খ, ব্যথা-বেদনার সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক প্রকাশ সম্ভব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধীরে ধীরে সুরের সঙ্গে কথার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হয়েছে, সংগীতের সম্ভাবনা সফল হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর "The origin and function of music" নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন যে, মানুষের মনোভাব গাঢ়তম ও তীব্রতমরূপে প্রকাশ করবার জন্যই সংগীতের উৎপত্তি। তাঁর মতে সংগীত হল নিজের উত্তেজনা প্রকাশ এবং অপরকে উত্তেজিত করার সূক্ষ্মতম মাধ্যম।

সংগীত শ্রোতার দৃষ্টির সামনে একটি মায়ালোকের পর্দা তুলে ধরে এবং সমস্ত হৃদয়ের কোণে অনির্বচনীয় আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। স্পেন্সারের এই প্রবন্ধটি আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামক রচনায় লিখেছেন :

স্পেন্সারের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে, যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুগ্ন, মলিন বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিতভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ সুস্থ ও সুমার্জিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাবসকল অসঙ্কোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সংগীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে।

সংগীতের জন্মের ইতিহাস এবং অগ্রগতি আলোচনা করলে দেখা যায় আদিম স্তরে সুরই ছিল সংগীতের একমাত্র অবলম্বন, পরবর্তী স্তরে সংগীত কাব্যমূল্য অর্জন করে। সুরের সঙ্গে কথার মিলনে যে গাথা-গীতের আবির্ভাব ঘটেছিল তার সাঙ্গীতিক মূল্য যেমন ছিল অপরিসীম সঙ্গে সঙ্গে কাব্যমূল্যও কম ছিল না। সুরের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হল এই যে, মানবমনের অন্তরতম কেন্দ্রে তার সহজ অনুপ্রবেশ সম্ভব। সুর এবং কথার সম্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে তাই সংগীতের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হল। কাব্যসংগীতের সুরধারা নাটকেও তার অনুপ্রবেশকে সম্ভব করল। নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সমবেত সংগীত বা কোরাস বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন নাট্যসংগীতে পরিণত হয়েছে।

কেবলমাত্র দর্শকদের মনে আনন্দসৃষ্টির জন্যই নাটকে সংগীতের ব্যবহার করা হয় না, নাট্যকাহিনীর স্বার্থেও সংগীতের ব্যবহার কখনও কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। নাটকের উৎপত্তির কালে সংগীতই ছিল প্রধান অবলম্বন, কিন্তু নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে সংলাপ। সংলাপের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রভাব শুধু কমেইনি, কোনো কোনো নাটকের ক্ষেত্রে সংগীত অবাঞ্ছনীয় রূপে পরিগণিত হয়েছে।

যাত্রা, গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে সংগীতের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকলেও সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে সংগীতের ভূমিকা প্রায় উপেক্ষণীয়। তবে গান থাকলেই নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হওয়ার

সম্ভাবনা এমন অভিমত ঠিক নয়। নাট্যকারকে স্থান - কাল এবং পাত্র বিচার করে গান ব্যবহার করতে হয়। এই বিচারে কোনো ফাঁক থাকলে নাটকে সংগীত ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সংগীত এবং নাটক -- দুটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। নাট্যরচনার পূর্বেই সংগীতের জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী যুগে নাট্যকার তাঁর প্রয়োজনে নাটকের মধ্যে সংগীতের স্থাপনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সংগীতকে আশ্রয় করেই নাটকের জন্ম।

হোমারের গ্রীসে যে সংগীতের বীজ রোপিত হয় তাই পরবর্তীকালে ডিথ্যাইর‍্যাম্ব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রীক নাটকে রূপান্তরিত হয়। গ্রীক কোরাসের নায়ক থেসপিস্‌ই প্রথম সংগীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত করে নাটকের সংলাপ সৃষ্টি করেন। ইংল্যান্ডের মাটিতেও (চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে) খ্রিস্টজীবনকে অবলম্বন করে আগে গান এবং পরে নাটক এসেছিল। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নায়করা দেবতার বেদীকে ঘিরে প্রথম মৃত্য-গীত করত। এই কোরাস গান ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হয়ে সংলাপে পরিণত হল। কোরাস নাটকের অঙ্গ হিসেবেই গৃহীত হল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অন্যতম উপাদান হিসেবে সংগীতের আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গীত, বাদ্য এবং নৃত্যকে একসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সূত্রে তিনি বহির্গীত দেবতার বন্দনাগীত, নান্দী এবং সূত্রধারের প্রবেশ ও গীতের কথা উল্লেখ করেছেন। নাটকের প্রস্তাবনায়, কোনো অঙ্কের শেষে, রস থেকে রসান্তরে উপনীত হওয়ার সময় ধ্রুবাগীত ব্যবহৃত হত। এই ধ্রুবাগীতের ভাষা ছিল শূরসেনী। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত ধ্রুবাগান সংস্কৃত নাটকে প্রায় নেইই। ভরত নির্দিষ্ট চৌষট্টি রকমের ধ্রুবাগান (যেগুলি নেপথ্যে গীত) সংস্কৃত নাটকে পাত্রপাত্রীর মুখের গানে এবং সংলাপের প্রাধান্যে বর্জিত হয়েছিল।

সংস্কৃত নাটকে সাধারণত: 'নান্দী' গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তবে ভরত-নির্দেশিত ঋতু-বিষয়ক গান নান্দীতে সর্বত্র গীত নয়। কালিদাসের এবং ভাসের পুরাণনির্ভর দুটি নাটক যথাক্রমে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এবং 'প্রতিমা' নাটকে গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতু-বিষয়ক নান্দীগীত থাকলেও, অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকে নান্দীর পর ঋতু-বিষয়ক গান কদাচিৎ চোখে পড়ে। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত গান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। ক্ল্যাসিকাল যুগের গানই পরবর্তীকালে আঞ্চলিক গীতে রূপান্তরিত হয়।

সংস্কৃত নাটকে যেমন গান প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, পাশ্চাত্য নাটকে তা ছিল না। অপেরা বা লঘু নাটক ছাড়া পাশ্চাত্য নাটকে গান ব্যবহারের প্রয়োজন নাট্যকারগণ তেমন অনুভব করেননি। সে দেশের নাটকে বাস্তব জীবন-সমস্যাই প্রধান, গানের রসমাধুরীর চেয়ে সংলাপের তীব্রতাই যে জীবন-কথাকে অধিক প্রকাশ করতে পারে। শেক্সপীয়র তাঁর নাটকে চরিত্রের বিকাশের জন্য এবং ঘটনার দ্বন্দ্বময়তাকে মুখর করবার জন্য গান ব্যবহার করেছেন। এলিজাবেথীয় যুগের পর নাটক থেকে সংগীত একেবারে বাদ যায়নি সত্য কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলা নাটকের মত গানের স্রোত সেখানে দুর্বার নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক সংগীতময়। ভাবাবেগ সংগীতের মুখ্য অবলম্বন, --- চিরভাবপ্রবণ বাঙালীর চিত্তমুকুরে সংগীতের আসনটি সর্বদাই উচ্চে। পাশ্চাত্য নাটকে এবং সংস্কৃত নাটকে যেমন সংগীতের মধ্য দিয়ে নাটকের জন্ম ঘটেছে তেমনই বাংলা নাটকেরও জন্ম সংগীতের সিঁড়ি বেয়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাটগীত, ঝুমুর, ধামালি, কথকতা ইত্যাদি লোক-নাটগীত, পাঁচালী, কবিগান এবং যাত্রা বাঙালীর কয়েক শতাব্দীর সংগীতপ্রিয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস। বাংলা নাটক যদিও পাঁচালী, কবিগান অথবা যাত্রা থেকে উদ্ভূত হয়নি কিন্তু এগুলির গীতরস বাংলা নাটকের মর্মকোষে সঞ্চারিত হয়েছিল।

৩০৩.৪.১৩.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্লটের সংজ্ঞা নিরূপণ করো। প্রসঙ্গক্রমে একটি নাটকের প্লট বিন্যাস আলোচনা করো।

২। নাটকে প্লট ও চরিত্রের মধ্যে কোনোটির ভূমিকা বেশি তা দেখাও।

৩। দেশ-বিদেশের নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের বিবর্তনের পরিচয় দাও।

৪। নাট্যসংলাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে যে কোনো একটি শ্রেণীর নাট্যসংলাপ নিয়ে আলোচনা করো।

৫। নাটকে সংগীত প্রয়োগের ইতিহাস বর্ণনা করো।

৬। ত্রয়ী ঐক্য বলতে বিভিন্ন নাট্যতত্ত্ববিদ্ কি বুঝিয়েছেন? একাঙ্ক নাটকে ত্রয়ী ঐক্য বজায় থাকে কিনা সংক্ষেপে দেখাও।

৭। একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা নিরূপণ করে যেকোনো একটি একাঙ্ক নাটকের গঠন শৈলীর উপর আলোকপাত করো।

একক - ১৪

নাটকের অঙ্কবিভাগ, পঞ্চসন্ধি, নাটকীয় ঐক্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৪.১ : নাটকের অঙ্কবিভাগ ও দৃশ্যবিভাগ

৩০৩.৪.১৪.২ : ত্রয়ী ঐক্য

৩০৩.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৪.১ : নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ

নাটকের অঙ্কবিভাগের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম এইজন্য, ঘটনার পৌর্বাপর্ব এবং কার্যকারণের যোগ একমাত্র অঙ্কবিভাগের দ্বারাই রক্ষিত হতে পারে। অঙ্কের পর অঙ্ক এগিয়ে যায় আর নাটকীয় কাহিনী দ্রুতি লাভ করে। নাটক যেহেতু কবিতা অথবা উপন্যাসের মত কল্পনার দ্যুতিবিলাস নয় তাই নাটকের কাহিনীকে অঙ্ক এবং দৃশ্যে পর পর সাজিয়ে ঘটনার ধারাকে পর্বে পর্বে ভাগ করতে হয়। নাট্যকারকে যেমন কাহিনীর অগ্রগতির জন্য অঙ্ক বিভাগ করতে হয়, তেমনই প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে ঘটনা স্থাপনের জন্য আবার দৃশ্য (গর্ভাঙ্ক) বিভাগ করতে হয়।

সচরাচর নাটক পঞ্চাঙ্ক হওয়া উচিত বলেই মনে হয়। ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' দেখিয়েছেন নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি ঘটে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে -- প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ। ইউরোপীয় নাটকেও Exposition, Rising action, climax, falling action এবং Catastrophe --এই পাঁচটি স্তরের মধ্যদিয়ে পঞ্চাঙ্ক সৃষ্টির নীতি অনুসৃত। গ্রীক ট্র্যাজেডিগুলি পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই অনুসরণ করে, কারণ গ্রীসের দীক্ষাবিধির অনুষ্ঠানটি পাঁচটি স্তরের মধ্যদিয়েই সম্পন্ন হত। নাট্যকার সেনেকার (খ্রি: পূ: ৪ - খ্রি পর ৬৫) সময় থেকেই পঞ্চাঙ্ক বিভাগরীতি পাকাপাকিভাবে প্রথা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষার অধিকাংশ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে সূত্রধরের প্রবেশ ও প্রস্থানের পর নাটকের মূল কাহিনীর সূচনার নির্দেশ একাধিক বাংলা পৌরাণিক নাটকে অনুসৃত হয়েছে। সামাজিক নাটকেও রামনারায়ণ এই নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। তবে পঞ্চাঙ্ক রীতির কথা 'নাট্যশাস্ত্রে' জোর দিয়ে বলা হয়নি -- পাঁচটির কম বা বেশী অঙ্কও থাকতে পারে। এই বিষয়টি নির্ভর করে নাটকীয় ঘটনার 'সন্ধি'র উপর।

অঙ্কবিভাগের দিকে সংস্কৃত নাট্যকারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল না। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' পঞ্চাঙ্ক নাটক, কিন্তু 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে' আছে সাতটি অঙ্ক। ভাসের 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধনারায়ণ' চার অঙ্কের নাটক কিন্তু 'স্বপ্নবাসবদত্তায়' ছটি অঙ্ক আছে। ভবভূতির 'মালতীমাধবে' দশটি অঙ্ক, 'মহাবীর চরিত' এবং 'উত্তর রামচরিতে' সাতটি করে অঙ্ক। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' (দশটি অঙ্ক), ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (ছ-টি অঙ্ক), শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' (ছ-টি অঙ্ক) এবং শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (চার অঙ্ক) পঞ্চাঙ্ক রীতি-অনুসারী নয়। একমাত্র ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' পঞ্চাঙ্ক নাটক।

পাশ্চাত্ত্যে গ্রীক নাটকের অন্যতম স্তম্ভ এসকিলাসের প্রথম নাটকে (The suppliants) পঞ্চসন্ধি পরিকল্পনা দেখা যায় না। সফোক্লিসের নাটকে প্রলোগ, প্যারোড, এপিসোড এবং একসোডাস্-এর দ্বারা চারটি অঙ্কসদৃশ বিভাগ প্রথম দেখা যায়। সেনেকার নাটকেই প্রথম অঙ্কবিভাগ শুরু হয় এমন দাবী উঠলেও বলা যায় তাঁর পূর্বে অঙ্কপরিচ্ছন্ন নাটক ছিল। আলেকজান্দার - সমকালীন কমেডি রচয়িতা মিনান্দার পঞ্চাঙ্ক রীতি অনুসরণ করতেন।

ইংল্যান্ডে রেনেসাঁর সন্তান মার্লোর 'Dr. Faustus' নাটকে অঙ্ক বিভাগ নেই, এই রীতি পরবর্তীকালে টমাস হার্ডি, বার্নার্ড শ' এবং গলসওয়ার্দির নাটকে দেখি। অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে এঁদের নাট্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে। অন্যদিকে অনন্যপ্রতিভা শেক্সপীয়রের অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাগ রীতি সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই (১৬০৬ -- ৮৪) ও রাসিনের (১৮৩৯ --৯৯) নাটকেও দেখি। এঁদের নাটকগুলি প্রধানত পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই বিন্যস্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বজুড়ে নাটকীয় আঙ্গিক নিয়ে বহুমুখী গবেষণা চলতে থাকে। নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (১৮২৮ -- ১৯০৬) যেমন দশ অঙ্কের নাটক (Emperor and Galiban --১৮৭৩) লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন একাঙ্ক (The Warrior's Barrow ১৮৫০-এ অভিনীত) নাটক। তিন, চার এবং পাঁচ অঙ্কের নাটকও তিনি লিখেছিলেন। সুইডেনের নাট্যকার আগস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯ - ১৯১২) চমৎকার একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্য নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য পরিকল্পনায় নতুন নতুন দিক্‌নির্দেশ দেখা দিতে থাকে। অস্কারওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০) যেমন একাঙ্ক ট্র্যাজেডি ('Salome') লেখেন, তেমনি লেখেন দৃশ্যবিহীন চার অঙ্কের নাটক 'The Ideal Husband' । এর আগেই টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯১৮) লিখেছিলেন -- ১৯ টি অঙ্ক এবং ১৩০ টি দৃশ্য বিভক্ত দুইখণ্ডে ধৃত 'The Dynasts' নামক মহানাটক।

বলা ভাল যে প্রত্যেক নাট্যকারই নাটকীয় কাহিনীর বিষয়বস্তুর উত্থান এবং পতনের প্রতি তাকিয়ে নাটকের অঙ্ক এবং দৃশ্যসজ্জা করে থাকেন। তাই একাঙ্ক থেকে শুরু করে পঞ্চাঙ্ক নাটক সাধারণত দেখা যায়। বাংলা পৌরাণিক নাটকের অবয়ব গঠনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই রীতি প্রায়শ দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের 'রামের বনবাস' পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'দক্ষযজ্ঞ' চতুরঙ্ক নাটক, 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' দ্ব্যঙ্ক নাটক, 'বৃষকেতু' একাঙ্ক নাটক, আবার 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকটি মাত্র ন-টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ।

বাংলা যাত্রার অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের কোনো প্রয়োজন যাত্রা রচয়িতাগণ অনুভব করতেন না। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রাগুলিতে অঙ্ক ও দৃশ্যসজ্জা নেই। কৃষ্ণকমলের 'দিব্যোন্মাদ যাত্রা'র শুরুতে একটি গৌরচন্দ্রিকা ও একটি প্রস্তাবনা মাত্র আছে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় নাটকের মত অঙ্ক নির্দেশ রচয়িতা নিজে করেননি, তাঁর পালাগুলির সম্পাদক পাঁচকড়ি দে এই অঙ্কবিভাজন করেছেন। ব্রজমোহনের অনেকগুলি যাত্রার নাটকের ন্যায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক - বিন্যাস আছে, কিন্তু তাঁর রামাভিষেক, শতস্কন্ধ-রাবণবধ ইত্যাদি পালায় এই রীতি অনুপস্থিত। তাঁর যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্যনির্দেশও সম্ভবত তাঁর যাত্রা-সংকলয়িতার ইচ্ছা-সঞ্জাত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যাত্রার ভিতরে গীতাভিনয়ের শিল্পশৈলী অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মতিলাল রায়, ধনকৃষ্ণ সেন, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ বসু, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ প্রমুখের যাত্রাপালায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক অথবা দৃশ্যবিভাগ ব্যবহৃত। কিন্তু এ কথা সত্য, নাটকের মত যাত্রায় জীবনদ্বন্দ্ব তত তীব্র নয়। নাটকে ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে যে 'সন্ধি' থাকে তার চিহ্নিতকরণের

জন্য অঙ্ক - দৃশ্য বিভাগ থাকা চাই -- এই 'সন্ধি' যাত্রার কাহিনীতে থাকে না। সেইজন্যই যাত্রায় অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কম।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'ভদ্রার্জুন' লিখতে গিয়ে নাট্যকার তারাচরণ ভূমিকায় লিখেছিলেন -- "..সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) অ্যাক্ট কহে, কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ Scene সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত Scene শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) কহে।"..... প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকে সুপণ্ডিত তারাচরণ দৃশ্যের পর দৃশ্য ব্যবহারের মধ্যদিয়ে মহাভারতীয় কাহিনীর গভীরে গতি সঞ্চারে সফল হয়েছিলেন। দৃশ্যগুলির সংক্ষিপ্ততা নাটকের উৎকর্ষ বাড়িয়েছিল। 'মনে হয়, তারাচরণ নাটকখানি অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছিলেন; কারণ, ব্যবহারতঃ অভিনয়ের অনুপযোগী কোনো দৃশ্যেরই তিনি ইহাতে সমাবেশ করেন নাই। সেইজন্যই মনে হয়, একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ দৃশ্যগুলিও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' অবশ্য নাটকটির কোনো অভিনয়ের সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায়নি।

তারাচরণের নাটকে যেমন 'Scene' শব্দের পরিবর্তে 'সংযোগস্থল' ব্যবহৃত, জি.সি.গুপ্তও তেমনি তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকে 'Scene' এর পরিবর্তে 'অভিনয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে 'Scene' এর নামকরণ করেছেন -- অঙ্গ। যেমন প্রথম অঙ্ক, প্রথম অঙ্গ; দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্গ ইত্যাদি। মধুসূদন কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' রচনার সময়ই পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক বিভাগ করেছেন। রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে এইভাবে ঘটনাসজ্জা না করলেও পরবর্তী নাটক 'নবনাটকে' একই রীতি মেনে নিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যায়, কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রারম্ভ যুগের সামাজিক নাটকেও নান্দী ও সূত্রধর রীতি, প্রস্তাবনা ইত্যাদি রক্ষিত। গীতাভিনয়ে পঞ্চাঙ্ক রীতিকে মনোমোহন অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে তিনি 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) নামক সামাজিক নাটকেও 'প্রস্তাবনা' যুক্ত করে নট ও নটীর মধ্যস্থতায় নাট্যকাহিনীর সূচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে আঙ্গিককে কখনোই প্রাধান্য দেননি। তাঁর 'সীতার বিবাহ' তিন অঙ্কের নাটক, মোট গর্ভাঙ্ক সংখ্যা কুড়ি। একটি 'সূচনা' দৃশ্যও আছে। 'দক্ষযজ্ঞ' চতুরঙ্গ নাটক, মোট গর্ভাংক সংখ্যা বারো। তৃতীয় অঙ্কে একটির বেশী গর্ভাঙ্ক নেই। 'পাণ্ডবগৌরব' পঞ্চাঙ্ক নাটক, মোট গর্ভাংক সংখ্যা তিরিশ। নাটকের শেষে 'পট-পরিবর্তন' নামে একটি ক্রোড় অংক যুক্ত করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের লক্ষ ছিল অংকের পর অংক সাজিয়ে নাটকীয় কাহিনীস্থলে দ্রুতিসঞ্চার করা। সেক্ষেত্রে তিনি প্রায়শ সফল।

আধুনিক নাট্যমঞ্চরীতির সূচনা রুশ স্তালিস্কাভাস্কির সময় থেকে। নাটকের অঙ্কদৃশ্যের প্রথাবদ্ধতা তখন থেকেই অস্বীকার শুরু হল। এলো একাঙ্ক, তিন অঙ্কের নাটক। এমন নাটকও পেলাম যেখানে কেবল দৃশ্য আছে, অঙ্ক নেই। আসলে রোঁমা রোলার Peoples Theatre এবং ব্রেখটের Epic Theatre -এর আদর্শে অঙ্কদৃশ্যের এই বদল সবচেয়ে প্রভাবিত করে গণনাট্যকারদের।

বিজন ভট্টাচার্যর 'নবান্ন' নাটকের গঠন সম্পর্কে তৎকালীন গণনাট্যের অভিনেতা ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

প্রথাসিদ্ধ পাঁচ অঙ্ক রীতি এখানে মানা হয়েছে, যদিও অঙ্কের সংখ্যা চার। নাট্যপ্লটের মধ্যে অ্যারিস্টটল কথিত পাঁচটি বাঁক আছে। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্য Introduction। ঘটনাস্থল আমিনপুর। অঙ্কের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে বন্যা-মন্বন্তর-দাঙ্গা প্রসঙ্গ এসেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্য Rising action! ঘটনাস্থল

স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতায়; রাজপথে গ্রামের কৃষকদের দুরবস্থার নাট্যচিত্র। তৃতীয় অঙ্কের তিনটি দৃশ্য -- এখানেই climax! শহরের অভিজ্ঞতালব্ধ আমিনপুরের কৃষকদের আবার গ্রামে ফেরার তৎপরতা। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য -- Falling action এবং Catastrophe! সকলে আবার আমিনপুর গ্রামে ফিরে এল। প্রাঙ্গণ নবান্ন উৎসবকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এবার থেকে কৃষকরা সম্মিলিতভাবে চাষ করার শপথ নিল। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সঙ্কল্পও নিল।

এই নাটকের দৃশ্যগুলি পর পর সাজানো বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। কিন্তু নাট্যকাহিনী যে ক্রমপরম্পরায় অগ্রসর হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। আসলে প্রথাসিদ্ধ ভাবে নাটকটির গঠন বা আঙ্গিক বিচার করতে গেলে ভুল হবে। বরং কাল-গণচেতনা, চরিত্রগুলির নাটকীয় অভিব্যক্তি, ঘটনার নাটকীয়তা এবং সংলাপের অভিনবত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে ‘নবান্ন’ নাটকের শিল্পশৈলীর সাফল্য অনুভব করা যাবে।

৩০৩.৪.১৪.২ : ত্রয়ী ঐক্য

নাটকের প্লট-সম্পর্কিত আলোচনায় ত্রয়ী ঐক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে। কিন্তু যেহেতু নাটকের কাহিনীর পারম্পর্য বজায় রাখার জন্য, ঘটনাসমূহের স্থান-পারম্পর্য ঠিকমত করার জন্য, এবং নাট্যক্রিয়া সুসংহত রক্ষার জন্য ত্রয়ী ঐক্যের প্রয়োজন জরুরী, তাই পূর্ণাঙ্গ নাটক ও একাঙ্ক নাটকের ত্রয়ী ঐক্য বিধি সম্পর্কে আলাদা আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের ঐক্যবিধি :

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ----

১. অ্যারিস্টটল স্থান ঐক্য সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট মন্তব্য করেননি, তবে তাঁর পোয়েটিক্সের টীকা লিখতে গিয়ে Maggi বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ফরাসী নাট্যকার কর্ণেই, রাসিন প্রমুখরা এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

২. বিপরীতে ড্রাইডেন ঐক্যবিধির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন --- ‘What has been said to The Unity of Place may easily be applied to that of time ..... for as place, so time relating to a play is either imaginary or real; The real is comprehended in those three hours more or less.

৩. এফ. এল. লুকাস, এলারডাইস নিকল এবং টি. এস. এলিয়ট স্থান ঐক্য ও কাল ঐক্য রক্ষার পক্ষে মত দিয়েছেন।

৪. সংস্কৃত নাট্যতত্ত্ববিদরা ঘটনার উপস্থাপনের ঐক্যের উপর জোর দিয়েছেন। কাল ঐক্যের প্রসঙ্গে তাঁরা এইভাবে বলেছেন --- ‘একদিবস প্রবৃত্ত কার্যস্ত্বঙ্কো’। বড়জোর প্রবেশককে ব্যবহার করার মধ্যদিয়ে তা বাড়ানো যেতে পারে।

৫. নাট্যকার ভাস তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলিতে একটা ঘটনা, একটা দৃশ্য ব্যবহার করে ত্রয়ী ঐক্যের নিদর্শন রেখেছেন।

একাঙ্ক নাটকে ত্রয়ী ঐক্য :

বনফুলের 'শিককাবাব' নাটক --

বিশিষ্ট ছোটগল্পকার, নাট্যকার বনফুলের একাঙ্ক নাটকগুলির নিজস্ব একটি প্যাটার্ন আছে। সেই রীতি অ্যারিস্টটলীয় পূর্ণাঙ্গ নাট্যনির্দেশ মেনেছে এমন কথা বলা যাবে না। কেননা পঞ্চাঙ্ক নাটকের আয়তন দীর্ঘ, আর একাঙ্ক নাটকের আয়তন সংহত। একমুখী দ্রুতগামী সম্পূর্ণ স্বল্পচরিত্রের বিবর্তন-সম্বলিত কাহিনী হল একাঙ্ক নাটক। যাই হোক, একাঙ্ক নাটকের ত্রয়ী-ঐক্যগত বিচার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্ণাঙ্গ নাটকে যেমন, একাঙ্ক নাটকেও তেমনি ত্রয়ী - ঐক্য রক্ষিত হলে রচনার নাট্যধর্ম যথাযথ ও বর্ণাঢ্য গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। ত্রয়ী ঐক্যগুলির পরিচয় এই রকম--

১. ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of action)

২. কালগত ঐক্য (Unity of time)

৩. স্থানগত ঐক্য (Unity of place)

সার্থক সিদ্ধনাট্যশিল্পী বনফুল তাঁর 'শিককাবাব' একাঙ্কিকাতে সীমাবদ্ধ পরিসরে এই ত্রয়ী ঐক্যবিধান করে নাটকের আকর্ষণীয়তা ও উপভোগ্যতা বাড়িয়েছেন।

১. ক্রিয়াগত ঐক্য (Unity of action)

একাঙ্ক নাটকে নাট্যকার নাটকের মূল ভাববস্তু ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপস্থিত করেন। এই ক্রিয়ার প্রথম ভাগে থাকে জটিলতা, দ্বিতীয় ভাগে থাকে জটিলতামোচন। নাট্যবৃত্তের আদি (begining), মধ্য (middle) এবং অন্ত্য (end) --- এই তিনটি স্তরে বিন্যাস হয় ঐ দুটি অংশে। এদের মধ্যে আদি স্তরে নাট্যসমস্যা উপস্থিত করা হয়। মধ্যস্তরে স্থান পায় এই সমস্যার বিবর্তন ও জটিলতা। এবং অন্ত্যস্তরে সমস্যার রুক্ষময় অথবা প্রীতিকর পরিণতি দেখানো হয়। এই গোটা বিষয়কে অ্যারিস্টটল বলেছেন — Unity of action. পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তা থাকা চাই। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের জেনে নিতে হয়, তা হল একাঙ্ক নাটক একটি তত্ত্বে সীমাবদ্ধ এবং এর মধ্যেই থাকে সূচনা (introduction), ঘটনার আরোহন (rising action), চরমবিন্দু (climax), ঘটনার অবরোহণ (Falling action) এবং পরিসমাপ্তি (catastrophe)—এই পাঁচটি নাট্যসন্ধি। তবে পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো 'শিককাবাবে' এই Unity of action-এর মধ্যে কোনোও বিস্তারের সুযোগ নেই। ঘটনা অনুসারে দ্রুতগামী একাঙ্ক কিভাবে এই Unity of action কে রক্ষা করেছে, তা নাটকটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে বোঝা যাবে।

'শিককাবাব' একাঙ্কিকায় ক্রিয়াগত ঐক্য একটি মূল ঘটনার বিন্দুতে আবর্তিত। সেটি হল জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার অসহায় তরুণী সৌদামিনীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু। আধুনিক নাট্যকারদের স্বাধীনতা অনুযায়ী বনফুল প্রথমেই জমিদারের গৃহবর্ণনা দিয়েছেন এবং শিবু ও করিমের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনার অবতরণিকা ঘটিয়েছেন। অত:পর, বহুভোগী জমিদারের বাস্তব মাংস লোলুপতা ও নারীমাংস ভোগের লালসা যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, তেমনি স্বয়ং জমিদার ও তার প্রধান মোসাহেব পান্নালালের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে জমিদারের কামাসক্তি ও সৌদামিনীর ভাগ্য বিপর্যয় স্তরে স্তরে স্পষ্ট হয়েছে। নাট্যমধ্যে রোগা গোছের গোঁফ-দাড়ি কামানো পান্নালালের হাজির হওয়ায় Unity of action দ্রুত ঘটেছে। গ্রামের মেয়ে সৌদামিনীর প্রেমিকসহ কাশী যাওয়া -- সেখান থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ও জমিদারের বাগান বাড়িতে পৌঁছানো, এসব অবরোহণ পদ্ধতিতে নাট্যকার আমাদের জানিয়েছেন। এখানে Unity of action-এর রীতি রক্ষিত। তবে মদ ও সিগার খেতে খেতে জমিদারের ক্লান্ত হয়ে পড়া এবং

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সৌদামিনীকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশের বিষয়টি নাট্যশেষে climax-এর আগেই সেরেছেন। অর্থাৎ Unity of action-এর ঐক্য এখানে রক্ষিত হয়েছে।

২. কালগত ঐক্য (Unity of time)

একাঙ্ক নাটকের কোনোও উপকাহিনী বা Sub plot থাকে না। চরিত্র থাকে চার-পাঁচটি। শব্দ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি হয় না। কাজেই অতি স্বল্পকালের মধ্যে একাঙ্কিকার মুন্সিয়ানা ঘটনা ও দ্রুততার মধ্য দিয়ে উত্তেজনার চরম বিন্দুতে পৌঁছে যায়। আমরা দেখি 'শিককাবাব' একাঙ্কিকায় সময়ের অস্তিত্ব চমৎকারভাবে রক্ষিত হয়েছে। 'শিককাবাবে'র সময়কালে পুরোপুরি একটি রাত নয়, একটি রাতেরও দুই-তিনটি প্রহর। নাটকের সূচনায় জমিদারের ভৃত্য শিবু ও খানসামা করিমের কথপোকথনের মধ্য দিয়ে হল ঘরে একটি 'নতুন চিড়িয়া'র আগমনবার্তা জানা যায়। তাদের কথোপকথনের সামান্য সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জমিদার ও তার মোসাহেব প্রবেশ করে। অন্য দিকে রান্না ঘরে পশু মাংসের শিককাবাব তৈরির আয়োজন চলছে। এই অবসরে মদ খেতে খেতে ও সিগার টানতে টানতে জমিদার সৌদামিনীর জীবনের পূর্ব কাহিনী ভালোভাবে জেনেছেন। এর মধ্যে জমিদারের ইয়ারবন্ধু জীবনধনের আগমন ঘটায় পরিবেশটা একটু রঙিন হয়ে উঠেছে। সৌদামিনীর পূর্ব প্রেমিকদের কার্য জানার পর জমিদার তাকে ভোগ করতে অস্বীকার করেছেন। তবু অপ্সরাটিকে একটু চোখে দেখার আগ্রহ মেটাতে যখন পর্দা ফাঁক করা হয়েছে; তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সৌদামিনীর মৃতদেহটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এই ঘটনাগুলি ঘটতে বড়জোর তিরিশ চল্লিশ মিনিট সময় লেগেছে। অবশ্য তার মধ্যে পান্নালাল ও জমিদারের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সৌদামিনীর প্রথম যৌবন থেকে বার বার প্রতারিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নাটক যখন শেষের দিকে তখনও রাতের প্রহর এগিয়ে চলে। যখন নাটকের অন্ত্যযবনিকা ঘনিয়ে এল তখন রাত শেষ হয়নি। সুতরাং নাটকের মূল ঘটনা ত্রিশ, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সমাধা হয়েছে। কাজেই একাঙ্কিকার যে আদর্শ সময় লাগার কথা সেই স্বল্পাধিক এক ঘন্টার মধ্যে 'শিককাবাব' একাঙ্কিকার ঘটনাধারা সংঘটিত হয়েছে। অতএব এই একাঙ্কিকার কালগত ঐক্য বা Unity of time যে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত হয়েছে তা আমরা বলতে পারি। আর একাজে সফল হয়েছেন সার্থক একাঙ্ক নাট্যকার বনফুল।

৩. স্থানগত ঐক্য (Unity of place)

ত্রয়ী ঐক্যের ধারায় Unity of place বা স্থানগত ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবে দেখা যায় বিশ্বের সেরা একাঙ্ক নাটকগুলিতে নাট্যস্থানের পরিবর্তন প্রায় ঘটেই না। কেননা যেহেতু এখানে একটি মাত্র অঙ্ক এবং একটিমাত্র দৃশ্য থাকে। আমাদের আলোচ্য 'শিককাবাব' একাঙ্কিকায় সেই Unity of place-এর শর্ত পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। নাটকের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে ঘটেছে মফস্বলের এক জমিদারের প্রমোদকুঞ্জ বাগানবাড়ির হলঘরে। সেখানে কামনালোভী পুরুষের প্রতারণায় শিকে গাঁথা ও লালসার আগুনে ঝলসানো শিককাবাবের স্বরূপে ভাগ্যবিড়ম্বিত যুবতী সৌদামিনীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। জমিদারের হলঘরটি এই একাঙ্কিকার রঙ্গস্থল ও সমস্ত ঘটনার আশ্রয়স্থল। নাটিকার সব ঘটনা প্রত্যক্ষভাবে আদ্যন্ত এখানেই ঘটেছে। আর সব সংলাপও এখানেই বলা হয়েছে। এই হল ঘরটির সঙ্গে সৌদামিনীর করুণ নিয়তি যুক্ত বলে নাট্যকার নাটিকার সূচনাতেই হলঘরটির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ---

প্রকাণ্ড একটি হলঘর। ছাদ পাকা নয়। একটি বড় বরগা ঘরের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়েছে, দেখা যাইতেছে। পর্দা টাঙাইয়া হল ঘরটিকে দু ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দা একটি নয়

, দুইটি -- পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দার ওপারে কি আছে তা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে ঘরের দুদিকে দুটি দরজা আছে।

পর্দার এপারেই সব দৃশ্যগুলি ঘটেছে। কাজেই বলা যায় যে পান্নালালের বর্ণনায় নাট্যস্থান যদিও কখনও সৌদামিনীর গ্রাম, কখনও বাঙালির চিরপরিচিত বারাণসী তীর্থ, শিয়ালদহ স্টেশন --- কিন্তু মূল স্থান জমিদারের হলঘর।

৩০৩.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাটকে অঙ্ক কাকে বলে? নাটকের পঞ্চসন্ধির পরিচয় দাও।

২। পঞ্চসন্ধি এবং নাটকীয় ঐক্য বলতে কী বোঝায়? নাটকের কাহিনীর ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয়ের গুরুত্ব নিরূপণ করো।

৩। ত্রয়ী ঐক্য বলতে বিভিন্ন নাট্যতত্ত্ববিদ কী বুঝিয়েছেন? যে কোনো সার্থক নাটকে ত্রয়ী ঐক্য বজায় থাকে কিনা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, রাজনৈতিক নাটক, উদ্ভট নাটক

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৫.১ : উদ্দেশ্য

৩০৩.৪.১৫.২ : ভূমিকা

৩০৩.৪.১৫.৩ : পৌরাণিক নাটক

৩০৩.৪.১৫.৪ : সামাজিক নাটক

৩০৩.৪.১৫.৫ : প্রহসন

৩০৩.৪.১৫.৬ : ঐতিহাসিক নাটক

৩০৩.৪.১৫.৭ : রাজনৈতিক নাটক

৩০৩.৪.১৫.৮ : উদ্ভট নাটক

৩০৩.৪.১৫.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৫.১ : উদ্দেশ্য

বর্তমান এককে নাট্যবিষয়কে কোনো কোনো মাধ্যমে পরিণতি দেওয়া উচিত, সেই উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে নানা শ্রেণীর নাটকের বৈচিত্র্য নির্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

৩০৩.৪.১৫.২ : ভূমিকা

পৃথিবীর সব দেশে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, রোমান্স ইত্যাদি প্রতিটি দিক সম্পর্কে নাট্যকারের শুধু ওয়াকিবহাল থাকাই জরুরী নয় তাকে আলাদা আলাদা আঙ্গিকে পরিবেশন করাও তাঁর দায়িত্ব। দেখা যায়, এক-এক শ্রেণীর নাটকে নাট্যরস এক-এক জাতীয়।

৩০৩.৪.১৫.৩ : পৌরাণিক নাটক

পুরাণ পরোক্ষে আধিদৈবিক চিন্তনের সাহিত্যিক প্রকাশ। বাস্তবের মানদণ্ডে যা কিছু অলৌকিক, অবিশ্বাস্য এবং স্বাভাবিকভাবেই অচিন্তনীয়, তাকেই পুরাণ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশেচ্ছু। একথা ঠিক, ঐশ্বরিক শক্তির অসীম প্রকাশ চলমান বস্তুজগতে কিছুতেই বিশ্বাস্য হতে পারে না। তাই বোধহয় স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের মধ্যে স্থানিক গুরুত্ব এত বেশী। পুরাণ-রচয়িতারা এই দুই মেরুর মধ্যে মিলন ঘটাতে চাননি সত্য কিন্তু একথাও সত্য তাঁদের কল্পনায় মর্ত্য মানুষের কাছে স্বর্গের ঈশ্বরকে, নানা দেবদেবী এবং ঊর্ধ্বজগতের অপরিচিত সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করার ব্যাকুল ইচ্ছা ছিল। পৌরাণিক চরিত্রগুলির সমকক্ষ না হলেও এবং পৌরাণিক রীতিনীতিকে সর্বাংশে গ্রহণে অপারগ হলেও পরবর্তী কালের মানুষ হয়ত এ জন্যই পৌরাণিক কাহিনী আদ্যন্ত পড়েছে, সুযোগমত ব্যবহারিক জীবনে যেমন পুরাণ-উচ্চারিত আদর্শ কথাকে গ্রহণ করেছে তেমনই সাহিত্যের নানা শাখাতেও পৌরাণিক কাহিনী নিপুণভাবে পুনরুত্থাপিত করেছে।

পুরাণে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয়ের কথা সর্বত্র উচ্চারিত। এর কারণ প্রথমত দেবনির্ভর কাহিনীতে ঈশ্বরের বিধানই চূড়ান্ত; দ্বিতীয়ত পাপের জয় হলে বক্তব্য ট্র্যাজেডির পথ ধরে চলে -- ভারতীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যের যা আপাতবিরুদ্ধ লক্ষণ। পাপ এবং পুণ্যের এই ভারসাম্যহীন চেহারাটির পরিচয় রেনেসাঁস-পূর্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অত:পর মানবতার উজ্জীবনে যুক্তিতর্কের বিকাশে পাপের নতুন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়। পুরাণের নীতিমূলক চিন্তা আধুনিক মানবতাবাদী ভাবধারার কাছে তার পুরাতন শক্তি ও স্বরূপ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি।

সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণ-কথাশ্রয়ী নাটকগুলিতে কিছু কিছু কৌতুকময় চরিত্র আছে। বাংলা পৌরাণিক নাটকেও এমন চরিত্র বিরল নয়। মনোমোহন বসুর 'পার্থ পরাজয়' নাটকের ঘনো, রনো হয়গ্রীব, লম্বোদর, প্রভৃতি চরিত্রে হাস্যরসের খোরাক আছে। কিন্তু এগুলি নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। এরপর আসে গিরিশচন্দ্রের বিদূষক চরিত্রের কথা। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক লোভী, ভীরু, কৌতুকময় চরিত্র -- অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের নলদময়ন্তী এবং জনা নাটকের বিদূষক চরিত্রে হাস্যরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনরস। আবার 'পাণ্ডব গৌরবে' নারদ চরিত্রটি যাত্রার লৌকিক রসিক নারদে পরিণত। অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রোহিতাশ্ব চরিত্রটি 'ডেঁপোমি'তে পূর্ণ। এই চরিত্র পৌরাণিক নাটকের ভাবরস ক্ষুণ্ণ করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দর্শনারাজ এবং দ্রুপদের আলাপে লঘু হাস্যরসের অবতারণার ফলে চরিত্র দুটির রাজোচিত গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে।

পৌরাণিক নাটকের এবং প্রহসনের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় পৌরাণিক নাটকে প্রহসনের হাস্যরস প্রবিষ্ট করালে তার রসহানি ঘটে। এই দুটি নাট্যধারার মধ্যে আদর্শগত মিল না থাকায় রসগত মিলও থাকতে পারে না।

অন্যান্য নাট্যধারার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রভেদ তা হল পৌরাণিক নাটক তত্ত্বমূলক রচনা, লোকশিক্ষামূলক নাট্যকর্ম। এই শ্রেণীর সকল চরিত্রই এক একটি তত্ত্বের প্রকাশক -- জীবনরসের চেয়ে ধর্মদর্শনের সঙ্গেই তাদের বেশী সখ্যতা। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে যদিও তত্ত্বের কথা কখনও কখনও থাকে কিন্তু নাটকগুলির চরিত্রসমূহ তত্ত্বের অঙ্গুলিহেলনে চলাফেরা করে না। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত একটি জীবনতত্ত্ব জেগে ওঠে কিন্তু পৌরাণিক নাটকে ঘটনা ও চরিত্র প্রথম থেকেই তত্ত্বের কাছে নতশির হয়ে যাওয়ায় সেগুলির বিকাশ নিটোল হতে পারে না।

এই সূত্রে নাটকে ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ যত সীমিত, সামাজিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ ততই বিস্তৃত। সেন্ট এভারমণ্ড কর্ণেই রচিত Polyeucte নাটকের সমালোচনায়, আই. এ. রিচার্ড তাঁর Principles of Literary criticism (1925) গ্রন্থে, অধ্যাপক কার্ল জেসপারস তাঁর Tragedy is not enough (1953) পুস্তকে এই মন্তব্যই করেছেন। সমাজজীবনে মানুষ সর্বাংশে ধর্মবিশ্বাসী নয় বলেই সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে ট্র্যাজেডি-সাফল্যের পথ প্রশস্ত এবং ভিন্ন কারণেই পৌরাণিক নাটকে সে সুযোগ প্রায়শ: নেই। আবার এঁদের মন্তব্য (যা প্রায়শই অ্যারিস্টটল-অনুসারী) মেনে নিলে যেন কটি গ্রীক ট্র্যাজেডি, সেনেকান ট্র্যাজেডি, শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি নাটক, রাসিন কর্ণেই রচিত নিওক্লাসিক ট্র্যাজেডিগুলি এবং উত্তরকালের নাট্যকার ইবসেন, পিরাণদেল্লো, গলসওয়ার্দি প্রমুখের নাটকগুলিও সর্বাঙ্গসুন্দর ট্র্যাজেডি নয়। সুতরাং পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অসুবিধা এবং সামাজিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুবিধার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হয়।

প্রথম কথা, পৌরাণিক কাহিনীতে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত স্বল্প -- পরলোক এবং দেবলোকে যাতায়াত অনায়াসসাধ্য। যখন অভিশপ্ত দেবতা বিপর্যয়ে পড়েন তখন আমরা বুঝি এ বিপর্যয় সাময়িক, যখন মানুষের উপর নিয়তির অমোঘ আক্রোশ নেমে আসে তখনও আমরা নিশ্চিত থাকি এই ভেবে যে সেই মানুষটির শোক সাময়িক, কেননা দৈবনির্ভর মানুষ দৈবের করুণা শেষ পর্যন্ত পাবেই এবং দু:খের হাত থেকেও তার পরিত্রাণ ঘটবে। সাময়িক দু:খই পরিণতিতে সুখে পৌঁছায় এবং পৌরাণিক নাটককে ট্র্যাজেডির পথ থেকে সরিয়ে আনে। দ্বিতীয় কথা, পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর মতই দার্শনিক সত্যকে বড় করে দেখান হয়। সেখানে ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব, দু:খ-দুর্দশা মায়াবাদী কুসংস্কারের চাপে হারিয়ে যায়। স্বভাবতই পৌরাণিক নাটকের সূচনায় বিবাদের বীজ রোপিত হলেও নাটকের অন্তিমে তা একটি হর্ষাপ্লুত মহীরুহে পরিণত হয়।

৩০৩.৪.১৫.৪ : সামাজিক নাটক

পাশ্চাত্যে শেক্সপীয়রের 'ওথেলো', ইবসেনের 'A doll's house', চেকভের দি চেরি অর্চাড কিংবা আর্থার মিলার, বার্ণাড শ, পিরানদেল্লো, ব্রেখট প্রমুখের সমাজভিত্তিক নাটকগুলি যে শাশ্বতমূল্য লাভ করেছে তার কারণ কিছু নারী-পুরুষের সামাজিক সমস্যা সর্বদেশ ও সর্বকালে মিলে যায়। আর নাটকই সেগুলিকে চিরন্তনত্ব দান করে।

প্রায় সর্বদেশ সর্বকালে জনসমাজ পরিচালিত হয় সামাজিক নীতিনিয়ম এবং সঙ্গতি অসঙ্গতিকে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অনুসরণের ব্যাকুল কামনায়। নিজ নিজ সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস জাতির অস্থিমজ্জায় এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে; কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সেই প্রথার পরিধি থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নিরাসক্ত হয়ে বার হয়ে আসা সম্ভব নয়। মধ্যযুগের ধর্মবিশ্বাস যেমন বাঙালী সমাজকে মনেপ্রাণে দৈবনির্ভর হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল অপরদিকে তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজেও একটি ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি নাড়ীর টান আর একদিকে নবীন জীবনসৃষ্টির বন্ধনহীন উল্লাস -- এই দুটি প্রেরণাই পাশাপাশি চলছিল। ইংরাজ জাতির ইতিহাসেও দেখি মধ্যযুগের 'শিভালরি' অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় আর পূর্বের মত উদ্দীপ্ত নেশায় গতিবান নয়। সমাজের নতুন ধারাপাত এইরূপে কেবলমাত্র সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে না, সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর-বিকাশ ঘটায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুরাণচর্চার নবোদ্যমের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলছিল অন্ধ সমাজনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে সামাজিক ব্যাধিগুলির জরাতুর রূপ দেখা দিয়েছিল অন্যদিকে সেই ব্যাধিগুলি থেকে মুক্তি-উন্মাদনাও প্রবল হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই কলকাতা বন্দরের আশেপাশে ভাগীরথীর তীরে এক অভিজাত সমাজ শ্রেণী হিসাবে জন্ম নেয়। ব্যবসার প্রয়োজনে মানুষ হয় গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী। অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় যৌথ পরিবারগুলি ক্রমশ: ভেঙে পড়তে শুরু করে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতার সুযোগে সমাজে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের স্বাভাবিক প্রসার দেখা দেয়। মদ্যপান, নারীহরণ, হত্যা, জুয়াচুরি, জালিয়াতি ইত্যাদি সামাজিক বিকৃতি সমাজে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে এই অন্ধকারের বুকেই অনেকে সূর্যোদয়ের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সমাজের সাধারণ মানুষের অপরিসীম দু:খ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার মূক অশ্রুপাতকে তাঁরা উদাসীনভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। এরই ফল সতীদাহ প্রথা রদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিধবাবিবাহ আইন বলবৎ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গঠন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নবসমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন করে অনেক নাটক লেখা হয়েছিল ঠিক কিন্তু সেগুলির মধ্যে সমাজ-সমস্যার প্রতিফলন এবং তার সমাধানের কথা তেমন সফলভাবে উপস্থিত নয়। তার কারণ সম্ভবত নবজাগরণের প্রভাব সমাজের শিক্ষিত মানুষদের বিপুলভাবে নাড়া দিলেও বৃহত্তর জনসমাজকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ এক্ষেত্রে

যে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন তার দিকে যাননি। সামাজিক নাটক প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে সমকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বহন করে থাকে। সামাজিক উপন্যাসে হয়ত বা রোমান্সের স্পর্শ কিছু পরিমাণে থাকে (যেমন আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' এবং শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসে) কিন্তু সামাজিক নাটকে রোমান্সের স্থান এত বেশী নয়। ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬), বার্ণার্ড শ (১৮৭৬-১৯৫০), প্রমুখ নাট্যকারগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে যতখানি সচেতন ছিলেন, বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ সেই পরিমাণে সচেতন ছিলেন না। এর কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী নাট্যকারের সত্তা থেকে বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মপ্রবণতা হারিয়ে যায়নি। সেকালের সকল সামাজিক নাট্যকারই সমাজের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন কিন্তু আধ্যাত্মিক সংস্কার থেকে তাঁরা অনেকেই নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি।

বাংলা সামাজিক নাটকের নায়ক ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, সামাজিক নাটকের কাহিনী শতাব্দীর জ্বলন্ত সমাজের বুক থেকে চয়িত। পাশ্চাত্যে এই পথ ধরেই নাট্যকারগণ সার্থক ট্র্যাজেডি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রভূত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি দূরের কথা, সার্থক ট্র্যাজেডিও সংখ্যায় নগন্য। গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'মায়াবসান' (১৮৯৮), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮); দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) এবং রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ'কে (১৯২৫) ট্র্যাজেডির রসাশ্রয়ী বলা হলেও সেগুলির ভিতর যে মাঝে মাঝে রসের বিচ্যুতি ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ চরিত্রে ট্র্যাজেডির প্রকাশ-সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল, ব্যাঙ্ক ফেলের মর্মান্তিক ঘটনা এবং মদ্যাসক্তির বিষয়টিও সঙ্গত। কিন্তু নাটক যত দৃশ্যের পর দৃশ্যে এগিয়েছে ততই কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য জটিলতাজাল ট্র্যাজেডির মহিমাকে মেলোড্রামার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। রমেশ, কাঙ্গালী এবং জগমণির অস্বাভাবিক কূটকৌশল এবং চক্রান্তের প্রেতভূমিতে যোগেশ নিষ্ক্রিয়, নির্বাক দর্শক মাত্র। উপবাসী পুত্রের হাত মুচড়ে পয়সা নিয়ে যোগেশের মদ খাওয়া, স্ত্রীকে প্রহার, রমেশ কর্তৃক নারী ও শিশুহত্যার চক্রান্ত, রমেশের কুকর্মে কাঙ্গালী ডাক্তার এবং জগমণির অহেতুক সহযোগিতা নাটকটির ট্র্যাজেডি-রসকে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করেছে। মায়াবসান নাটকের মূলেও পারিবারিক স্বার্থজনিত মামলা মোকদ্দমা, ঋণ-ডিক্রিজারী, উইল ইত্যাদির পরিকল্পনা সবই আছে কিন্তু নাটকটির গভীরে রয়েছে নিষ্কাম ধর্মের প্রচার। বলিদান এবং শাস্তি কি শান্তি নাটকের প্রধান চরিত্র যথাক্রমে করুণাময় ও প্রসন্নকুমারের জীবনে সমস্ত রকমের দু:খ ও বিপর্যয় নেমে এসে ট্র্যাজেডির মহিমা সৃষ্টি করেছিল। একজনের মেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ বা হয় চরিত্রহীনা, কেউ লম্পট স্বামীর হাতে হয় নির্যাতিতা। আর এরই মাঝে হঠাৎ খুন, ছুরিকাঘাত, পুলিশ, আইন ইত্যাদির অকস্মাৎ প্লাবন নাটক দুটিকে ট্রাজিক গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে নাটকটিতে রোমাঞ্চকর মৃত্যুর শোভাযাত্রা। করুণাময়ীর মৃত্যু, সরযূর শিশুপুত্রের মৃত্যু, সরযূর মৃত্যু নাটকটিকে বাস্তবের জগৎ থেকে এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। তাঁর 'বঙ্গনারী' নাটকটি গিরিশচন্দ্রের অন্ধ অনুসরণের ফলে ট্র্যাজেডি হতে পারেনি, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন (১৯৩৯-৪৫) এবং যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সামাজিক নাটক দ্বন্দ্বমুখর সজীবতা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণ তৎকালীন সামাজিক অস্থিরতা এবং যন্ত্রণার প্রকৃত চেহারাটি নাটকে তেমনভাবে অঙ্কন করতে পারেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর

অধিকাংশ নাট্যকার সমাজের অপমৃত্যুকে সহ্য করেননি বলেই তাঁদের নাটকের চরিত্রগুলি পরিবেশ এবং চরিত্রের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে গিয়েছে। জীবনের নীচের মহলের ধুমায়িত বিক্ষোভকে তাঁরা বিপুল দ্বন্দ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাটকে সংহত করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নীলবিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি সবকিছুই হয়েছে সত্য কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগজনিত সামাজিক অবক্ষয়ের মত ঘটনা সেদিন ঘটেনি। ফলে বিগত শতাব্দীর নাটকে ধর্মভীরু মানুষ মৃত্যুকে সেদিন স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক এবং পৌরাণিক নাটকের নায়করা প্রায় নি:সঙ্গভাবে সংগ্রাম করেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই চেহারা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল। এই শতাব্দীর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ভূমিহীন মানুষ রেশনিং কালোবাজার ব্ল্যাক আউটের মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসে শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু রেলস্টেশনে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ঘর বাঁধে, মন্বন্তর এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শবের মিছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণ পূর্বসুরী ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাট্যকারদের মত তাঁদের নাট্যচরিত্রকে আর জীবনবিমুখ ও দৈবনির্ভর করে রাখলেন না, কোনো একক নায়ককে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন না। সামাজিক নাটকে দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শুরু হল। এই যুগ পুরাণের স্মৃতিমন্থনের যুগ নয়, সমাজের প্রতি তীব্র অভিমান এবং সামাজিক অন্যায়ের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্রোহের যুগ। সেকারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন পৌরাণিক নাটকের জয়জয়কার সম্ভব হয়েছিল তেমনই বিংশ শতাব্দীর দর্শকচিত্তে সামাজিক নাটকগুলি তুমুল আলোড়ন তুলেছিল।

৩০৩.৪.১৫.৫ : প্রহসন

সার্থক প্রহসন রচয়িতাকে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করতে হয়। কৌতুক-প্রবণতার সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির যথাযথ মিলন যদি ঘটে যায় তাহলে সার্থক প্রহসন সৃষ্টি হবার পথে আর কোনো বাধা থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাত্রায় হাস্যরসের প্রচুর ব্যবহার ছিল; কিন্তু নারদ, হনুমান,এবং বড়াই চরিত্রের বহু ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংলাপের উপরই নির্ভর করতে হত। কবিগান এবং তর্জা গানে অকারণ গালাগালিতে সাময়িক হাসির ঝলকানিটুকু মাত্র দেখা দিত, রসসৃষ্টি হত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে হাস্যরস একটি পরিশীলিত রূপের দ্বার খুঁজে পেল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৭৮৩-১৮৭০) প্রমুখ লেখকরা হাস্যরস পরিবেশনে নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। মধুসূদনের পথ ধরে এলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-৮০ বঙ্গাব্দ)। প্রহসন রচনায় ব্রতী হয়েও অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) সাফল্যলাভ করতে পরেননি। এমনকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসনও চরম সফল হয়নি। এর কারণ যে ভারসাম্য থাকলে সার্থক প্রহসন লেখা যায় সেই হাসি ও অশ্রুর মধ্যে সেতু সৃষ্টির মানসিক ধৈর্য তাঁদের ছিল না। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের 'বুড়ো শলিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিরহ' (১৮৯৭), এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২)-এ প্রহসনের বিদ্যুৎচমক লক্ষ করা যায়।

প্রহসনের প্রকৃতি বিচার করে বলা হয়েছে -- 'সমাজপ্রচলিত কোনো দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট; ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধহয় প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।' এই অভিমত গ্রহণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রহসন যেমন ব্যক্তিচরিত্রের দোষত্রুটি নির্দেশ করে তেমনি পৌরাণিক নাটকেও অ-মর্ত্য চরিত্রে দোষত্রুটির পরিচয় দেওয়া হয়। অবশ্য প্রহসন এবং পৌরাণিক নাটকে পরিণতি একরকম হয় না। তার কারণ পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনের রসজগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যে প্রহসনের প্রধান উপাদান হল চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে প্রহসন মূলত: ঘটনামুখ্য, দু-একজন প্রধান রচয়িতা ব্যতীত কেউই ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের একত্রীকরণ করতে পারেন না বলে সার্থক প্রহসন বাংলা সাহিত্যে খুবই কম।

৩০৩.৪.১৫.৬ : ঐতিহাসিক নাটক

ইতিহাস এবং নাটক যখন সমশক্তিসম্পন্ন হয়, তখনই সার্থক ঐতিহাসিক নাটক জন্ম নেয়। শেক্সপীয়রের হেনরি ও রিচার্ড রাজবংশ-নির্ভর নাটকগুলি এবং 'জুলিয়াস সিজার' নাটক যে চিরায়ত গৌরব অর্জন করেছে তার প্রধান কারণ তিনি ইতিহাসের তথ্য বা historical fact-এর সঙ্গে কাব্যিক সত্য বা poetic truth-এর হরগৌরী মিলন ঘটিয়েছিলেন। Historical Imagination বা 'ঐতিহাসিক কল্পনাবোধ' না থাকলে সার্থক ঐতিহাসিক নাট্যকার হওয়া যায় না। তার সঙ্গে আবার থাকা চাই ট্র্যাজেডি, কমেডি এবং ফার্স-এর রস নাটকে সঞ্চারিত করার শক্তি। ইতিহাসের ব্যক্তিত্বদের চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহারের দক্ষতাও গড়ে তুলতে হয়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কাহিনী ও চরিত্রানুযায়ী সংগীত রচনার ক্ষমতাও এই শ্রেণীর নাট্যকারের থাকা চাই। সর্বোপরি নাট্যকারের ভালো পড়াশুনা থাকা চাই অ্যারিস্টটলের নাট্যপ্লট সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি সম্পর্কে। আমরা নি:সন্দেহে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথের যথেষ্ট অধিকার ছিল। সেজন্যই তাঁদের সিরাজনির্ভর নাটক দুটি কালজয়ী হতে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনায় যে ঘটনার গতিশক্তির প্রয়োজনের কথা বলেছেন তা ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই গতিশক্তি ইতিহাস ও মানবজীবনকে এক তারে বেঁধে এমন দুর্বার গতিতে শেষ যবনিকাপাত পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়, যার ফলে উৎসারিত হয় 'ঐতিহাসিক রস'। তথ্যসর্বস্ব ইতিহাসের মধ্যে মানবজীবনঘন এই রসসৃষ্টি সব নাট্যকার করতে পারেননি বলেই ইতিহাসকে নিয়ে লেখা অজস্র বাংলা নাটক কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। আবার 'কৃষ্ণকুমারী', 'সিরাজদ্দৌলা', 'সাজাহান', 'টিপুসুলতান', 'মহারাজ নন্দকুমার' ইত্যাদি বিভিন্ন নাট্যকারের এসব নাটক আজও সমান জনপ্রিয়। কোনোটি অনন্ত ট্র্যাজেডি, কোনোটি ক্ষমা, কোনোটি ঈর্ষার চিত্রাঙ্কনে।

গিরিশচন্দ্র

ক. প্রথম যৌবনে সিরাজ উদ্ধত ও ব্যভিচারী ছিল একথা সে ঐতিহাসিকদের মতো নিজেই স্বীকার করেছে। কিন্তু নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ থেকে নবম দৃশ্যে সৌকতজঙের বিরুদ্ধে অভিযান, কাশিমবাজার অবরোধ, ফোর্ট উইলিয়াম জয়ের ঘটনায় তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সিরাজ তার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখেছে। অন্ধকূপ হত্যার ট্র্যাজেডির দু:খে সে কাতর হয়ে বলেছে -- 'এ কার্যে রাজ্য কলঙ্কিত।' এ কাজ সিরাজের, এবং এর জন্য তার জীবনে ট্র্যাজেডি এসেছে বলে কেউ কেউ মনে করলেও V.D.Mahajan, জানিয়েছেন মুতক্ষরীণ-এ এই ঘটনার উল্লেখই নেই।

খ. ড: নীলিমা ইব্রাহিম বলেছেন অমাত্যবর্গের প্রতি সিরাজের অমার্জিত ব্যবহার ও তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সিরাজের ট্র্যাজেডির কারণ। এই ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির সুর সিরাজের কণ্ঠে—জগদীশ্বর, আমার পাপের কি মার্জনা আছে? প্রভু আমি অন্ধ চৈতন্যহীন নবাবী গর্বে গর্বিত --- বহু অপরাধে অপরাধী। (মহম্মদী বেগ অস্ত্রাঘাত করে) আর না, আর না--- হোসেন কুলী তুমি কি তৃপ্ত?

এই হল, Moral flow জনিত ট্র্যাজেডি।

Hamartia বা Error of Judgement জনিত ট্র্যাজেডি কিভাবে এসেছিল তার দৃষ্টান্ত সিরাজ সম্পর্কে করিমচাচার উক্তি --

নবাব মদ ছেড়ে দিয়ে খালি ভাবছেন এ করি -- কি ও করি। এই দু নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছেন।

সিরাজের ট্র্যাজেডির যে সব ঘটনাদৃশ্য পরম্পরায় এসেছে সেগুলি হল :

- সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্র (১/১)
- সিরাজ ও ইংরেজের সন্ধি -- ট্র্যাজেডির বীজ (২/৬)
- যুদ্ধের সংবাদে সিরাজের প্রীত হওয়া (৪/২)
- সিরাজ-হত্যা (৫/৬)
- জহরার প্রতিশোধস্পৃহা

সিংহাসনে না বসলে সিরাজের এমন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি নাও হতে পারত। একই কথা শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক সম্পর্কে সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস রচনার জন্য সকলকে ডাক দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃত ইতিহাস, তথ্যনির্ভর ইতিহাস। কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও ইতিহাসের ভ্রান্তি এবং ইংরেজ-ভক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছিল। এর জবাব খুঁজতে হলে গিরিশচন্দ্রকে লেখা, 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের (১৮৭৫) বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধার করা বিশেষ জরুরী---

> তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই একমাত্র অবলম্বন ছিল।
>
> (রেঙ্গুন থেকে লেখা ২৫.২.১৯০৬-এর চিঠি।)

গিরিশচন্দ্রকে লেখা নবীনচন্দ্রের চিঠিটির বয়স প্রায় একশ' হতে চলল। এই একশ বছরে ইতিহাসের আরও অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে। গিরিশ-শচীন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' পেশাদার-অপেশাদার অভিনেতা-নেত্রী দ্বারা অজস্রবার অভিনীত হয়েছে। তাঁদের নাটক দুটি যেমন ব্রিটিশ রাজশক্তির চক্ষুশূল হয়েছিল, পাশাপাশি সংখ্যাতীত বাঙালিকে এই দুটি নাটক স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল।

এখন প্রশ্ন হল, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে দুই নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে বেছে নিয়ে দুটি জনপ্রিয় নাটক লিখলেন? বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে যে দেশ পরাধীন অবস্থায় ছিল, সেই সেই দেশের নাট্যকাররা পাঠক ও দর্শকদের সামনে এমন সব দেশীয় ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্র উপহার দিতেন যা থেকে দেশের মানুষ জানতে পারে তাদের অতীত ছিল শৌর্য-বীর্যের, ছিল বাহুবলের প্রবল প্রাধান্য। তাদেরও এমন বীরপুরুষ ছিলেন যাঁরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অথবা বিদেশীদের অত্যাচার থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে জীবনপণ করেছিলেন। মধুসূদন-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ-অমরেন্দ্রনাথ-মন্মথ রায়-শচীন্দ্রনাথ-মহেন্দ্র গুপ্ত-নিশিকান্ত প্রমুখরা দেশাত্মবোধ সঞ্চারের জন্যই ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন। আর একটি উদ্দেশ্যও তাঁদের ছিল। ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন জারী হওয়ার ফলে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যও নাট্যকারদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হয়েছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন সমকালীন দেশীয় আন্দোলনগুলি এর দ্বারা পুষ্ট হবে, অথচ ঐতিহাসিক কাহিনী বলে ইংরাজ রাজশক্তি এগুলি নিষিদ্ধ করবে না। বাস্তবে কিন্তু উল্টোটাই হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল

ইতিহাসে নুরজাহান একটি বিস্ময়কর নারী চরিত্র। তার উপর নাটক রচনার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন মুঘল ইতিহাস ভালো করে পড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি 'ঐতিহাসিক রস' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ নিশ্চয়ই তাঁর পড়া ছিল। শেক্সপীয়রের একাধিক নাট্যচরিত্র নুরজাহান চরিত্র অঙ্কনে সাহায্য করে, সর্বোপরি দুই ঐতিহাসিক চরিত্র ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর এবং তাঁর সুবেদার শের খাঁর জীবনবৃত্তও পড়ে নিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ১৯০৮-এ 'নুরজাহান' রচনার পর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মুঘল ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায় অর্থাৎ জাহাঙ্গীর-পুত্র সাজাহান তাঁর নাট্যবিষয় হয়।

ইতিহাসের বেশ কিছু অধ্যায় 'নুরজাহান' নাটকে অনুসৃত হয়েছে। শের খাঁর সঙ্গে মেহেরুন্নিসার বিবাহ ও তার পরবর্তী পর্যায়ে তাদের বর্ধমান-জীবন ইতিহাসাশ্রয়ী; নাটকের প্রথম অঙ্কের কেন্দ্রীয় বিষয়। অত:পর শের খাঁর ইচ্ছামৃত্যু এবং মেহেরুন্নিসার দিল্লিতে উপস্থিতি। সেখানে বেশ কিছুকাল অপেক্ষান্তে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিয়ে হয়ে গেল। ইতিহাস বলে এবং নাটকও জানায় যে বিবাহোত্তর কালে জাহাঙ্গীর নুরজাহান বা মেহেরুন্নিসার রূপে একান্ত মুগ্ধ। ফলত, সেই দুর্বলতার সুযোগে নুরজাহান ভারত সাম্রাজ্যের সব ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করল। ইতিহাসে খসরু হত্যা, খুরম হত্যার চক্রান্ত ইত্যাদি সমর্থিত। এমনকি নিজের জামাতা লায়লার স্বামী শারিয়ারকে সিংহাসনে বসাবার জন্য নুরজাহানের প্রচেষ্টার কথাও কিছু কিছু ইতিহাসে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্বেই মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ এবং সাজাহানের মহাবৎ-আনুগত্য ইতিহাসানুগ। এরপর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ইতিহাসে আছে, নাটকেও আছে। কিন্তু নুরজাহানের ব্যর্থতা এবং তার উন্মাদ হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত কতটা ইতিহাস-ঘনিষ্ঠ এ নিয়ে যে প্রশ্ন বহুকাল ধরে চলছে তার বোধহয় সমাপ্তির প্রয়োজন আছে।

৩০৩.৪.১৫.৭ : রাজনৈতিক নাটক

বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করে উৎপল দত্ত কালজয়ী। 'টিনের তলোয়ার' সেই শ্রেণীর নাটক। ভারতে স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে বাংলা নাট্যশালার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয় দিয়ে এর সূচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাটকে রোমান্সের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী' রোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ সামাজিক নাটক হলেও সমকালীন বিষয় নিয়ে সরাসরি ইংরেজ-বিরোধিতা দুটি নাটকেই দেখানো হয়েছে। আইনজ্ঞ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ইংরেজতোষণ দেশে সমকালীন পরিস্থিতিতে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জগদানন্দকে বিদ্রূপ করে গ্রেট ন্যাশনাল 'গজদানন্দ' নাটকের অভিনয় করে। তাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার রঙ্গমঞ্চ। তাদের কণ্ঠরোধ করতে ইংরেজ সরকাব 'Dramatic Performance Act' (১৮৭৬) জারি করে। সেদিনের উত্তেজিত রাজনৈতিক আবহের প্রেক্ষিতে উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি রচিত। অন্তরঙ্গভাবে নাটকের প্লটবিন্যাস, চরিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালীন রাজনীতি। সুতরাং রাজনৈতিক মতাদর্শ এই নাটকে নিশ্চিতভাবে উপস্থিত।

৩০৩.৪.১৫.৮ : উদ্ভট নাটক

পাশ্চাত্যে Absurd Drama বলতে যেমন নাট্যঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা, সংলাপে অবিশ্বাস্য ভাবাবেগ ইত্যাদি অনাটকীয় ঘটনা বোঝায় তেমনি বাংলায় লেখা কিছু এধরনের বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত নাটককে উদ্ভট নাটক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার এজাতীয় নাটকের রচয়িতারা তাঁদের সৃষ্টিকে উদ্ভট

নাটক (ভিন্ননামে কিমিতি নাটক বা ব-নাটক বলায় আপত্তি করেন) বিষয়টি বিতর্কমূলক।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে বাদল সরকার এই শ্রেণীর নাটকের পথিকৃত নাট্যকার। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি সামনে রেখে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি।

সাধারণভাবে প্রথাসিদ্ধ নাটকে প্লট এবং Sub-plot-এর যে বিভাজন পাশ্চাত্য আলংকারিকরা করে থাকেন-অ্যাবসার্ড নাটক বা উদ্ভট নাটকের ক্ষেত্রে সেভাবে করা যায় না। প্রথমত, উদ্ভট নাটকে আদি-মধ্য-অন্ত্য সম্বলিত একটি নিটোল কাহিনীর ধারাবাহিকতা কখনওই দর্শকরা পান না। আর যদি সরল বা জটিল Main plot-ই না থাকে, তা হলে Sub-plot বা উপকাহিনীর সুযোগ নেই। যাকে আমরা বলি Unity of Place, বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে ইন্দ্রজিৎদের বাড়ি, একটি ছোটখাট পার্ক অথবা অমল-বিমল-কমলের তাসের আড্ডা -- কোনোও স্থানঐক্যই চিহ্নিত করে না। Unity of Time ও এ নাটকে রক্ষিত হয়নি। কেননা এটি হচ্ছে যাত্রার নাটক -- তীর্থযাত্রার নাটক। আবার এ নাটক গ্রীক নাটকের সিসিফাসের ক্রমাগত পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা আর নামার অভিশপ্ত ঘটনার মতো।

> **ইন্দ্রজিৎ ঃ** দেবরাজ জুপিটারের অভিশাপে সিসিফাসের প্রেতাত্মা প্রকাণ্ড ভারি পাথরের চাঁই ঠেলে পাহাড়ের চূড়োয় তোলে। যেই চূড়োয় পৌঁছোয়, আবার গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় পাথরটা। আবার ঠেলে ঠেলে তোলে। আবার পড়ে যায়, আবার তোলে।
>
> **লেখক ঃ** আমরাও অভিশপ্ত সিসিফাসের প্রেতাত্মা। আমরাও জানি ও পাথর পড়ে যাবে। যখন ঠেলে ঠেলে তুলছি তখনই জানি এ ঠেলার কোনো মানে নেই। পাহাড়ের ঐ চূড়োর কোনো মানে নেই।

স্বভাবতই অ্যাবসার্ড নাটকে ঐতিহাসিক নাটক বা সামাজিক নাটকের মতো Unity of action ও আশা করা যায় না।

এসব সত্ত্বেও কেউ কেউ মনে করেছেন যে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' উদ্ভট নাটকটি একটি Sub-plot-কেন্দ্রিক -- যা মানসী ও ইন্দ্রজিতের একটি রোমান্টিক জীবনবৃত্তের পরিচয়বাহী। সাধারণভাবে নাটকের Sub-plot কোনোও মূল (Main) plot-কে জড়িয়ে অবস্থান করে এবং একটি পর্যায়ে Sub-plot ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং Main plot তার জায়গাটি সুদৃঢ় করে। এ জন্যই কারও কারও কাছে ইন্দ্রজিৎ-মানসী কাহিনী অংশটিকে Sub-plot রূপে গ্রহণ করতে কিছুটা দ্বিধা হয়।

পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকে রোমান্টিক প্রণয়লীলা একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এ তা অবিন্যস্ত একটি উপকাহিনীর জায়গা ছেড়ে মূলকাহিনীর জায়গায় পৌঁছোতে চাইছিল না। যেমন, ধরা যাক -- আয়নেস্কোর একটি নাটক -- 'এমীভী'। সেখানে দেখা যায় মধ্যম বয়সের স্বামী-স্ত্রী একটি ফ্লাটে বহুদিন ধরে বাস করছে। স্ত্রী একটি টেলিফোন অফিসে যুক্ত থেকে কিছু আয় করে। স্বামী একটি নাটকের কয়েকটা লাইন লিখছে, কিন্তু তার লেখাও আর এগোয় না এবং একটি পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা

বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। আয়নেস্কোর ‘রাইনেসোর’ নাটকেও একমাত্র বেরেঞ্চা মানুষ হয়ে রইল। কিন্তু এমন কি তার প্রেমিকাও গণ্ডারে পরিণত হল। বাদল সরকার সেই ধরনের উদ্ভটত্বে মানসী ও ইন্দ্রজিৎ-এর প্রেমকে আহত করেননি। বরং আমাদের মনে হয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজে এই প্রথাভঙ্গকারী দুটি চরিত্র অনেকটাই বাস্তব। তাদের অপূর্ণতার মধ্যে মজা আছে, হয়তো কোথাও কোথাও উদ্ভটত্বও আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি সদর্থক ইঙ্গিতও আছে। একটি দৃষ্টান্ত --

মানসী : এ রকম করে কদিন ভেসে বেড়াবে?

ইন্দ্রজিৎ : যতো দিন চলে।

মানসী : ভালো লাগছে?

ইন্দ্রজিৎ : না।

মানসী : তবে?

ইন্দ্রজিৎ : তবে কী?

মানসী : এক জায়গায় স্থির হয়ে বসো না কেন?

ইন্দ্রজিৎ : তা হলেই ভাল লাগবে?

মানসী : জানি না।

ইন্দ্রজিৎ : আমিও জানি না। আসলে ভালো লাগা কথাটারই কোনো মানে হয় না। ভালো লাগবার কথা নয়।

মানসী : (অল্প থেমে) ইন্দ্র!

নাটকের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে নাট্যসংলাপ ও নাট্যসংগীত -- দুটি পরিচিত মাধ্যম। তবে গতানুগতিক নাট্যশৈলী থেকে যেহেতু অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য থাকে, তাই বেকেটের ‘ওয়েটিং ফর গোডো’য়, আদমভের ‘দি প্যারোডি’-নামক অ্যাবসার্ড নাটকে কিম্বা বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নামক অভিনব নাটকে ব্যবহৃত গান ও সংলাপ থেকে স্বতন্ত্র। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর পাঠক ও দর্শকরা নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি গানের ব্যবহার পেয়েছেন। দৃশ্যাংশে আছে, ইন্দ্রজিৎ ও মাসীমার কথোপকথনের পর পরই নেপথ্য থেকে একটি সমবেত সংগীত ভেসে আসে। পুরো সংগীতটিই সংখ্যাবাচক -- দশটি চরণে এক-দুই-তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার অসংলগ্ন ব্যবহার থেকে এই গানের সৃষ্টি। অত:পর নাট্যসংলাপের মাঝে মাঝেই কবিতার ব্যবহার এই শ্রেণীর নাটকে অপরিচিত অধরা একটি বস্তুজগৎকে তুলে ধরে। সুতরাং বলা যায় যে, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকে ব্যবহৃত গান, গদ্য সংলাপ এবং কবিতাধর্মী সংলাপ -- সবকিছুই যেন একটা বিমূর্ত বিষয়।

বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ আপাতদৃষ্টিতে Absurd Drama-র চৌহদ্দিতে পড়লেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতা এই নাটকে সরাসরি উপস্থিত। উনিশ শতকের সুবিধাবাদী

সেই সব মধ্যবিত্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে সমাজে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে বাধা পেতে পেতে অমল-বিমল-কমল ও ইন্দ্রজিৎ-এর গোলোক ধাঁধাঁয় পড়ে যায় এবং যুবশক্তির যাবতীয় আশার মৃত্যু অনুভব করে। এর ভেতর থেকে যা দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে -- তা হল তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যা অধ্যায়নের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তরা এক একটা কেরাণীতে পরিণত হতে চায়। তারা কলেজে ক্লাস করে, যান্ত্রিকভাবে ক্রিকেট-সিনেমা-রাজনীতি-সাহিত্য ইত্যাদি সবকিছু মিশ্রিত করে আড্ডা মারে এবং যন্ত্রের মতই জীবন নির্বাহের পরিচয় তুলে ধরে এক-দুই-তিন গানে। এই গানটির মধ্যে সংখ্যার অতিরিক্ত আর কোনোও শব্দ না থাকায় বোঝাই যায় নাট্যকার তাদের বারংবার ঘুরেফেরা নৈরাশ্যময় জীবনকে ঐ গানটির বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে বাঁধতে চেয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় হল, যা ছিল নেপথ্যগীতি, গানের শেষ লাইনটি গাইতে গাইতে লেখকের প্রবেশের মধ্য দিয়ে বোঝা গেল, গায়ক, লেখকও হতে পারে।

এবার আসা যাক, আলোচ্য নাটকের সংলাপে কাব্যিক উপাদানের প্রচুর প্রয়োগের প্রশ্নে। এই এক বিশেষ রীতি, যা কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক ছাড়া অন্যান্য নাটকে দুর্লভ। নির্মল গদ্যের পাশে কবিতার রং উদ্ভট নাটকের একটি নিজস্ব শক্তি। আমরা লেখকের একই বর্ণনা থেকে সংলাপের প্রাত্যহিকতা ও সংলাপের কাব্যধর্মিতা -- বিশ্লিষ্ট করছি।

লেখক : অমল রিটায়ার করে। তার ছেলে অমল চাকরি করে। বিমল অসুখে পড়ে। তার ছেলে বিমল চাকরি করে। কমল মারা যায়। তার ছেলে কমল চাকরি করে এবং ইন্দ্রজিৎ এবং ইন্দ্রজিতের ছেলে ইন্দ্রজিৎ। ঐখানে ফুটপাতে একটা সাত বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে।

(রূঢ় বাস্তবধর্মী প্রাত্যহিক সংলাপ)

ঐখানে ফুটপাতে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার নাম লীলা। ঐ দিকে আকাশে সিঁদুরে রং। তার নিচে বসে মানসী জীবনকে ভালোবাসতে চায়।

৩০৩.৪.১৫.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাট্যতত্ত্বের নিরিখে বিভিন্ন শ্রেণীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানাও -- পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, প্রহসন।

২। দৃষ্টান্ত সহযোগে ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক নাটকের পরিচয় দাও।

৩। উদ্ভট নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো। বাংলা সাহিত্যে দুটি উদ্ভট নাটকের সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

৪। সামাজিক নাটকের লক্ষণগুলি কি কি? একটি সার্থক সামাজিক নাটকের সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটক

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.৪.১৬.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩০৩.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৬.১ : ভূমিকা

স্বাধীনতার ষাট বছর পূর্তিকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপান্তর নিয়ে যেমন লেখাপত্তর ছাপা হচ্ছে, তেমনি সাহিত্যের অঙ্গনে নিত্য যে সব পরিবর্তন ঘটছে তা নিয়েও বিভিন্ন স্তরে আলোচনা লেখা চলছে। যেমন নাটক ও থিয়েটার নিয়ে। নাটকের সঙ্গে অভিনয়ের এবং অভিনয়ের সঙ্গে রঙ্গশালার একাত্মতা স্বাধীনতার আগে প্রায় অনিবার্য ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলা নাটকের যে সম্ভার বিভিন্ন নাট্যকারের কলম থেকে বেরিয়েছে, আঙ্গিকগত দিক থেকে তা স্বাধীনতা-পূর্ব ধারা থেকে ভিন্ন হলেও দেশ সমাজচেতনার বিষয়েই তা কেন্দ্রীভূত থেকেছে। তাই বলে কি পুরোনো ভাল নাটকগুলির মূল্য কমে গেছে ? মধুসূদন-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালের ভাল নাটকগুলিই বা কজন পড়েন ? কজন দর্শকের কাছেই বা এসব নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দেবার তাগিদ আছে ? অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে চল্লিশের দশকে লেখা দু-তিনটি নাটক ছাড়া অন্য পুরনো নাটকগুলি পড়ান হয়। প্রযোজনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, এই সব নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আজও কম নয়। ভাবুন তো, প্রায় দেড়শো বছর আগে মধুসূদন যে দুটি প্রহসন লিখেছিলেন, ১৯৯২ সালে, মৃত্যুর আগের বছরও উৎপল দত্ত তা অভিনয় করে দেখিয়েছেন যে আগামী পাঁচশ বছরেও এ নাটকের গুরুত্ব থাকবে। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তর ‘থিয়েটার কমিউন’ দীনবন্ধুর ‘সধবার একাদশী’র সফল প্রযোজনা করে দেখিয়েছেন ১৮৬৬ সালে লেখা প্রহসনটি একশ তিরিশ বছর পরেও সমান সমকালীন। স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত বাংলায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মদ্যপান সম্প্রসারিত হয়েছে, পিতা-মাতার প্রতি এখনকার অনেক অটলচন্দ্র একই ভাবে দুর্ব্যবহার করে, সমাজ থেকে পতিতাবৃত্তি দূর হয়নি। এখনকার যৌনকর্মীরা যেমন সাক্ষর হচ্ছে, সন্তানদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করছে, ভদ্র ব্যবহার শিখছে, দীনবন্ধু-সৃষ্ট চরিত্র কাঞ্চনও সে সুযোগ পেলে গ্রহণ করতো। কাঞ্চন হয়ত

পতিতা ছিল, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বও ছিল। দীনবন্ধু তা দেখিয়েছিলেন। যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রও দীনবন্ধুর সেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছিলেন। আবার গিরিশচন্দ্রেরও নবমূল্যায়ন করেছেন উৎপল দত্ত। যে গিরিশচন্দ্র নিজেই সামাজিক নাটক লিখতে বীতরাগ ছিলেন এবং এ জাতীয় নাটক লেখাকে 'নর্দমা ঘাঁটা' বলে মনে করতেন, উৎপল দত্ত তাঁর গভীর অধ্যবসায় নিয়ে দেখিয়েছেন গিরিশচন্দ্রের সমাজ-মনস্কতা কি দুর্দান্ত ছিল। পণপ্রথা, বিধবা-প্রেম, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর সমস্যাপ্রধান সামাজিক নাটকগুলি এখন আর তেমন অভিনীত হয় না। দূরদর্শন-এ 'প্রফুল্ল' সিরিয়ালে গিরিশচন্দ্র কতটা হাজির এমন প্রশ্নও তোলা যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রযোজিত 'বলিদান' নাটকটি তো সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলও। 'বলিদানে'র সমস্যা — পণপ্রথা। এই প্রথা এখনও বাঙালি সমাজ থেকে হটে তো যায়ইনি, বরং তার নানা রং দেখা দিয়েছে। গিরিশচন্দ্রের আঁকা নারীদের ট্র্যাজেডি আজও কি নেই ? কোনোও কোনোও ক্ষেত্রে তা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। অথচ আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্প কিংবা গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের মত আরও অজস্র পণপ্রথা বিরোধী নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গের কজন নাট্যকার বুঝতে পারলেন ? 'বলিদান' নাটকের ট্র্যাজেডি রসের ব্যর্থতা, সংলাপের আড়ষ্টতা, চরিত্রসৃষ্টিতে দুর্বলতা — এসব নিয়ে বই বা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর সামাজিক গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি। বি. এ., এম. এ. পাশ করা অনেক মেয়ের, স্রেফ অর্থাভাবে বিয়ে হয়নি — এ কি আমরা জানি না ? যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিরাট পণের দাবি একালের অনেক শিক্ষিতা যুবতী প্রত্যাখ্যান করছেন। মহিলা কমিশনে খোঁজ করলেই কতজন বিবাহিতা কেবল পণ সমস্যার জন্য খুন হয়েছেন, কতজন ডিভোর্সের শিকার হয়েছেন তার মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যাবে, আশা করা যায়। বাংলায় পণপ্রথা-বিরোধী নাটকের এখন যথেষ্ট অভাব রয়েছে, এ বিষয়টি নাট্যকারদের ভাবা দরকার। মহিলারাও তো এ নিয়ে নাটক লিখতে এগিয়ে আসছেন না। কিন্তু কেন?

ঠিক স্বাধীনতার ষাট বছরের সীমা মানতে হলে, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'র প্রসঙ্গ বাদ দিতে হয়। কিন্তু 'নবান্ন' কোনোও নির্দিষ্ট বছরে লেখা নাটক (১৯৪৩) তো নয় -- সমগ্র বাংলা নাট্যান্দোলনের ইতিহাস যতদূর পর্যন্ত চলবে, ততদূর পর্যন্ত 'নবান্ন'-র নাম থাকবে। আমার তো মনে হয় 'নবান্ন' নাটক দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের উত্তরাধিকার, বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজের দ্বিতীয় জীবন্ত দলিল। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে বিজনবাবু প্রথম এসেছিলেন। তারপর গণনাট্য সংঘের সূচনা থেকেই লিখেছেন 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন'। পরে গণনাট্য ছেড়েছেন। নবনাট্য অভিহিত নাট্যচর্চায় থেকেছেন, কিন্তু তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় কৃষকদের দুঃখকষ্ট ও প্রতিবাদের যে ছবি এঁকেছিলেন, ১৯৭০-এ লেখা তাঁর শেষ নাটক 'চলো সাগরে'-তে বিভূতির দোলাচল চিত্ততার মধ্যেও লক্ষ করা যায় তাঁর বিশ্বাস একেবারে পাল্টে যায়নি। বিভূতি দেশকালের প্রেক্ষাপটে মার্কসবাদের যুগোপযোগী মূল্যায়ন চেয়েছিল। তাকে নিয়ে, অবশ্যই নাট্যদৃশ্যে, কমিউনিস্ট পার্টির সমস্যা হয়েছিল। সে নিজেও সাময়িকভাবে আত্মহননের কথা ভেবেছিল, পরে বলেছিল---

'ভেবেছিলাম পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই পথ কেটে কেটে এগিয়ে যেতে হবে। ... শ্রেণীসংগ্রামের বিচিত্র রূপ শেষ হবে না। ভিন্ন জনের ভিন্ন মন --- তবু সবাই আমরা এক। এক সাথেই আমরা চলব। আমাদের নিশানা এক। ... কিন্তু স্বপ্নের মাঝখানে দুঃস্বপ্ন-- আজ বড় একা লাগছে, নিঃসঙ্গ লাগছে আমার, আমার ভয় করছে।'

সংশোধনবাদ- হঠকারী আন্দোলন-- শেষ নাটকে এ সবই বিজনবাবু এনেছেন। তিনি এসব ক্ষেত্রে কোনোও পরিষ্কার অবস্থান নেননি। অবশ্য নাটকের শেষ অংশে বিভ্রান্ত জনতার আর্তি ও পরে সুশৃঙ্খল জনতার সংঘবদ্ধ মিছিলের উপর তাঁর বিশ্বাস অপরিস্ফুট থাকেনি। নাটকের 'নান্দীপাঠ' অংশে তিনি যে কথা লিখেছেন, ধরে নিচ্ছি, শেষ নাটকে এবং শেষ জীবনে এই বিশ্বাসই তিনি করতেন--

'তোমার আমার বিভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু মিছিলের কোনো বিভ্রান্তি থাকতে পারে না। কেননা অনন্ত চৈতন্যের সাগ্নিক সহস্র নায়ক এই মহামিছিলের পথ নির্দেশ করে চলেছে। আমারই মিছিল, ঠিকই কিন্তু মিছিলেরই একান্ত আমি, বা আমিই মিছিল, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ক্ষুরধার যুক্তিবাদ, এই আপাত বৈপরীত্য সমাধান করবেই করবে।'

উৎপল দত্তও মার্কসবাদ সম্পর্কে নিষ্ঠাবান ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁরও বাঁক ফেরা ও প্রত্যাবর্তনের ঘটনা আমরা জানি। গণনাট্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এক ঝলকের মতই ক্ষণিকের, কিন্তু আমৃত্যু তিনি গণমুখী নাটকই লিখে গেছেন। তবে কিছু নাটকে গণআন্দোলনের যে চেহারা তিনি এঁকেছিলেন, কিংবা বামপন্থা সম্পর্কে যেভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন তার কিছু আমাদের ভাল লাগে, কিছু নিয়ে প্রশ্ন থাকে। 'অঙ্গার' বা 'কল্লোল'কে আমরা প্রাণভরে গ্রহণ করি, 'তীর'কে প্রত্যাখ্যান করি। সত্তরের দশকের আগে থেকেই হঠকারী আন্দোলনের প্রভাবে বিজনবাবু ও উৎপলবাবু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তবে সে বিষয়ে উৎপলবাবু অতি দ্রুত পুর্নমূল্যায়ন করে, সঠিক পথে ফিরে এসেছিলেন। হয়ত বিজনবাবু অপেক্ষা উৎপলবাবুর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-মাও সে তুং-এর রচনাদি বেশি পড়া ছিল বলেই এই তফাৎ। তাছাড়া ব্রেখট-এর জীবনাদর্শে অনুরাগী উৎপল, যিনি 'ব্রেখট ও মাকর্সবাদ' নামে একটি সুন্দর পুস্তিকা লিখেছিলেন, তিনি দ্রুত নিজেকে পরিবর্তিত করে নিতে পারেন এবং লিখতে পারেন কংগ্রেসী সন্ত্রাসের প্রতীকে 'ব্যারিকেড' এবং 'দুঃস্বপ্নের নগরী'র মত নাটক। সত্তরের দশকের সন্ত্রাসকে বৃহত্তর পটভূমিতে নিয়ে যেতে পারেন 'লেনিন কোথায়' লিখে। তিনি যে সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ এবং ব্রিটিশ সরকারের নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন মনে রেখে 'টিনের তলোয়ার' লিখলেন তার নেপথ্যে সত্তরের দশকে সংস্কৃতির উপর কংগ্রেসী কালচারের হামলাও হয়ত তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল।

অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। এঁরা কেউই বামপন্থী বলে নিজেদের দাবি করেননি। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে গণনাট্যের নাট্যকারদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন আছে এবং উৎকৃষ্ট নাটকগুলির উপর বিস্তৃত প্রশংসাসূচক মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু তাঁদের বই বড়ে, যাঁরা নাটক বুঝতে শিখেছেন, তাঁদেরই কেউ কেউ গণনাটকগুলিকে প্রচার-নাটক হিসেবে অপপ্রচার করেছেন ও করছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' 'ছেঁড়াতার' 'পথিক', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল' 'বাস্তুভিটা', 'তরঙ্গ', সলিস সেনের 'নতুন ইহুদী' ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরাণীর জীবন', বীরু মুখোপাধ্যায়ের, 'সংক্রান্তি', কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘন্টা', উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ', জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুছেও যা মোছে না', সুনীল দত্তর 'হরিপদ মাস্টার', জোছন দস্তিদারের 'দুই মহল', মনোজ মিত্র-র 'চাক ভাঙা মধু', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' প্রভৃতি গণনাট্য ধারার নাটকসমূহ কি প্রচার নাটক নাকি? এগুলিতে তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, জমিদারতন্ত্র, আর্থিক সমস্যাক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত জীবন, কন্যাদায়ের যন্ত্রণা ইত্যাদি আরও নানা প্রসঙ্গ এসেছে। এসব বিষয় কি অনৈতিহাসিক, না মিথ্যা প্রচার? আমরা জানি যে, শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত-সর্বহারাদের

বেদনার কথা চোরাবালিতে মুখগোঁজা উটপাখি। সমালোচকরা ছাড়া স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জানা ছিল এবং আছে। খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মিছিল', খাদ্যের দাবি নিয়ে বারীন রায়ের 'আর কতদিন', রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড-আশ্রয়ে সলিল বিকাশ নাথের 'বেসরকারী সূত্রে', পুলিশী সন্ত্রাস নিয়ে চিররঞ্জন দাসের 'পথে নামার সময়', কৃষি-আন্দোলন-ভিত্তিক পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘরে তোল ধান', রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান', শ্রীজীব গোস্বামীর 'মেঘ কাটার পালা' অবশ্যই কোনোও না কোনোও ঘটনার প্রচার, কিন্তু সেই ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। প্রতিটি নাটকের পটভূমিই বাস্তব।

এই রকম বাস্তবতা স্বাধীনতা-পূর্বকালের ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকগুলিতে ছিল, অথচ সেগুলি দেশাত্মবোধের প্রচারমাত্র বলে আমরা উড়িয়ে দিইনি। ঠিক তেমনি ভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে কংগ্রেস-সৃষ্ট নানাবিধ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সঙ্কট যে সব নাটকে উঠে এসেছে সেগুলিকে 'প্রচার-নাটক' তক্‌মা দেওয়ার আমরা বিরোধী। এই প্রসঙ্গে, বিভিন্ন সময়কালে, নির্বাচনকে সামনে রেখে সেসব পোস্টার নাটক বিগত তিনদশক ধরে চলে আসছে, সেগুলির কথাও বলতে হয়। এ ধরনের নাটক বিগত বিশ-পঁচিশ বছরে যত লেখা হয়েছে, তার সামান্যই ছেপে বার হয়েছে। তবে এর সূচনা বহু কাল আগে বলা যায়। লর্ড রিপনের উদ্যোগে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্বশাসন উপলক্ষে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা নিয়ে পাঁচমিশালি রঙতামাশা 'ভোটমঙ্গল' লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর বন্ধু অমৃতলালও লিখেছিলেন 'সাবাস আটাশ'। আর স্বাধীনতার পর নির্বাচনী প্রচার অভিযানের সূচনাপর্বে পানু পালের 'ভোটের ভেট', 'ভাঙা বন্দর', বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। উৎপল দত্তের 'স্পেশাল ট্রেন', 'দিন বদলের পালা' কিংবা বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'জন্মোৎসব' নির্বাচনী নাটিকা হয়েও নাট্যশিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ। সমকালীন ঘটনা, ব্যক্তি, রাজনীতি ইত্যাদি এই সব 'নির্বাচনী নাটিকা'র বিষয়বস্তু হয়, এই অভিযোগে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলিকে এখনও জায়গা দেওয়া হচ্ছে না।

আগে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্যকমিটির উদ্যোগে 'পথনাটিকা' বিষয়ক পর পর দুটি সেমিনার হয়েছে। সেখানে নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা নাটক লিখে থাকেন তাঁরা পোস্টার নাটককে উন্নত নাট্যশিল্পে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নাট্যকারদের সচেতন হতে বলেছেন। এই ধরনের শিল্পোত্তীর্ণ নির্বাচনী নাটকও যে একেবারে লেখা হয়নি তা নয়, যেমন এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে উৎপল দত্তের 'দিন বদলের পালা', হীরেন ভট্টাচার্যের 'বাস্তব শাস্ত্র', শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুদ্রামুক্তি' কিংবা উৎপল দত্তের আর একটি নাটক 'জনতার কল্লোল'।

নির্বাচন এসে গেলেই প্রবীণ ও নবীন নাট্যকাররা নাটক লিখতে বসেন। সাতাত্তরের আগে ও পরে লেখা এই ধরনের নাটকের চরিত্রগত পার্থক্য আছে অবশ্যই। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর ভূমি-সংস্কারের লক্ষ্যে 'অপারেশন বর্গা'র যে স্থির লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়, তা ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব উদ্যোগ। আটাত্তরের বন্যায় বামপন্থী নেতা-কর্মীরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জনসাধারণের স্বার্থে, তা এখনও মনে ভাসে। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্ম নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে পাহাড় থেকে সমতলের সব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। জাঠা করেছিল। আবার বোফর্স কেলেঙ্কারি, বাবরি

মসজিদ ধ্বংস, শেয়ার কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ উঠেছিল। আই. এম. এফ. লোন থেকে ডাঙ্কেল প্রস্তাব এসবও আশির নব্বই-এর দশকের প্রতিরোধের বিষয়। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আর ইন্দিরা-হত্যার পর শিখ নিধন। দূরদর্শনে লাগাতার অপসংস্কৃতির প্রচার। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে অশ্লীল নাট্যাভিনয়। এসবও বিগত বিশ বছরের নানা নির্বাচনের পোস্টার নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে স্মৃতি থেকে উল্লেখ করছি তেমনই কয়েকটি নাটকের কথা। নীলিমা দাসের 'কাটা হাত ভাজা কই', বাসুদেব বসুর 'হিসাব নেবার পালা', সুপ্রিয় সর্বাধিকারীর 'নয়া রোশনী -- (হিন্দি), হীরেন ভট্টাচার্যের, 'পাগলা ঘন্টি', শ্যামল ভট্টাচার্যের 'এ নির্বাচন জিততে হবে', কিংশুক দত্তর 'এই চিহ্নে ছাপ দিন'। শ্যামাকান্ত দাস, অসীম দাস, ললিত রক্ষিত প্রমুখ আরও অনেকেই নির্বাচনী নাটক লিখেছেন। শুভঙ্কর চক্রবর্তীর 'মড়া' নাটিকাটি আমার দুর্দান্ত মনে হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষে আগামী দিনে আরও নানা নির্বাচন আসবে। অজস্র নির্বাচনী নাটক লেখা হবে। গ্রামে গঞ্জে অভিনীত হবে। নির্বাচনের শেষে অনেক অমুদ্রিত নাটক স্মৃতি থেকে মুছেও যাবে। কিন্তু তার মধ্য থেকেই, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়েও কোনোও কোনোও নাটক চিরায়ত হয়ে উঠবে। এজন্য নাট্যকারদের সতর্ক থাকতে হবে। দেখতে হবে তার সংক্ষিপ্ত নাট্য-পরিসরেও চরিত্রগুলির সংলাপ যেন দর্শককে শুধুই হাসায় বা কাঁদায় না, যেন গভীরভাবে ভাবায়।

বিগত ষাট বছরের নাট্যচর্চায় উদ্ভট নাটক বা অ্যাবসার্ড নাটকের কথা এড়িয়ে যেতে পারছি না। ব্রেখট চেয়েছিলেন, নাটক এবং থিয়েটার থেকে ভাবাবেগ বর্জন করতে। একারণেই বাঙালি দর্শকদের মধ্যে যাঁরা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত তাঁদের কাছে ব্রেখটের কিছু নাটককে দুর্বোধ্য মনে হয়েছে, ফলে তাকে উদ্ভটও বলা হয়েছে। কিছু নাটকের নায়কদের মনে করা হয় তারা উদ্ভট নাটকের নায়কদের মতই নেতিবাদী। যদিও 'মা' কিংবা 'প্যারি কম্যুনের' চরিত্রদের ইতিবাচক আখ্যা দিতে বিভ্রান্তি দেখা যায় না। মনে করা হয়, এ হল ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমই ব্রেখটকে উদ্ভট নাট্যকার পিরানদেল্লোর থেকে আলাদা রেখেছে, যদিও তাঁর উপর পিরানদেল্লোর প্রভাবের কথা কেউ কেউ দাবি করেন। বরং বলা যায় তাঁর 'ডী টাগে ডের কম্যুনে' অনুবাদের সময় উৎপল দত্ত, 'ডি গুড পারসন অব সেন্টজুয়ান' অনুবাদের সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'দি ককেসিয়ান চক সার্কেল' অনুবাদের সময় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত আমাদের দেশীয় পরিবেশকে এমনভবে ব্যবহার করেছেন যে ব্রেখটিয় সংকেত রীতি কাটিয়ে উঠে 'নয়া জমানা' ভালো মানুয়ের পালা এবং 'খড়ির গণ্ডী' সর্বস্তরের দর্শককে আকৃষ্ট করে। কিন্তু উদ্ভট নাট্যকারদের কোনোও বিবর্তন নেই, না ইউরোপে, না পশ্চিমবঙ্গে। বাস্তব-বিরোধী অ্যাবসার্ড নাটক যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইউরোপের নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যশালায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল তার মৌল কারণ এর চরিত্র, নাট্যভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য।

তবে যারা এককথায় উদ্ভট নাটককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন আমি তাদের দলে নই। তার কারণ, উদ্ভট-নাটক ভাবাঙ্গিকে উদ্ভট ঠিকই, কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার একদম যোগ নেই তা নয়। আমি চাই, নাট্যপ্লট কার্যকারণযুক্ত সম্ভাব্য হবে এবং বাংলায় গত পঞ্চাশ বছরে এমন নাটকও সর্বাধিক লেখা হয়েছে। আমি এও চাই, নাটকের বিস্তার ও পরিণতি হবে ইতিবাচক। উদ্ভট-নাটক এই প্রথম দবিটি পূরণ করে না বলেই তো তা উদ্ভট নাটক। তবে দ্বিতীয়টি তার মধ্যেও খুঁজে পেতে চাইলে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ইতিবাচকতা, যেমন আয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরাস' নাটকে ফ্যাসিজমের কাছে মানবশক্তির অসহায় পরাজয় আপাতভাবে আমাকে পীড়া দিলেও এমনটা ভাবতেও পারি যে, নাট্যকার মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রকারান্তরে একটু আশাবাদী। এই নাটকেরই বাংলা রূপান্তর হয় ১৯৬৪ সালে, যার এক বছর পরেই এল বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। এ নাটক নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি, বিশেষত এর কাহিনীর বিবর্তনহীনতার জন্য। অমল, বিমল, কমল, মানসী এবং ইন্দ্রজিৎরা জন্মায়, লেখাপড়া শেখে, প্রথানুযায়ী চাকরি করে, শেষ পর্যন্ত শূন্যগর্ভ

পরিণামের দিকে পৌঁছায়। বাদল সরকারের 'বাকী ইতিহাস' নাটকটিও উদ্ভট নাট্যরীতি অনুযায়ী ক্লান্তি, অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি নিয়ে লেখা, মানতেই হবে। বাদলবাবুর এই দুটো উদ্ভট নাটকই কিন্তু এই বাংলায় বহু পরিচিত, বহু অভিনীত। প্রশ্ন হল, যে নাট্যকার জীবনসংকটের কথা বলেন, কিন্তু তার সমাধানের পথ বাতলান না, তার এত জনসমাদর কেন? এর উত্তর একাধিক। প্রথমত, বাঙালি মধ্যবিত্তরা এই নাটকগুলির মধ্যে তাদের সমস্যার ছবি দেখতে পায়। দ্বিতীয়ত, উদ্ভট নাটকে এমন কিছু সংলাপ থাকে যা আমাদের ভাবনাকেও নাড়া দেয়। যেমন মানুষের ঘৃণ্য নির্ভরশীলতার প্রতি বিদ্রূপের একটা দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে—

'সব ক্রীতদাস -- আমি, আপনি, মানে আপনারা, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারাও ক্রীতদাস। নিয়মের ক্রীতদাস -- কারণের ক্রীতদাস। নিয়ম আর কারণের খোসাগুলি ছাড়িয়ে ফেলুন, দেখতে পাবেন আপনাদের বুকেও খোসা-ছাড়ানো পেঁয়াজের অনন্ত শূন্যতা।'

(আমি ক্রীতদাস --- বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী)

কিংবা মানুষের স্থিতিশূন্যতার বেদনার একটি চেহারা --

'সত্যিই বড় অদ্ভুত বলেছ তোমরা, এক সাথে চলেছ অথচ কেউ কাউকে চেন না।'

(রক্তাক্ত নখর --- তপনকুমার ঘোষাল)

মোহিত চট্টোপাধ্যায় কিংবা রতনকুমার ঘোষের মত নাট্যকাররা যখন যথাক্রমে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' এবং 'অমৃতস্য পুত্রা'-র মত উদ্ভট নাটক লেখেন তখন বুঝে নিতে হয় তাঁরা গতানুগতিক ধারায় বিশ্বাসী দর্শকদের আধুনিক রসোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করতেই এই টেকনিক গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় প্রগতিশীল নাট্যকার হয়েও উদ্ভট নাটক লেখার কথা তাঁদের নয়। মোহিতবাবু উদ্ভট নাটকের প্রচলিত রীতি ভেঙে তার মধ্যে গীতিনাটকের বা যাত্রার আঙ্গিক এনেছেন, অপ্রয়োজনীয় বুঝেও গান এনেছেন, এমন কি সূত্রধারের আবির্ভাবও ঘটিয়েছেন। কাজেই উদ্ভট নাটকের নেতিবাচক মনোভাবের শর্ত ত্যাগ করে তার মধ্যে প্রথাসিদ্ধ রুচির প্রয়োগ ঘটিয়ে আর একটি নতুন নাট্যধারার প্রচেষ্টা দেখা যায়। তাতে আপত্তি করলেও একশ্রেণীর দর্শক তা শুনবেন না, মনে হচ্ছে।

সবশেষে একাঙ্ক নাটকের কথায় আসি। বিশের দশকে মন্মথ রায় প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটক লিখলেও তার প্রসার ঘটতে শুরু করে পরের দশক থেকে। যতই দিন যাচ্ছে, মানুষের অবসর সময় কমছে। পথে-ঘাটে-দোকানে-বাজারে-ট্রেনে-বাসে এমনকি নিজের বাড়িতেও সকলেই এখন ব্যস্ত; প্রয়োজনের তুলনায় সময়ের বড় অভাব। দৃঢ়পিনদ্ধ নাট্যশরীর আছে বলে একাঙ্ক নাটকের প্রতি পাঠক-দর্শকের ক্রমবর্ধমান টান-- একথা যেমন ঠিক, তেমনি সদাব্যস্ত মানুষ স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটকই এখন দেখতে চাইছে। সারা বাংলায় এখন যে কত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পেলে থ হয়ে যেতে হবে।

যত দিন যাচ্ছে ততই একাঙ্ক নাটকের শিল্পরূপে বৈচিত্র্য আসছে। প্রাক-স্বাধীনতা কালে, চারের দশকে বিনয় ঘোষ 'ল্যাবরেটরি', সুনীল চট্টোপাধ্যায় 'কেরাণী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'হোমিওপ্যাথি', দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভিযান', সলিল চৌধুরি 'অরুণোদয়ের পথে', তুলসী লাহিড়ী 'দেবী' নামে যে সব একাঙ্ক নাটক লেখেন, তার মধ্যে 'দেবী'র আবেদন কালোত্তীর্ণ বলা যায়। নতুন নাট্যাঙ্গিক তৈরির জন্য এই প্রচেষ্টাগুলি যদিও স্মরণীয় হয়ে আছে।

তারপর থেকে একাঙ্ক নাটকের স্বর্ণকাল। উৎপল দত্তের ‘ঘুম নেই’ কিংবা ‘কঙ্গোর কারাগারে’ একাঙ্ক নাট্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দূরূহ পরীক্ষা পাই। গিরিশংকরের ‘শেষ সংলাপে’ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের একাঙ্ক ধৃত হয়েছে। ঋত্বিক ঘটকের স্মরণীয় একাঙ্ক ‘জ্বালা’। বনফুলের ‘শিককাবাব’, রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘শুভকে ফিরিয়ে দাও’, আধুনিক পরিণত নাটকের রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর একাঙ্ক নাটিকা। আগামী দিনে ভালো একাঙ্ক নাটকের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি হবে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলা নাটক রচনায় কত না নাট্যকার এসেছেন। কেউ আবার নাটক লিখছেন, তাতেই অভিনয় করছেন। কেউবা এ দুটি সহ প্রয়োগকর্তার ভূমিকাতেও থাকছেন। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলালের নাটকে যেমন এইসব অভিজ্ঞতা অধিক সাফল্যের কারণ হত, একালে বাড়তি আরও সুযোগ থাকলেও নাট্যকাররা তাদের মত প্রতিষ্ঠা বা জনপ্রিয়তা পাচ্ছেন না।

৩০৩.৪.১৬.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. একশো বছরের বাংলা থিয়েটার — ড: শিশির বসু

২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস — ড: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. নাট্যনিয়ন্ত্রণ ও একশো বছরের বাংলা নাটক — ড: রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস — ড: দর্শন চৌধুরী

৫. World Drama — A. Nicoll

৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড: অজিতকুমার ঘোষ

৭. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য

৮. বাংলা নাটকে চরিত্র — ড: বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

৩০৩.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের নানা পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করো।